প্যারেন্টিং

সন্তান প্রতিপালনে কলা-কৌশল

প্রথম খণ্ড [অধ্যায় ১-৭]

হিশাম আলতালিব ■ আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান ■ ওমর আলতালিব

প্যারেন্টিং
সন্তান প্রতিপালনে কলা-কৌশল
প্রথম খণ্ড [অধ্যায় ১-৭]

লেখক

হিশাম আলতালিব

আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান

ওমার আলতালিব

ভাষান্তর

কানিজ ফাতিমা, ফাতেমা মাহফুজ, নুরুন নাহার, কাজী তাবাসসুম, এইচ. এম. ওয়ালীউল্লাহ, আনিসুর রহমান, ইসরাত জাহান, মায়মুনা মুসাররাত।

সম্পাদনা

আবদুল আজিজ, রওশন জান্নাত, মারদিয়া মমতাজ, হালিমা আল হামরা, জালাল উদ্দীন রুমী

BiiT

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্যারেন্টিং: সন্তান প্রতিপালনে কলা-কৌশল (প্রথম খণ্ড)

অনুবাদস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২০, অগ্রহায়ণ ১৪২৭, রবিউস সানি ১৪৪২
প্রকাশক: বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার (কম্পিউটার কমপ্লেক্স), তৃতীয় তলা
ঢাকা- ১১০০

মূল্য: টাকা ৫০০.০০

Parenting: Shontan Protipalone Kola-Koushol
(Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children)
By Hisham Altalib, AbdulHamid AbuSulayman, Omar Altalib
Published in 2020

Published by BIIT Publications
38/3 Banglabazar, 2nd Floor
(Computer Complex),
Dhaka- 1100
+88 01923 489 165, +88 01926 910 247
E-mail: biitpublications@gmail.com

Price: BDT 500.00 US$ 20.00

ISBN 978-984-94911-5-6

প্রকাশকের কথা

প্রত্যেক বাবা-মাই চান তার সন্তানটি সেরাদের সেরা হোক। কিন্তু কীভাবে? গুড প্যারেন্টিং। শিশু সন্তান লালন-পালনে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দরকার সাধারণত নতুন বাবা-মায়ের মধ্যে তা অনুপস্থিত। আর যারা আগেই বাবা-মা হয়েছেন তারাও মনে করেন যে, সন্তান জন্মানোর আগেই যদি তাঁরা প্যারেন্টিং সম্পর্কিত জ্ঞান ও কৌশল ভালোভাবে জানতে পারতেন, তাহলে সন্তানদের আরো কার্যকরী পন্থায় লালন-পালন করতে পারতেন।

অর্থাৎ সন্তানাদিকে ভালোভাবে বোঝতে না পারার কারণে বা পরস্পরের মধ্যে বন্ধুসুলভ আচরণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই একটি পরিবারে অশান্তি নেমে আসে বা অকার্যকর হয়ে যায়।

এ রকম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নির্দেশনা, রসুল সা.-এর আদর্শ এবং গুণীজনের অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞান-এ তিন উৎসের সমন্বয়ে প্রণীত ইংরেজিতে লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি রেফারেন্স গ্রন্থের নাম- গ্রন্থ Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children।

গ্রন্থখানি মূলত বরেণ্য লেখকদের অর্জিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন-যা তারা দীর্ঘকাল মুসলিম ও পশ্চিমা দেশে বসবাস করার মাধ্যমে অর্জন করেছেন। মূলত গ্রন্থটির তিনটি অংশ। পুরো গ্রন্থখানি একত্রে অনুবাদ করে প্রকাশ করা অনেক সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিধায় প্রথম সাতটি অধ্যায় নিয়ে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। অবশিষ্ট দুটি পর্ব পৃথকভাবে প্রকাশিত হবে অতি শীঘ্রই।

গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন 'প্যারেন্টিং: সন্তান প্রতিপালনে কলা কৌশল' শিরোনামে কানাডার ক্যালগেরি ইসলামিক স্কুলের শিক্ষক কানিজ ফাতিমার নেতৃত্বে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত একদল স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণী। তিনি প্যারেন্টিং-কে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে সমাজে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে এ গ্রন্থখানিকে তিনি অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট আছেন।

বিশ্বজুড়ে বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যে চিত্র, তা থেকে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোরও মুক্তি নেই। দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের প্যারেন্টিং আরও কঠিন, জটিল এবং একই সাথে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এপিএল কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের সংশোধিত সংস্করণ বই আকারে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত।

আশা করি সন্তানদের নিয়ে বাবা-মায়ের যে স্বপ্ন 'তারা সুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষে পরিণত হোক'-ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করবে এ গ্রন্থখানি।

ড. এম আবদুল আজিজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অনুবাদকের কথা

ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়া মুসলিম উম্মাহর অগ্রাধিকার। সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারাই সম্ভব মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান সমস্যার কার্যকরী সমাধানে পৌঁছানো। আর সেই বিশাল কাজটি শুরু হয় পরিবার থেকে। কারণ পরিবারই হলো প্রজন্ম গড়ার সূতিকাগার, আর বাবা-মায়েরা হলেন তার শ্রেষ্ঠ কারিগর। আর প্যারেন্টিং হলো বাবা-মায়েদের জন্য অপরিহার্য একটি দক্ষতা। বাবা-মায়েদের এ দক্ষতার ওপরে নির্ভর করছে মুসলিম সভ্যতার ভবিষ্যত। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতাদের সুদক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে এ গ্রন্থটি হতে পারে একটি মাইলফলক।

মুসলিম সমাজের প্রত্যেক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপরিকল্পনার দারুণ অভাব চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে সন্তান লালন-পালন এবং সন্তানের ভবিষ্যত ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিটি অভিভাবকের আকাশ ছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সময়মত সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিকল্পনা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। সন্তানদের সার্বিক বিষয়গুলো অনেকটা গৎবাঁধা নিয়মে অতিবাহিত হয়, অথচ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে গেছে সমস্যার ধরন, প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সময়োপযোগী কর্মপদ্ধতির। গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাবা-মা, এমনকি ভবিষ্যত বাবা-মায়েদের একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে এটিকে উপহার হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

গ্রন্থটি অনুবাদের কাজ করেছে মূলত একটি অনুবাদক টিম। দেশ-বিদেশে থাকা একদল স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণী তাদের সময় ও শ্রম এ কাজে নিয়োজিত করেছেন। এছাড়া অভিজ্ঞজন নানাভাবে তাদের মতামত ও উপদেশ দিয়েছেন এবং পিছন থেকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাদের সবার প্রতি রইল অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও দোয়া।

আমি মনে করি, সন্তান লালনের ক্ষেত্রের এটি অনন্য প্রয়াস। আমি বইটির বহুল প্রচার ও ব্যবহার কামনা করি।

অনুবাদকবৃন্দের পক্ষে,
কানিজ ফাতিমা
ক্যালগেরি, কানাডা

লেখক পরিচিতি

হিশাম আলতালিব

ড. হিশাম ইয়াহিয়া আলতালিব। জন্ম ১৯৪০ সালে ইরাকের নিনেভার মসুল শহরে। ১৯৬২ সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি এবং ১৯৭৪ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানার পারডু ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি অর্জন।

একজন ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরুর সময় থেকে তিনি উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন ইসলামি কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়। আমেরিকার মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (MSA) এবং কানাডার লিডারশিপ ট্রেইনিং ডিপার্টমেন্ট-এর প্রথম ফুলটাইম (১৯৭৫-১৯৭৭) ডিরেক্টর এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (IIFSO)-এর সেক্রেটারি জেনারেল (১৯৭৬) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে অনেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সেমিনার পরিচালনায় অভিজ্ঞ হিশাম ইয়াহিয়া আলতালিব IIIT'র বর্তমান প্রেসিডেন্ট। ৩০টিরও বেশি ভাষায় এ গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান। জন্ম ১৯৩৬ সালে সৌদি আরবের মক্কায় ১৯৫৯ কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় শিক্ষায় বিএ, ১৯৬৩ সালে, রাজনীতি বিজ্ঞানে এমএ। ১৯৬৩ এবং ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে ১৯৭৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন।

তিনি ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে, সৌদি আরবের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারি, ১৯৭২ সালে অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোশ্যাল সায়েন্টিস্টস (AMSS)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, (১৯৭৩-১৯৭৯) সালে ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (WAMY)-এর সেক্রেটারি জেনারেল। সৌদি আরবের রিয়াদের কিং সউদ ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং (১৯৮৮-১৯৯৮) সালে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির (IIUM) রেক্টর হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

এছাড়া তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (IIIT)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। মুসলিম সমাজের সংস্কার এবং সংশোধন নিয়ে তিনি অসংখ্য বই রচনা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য The Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islamic Methodology and Thought; Crisis in the Muslim Mind; Marital Discord: Recapturing the Full Islamic Spirit of Human Dignity; Revitalizing Higher Education in the Muslim World and The Qur'anic Worldview: A Springboard for Cultural Reform।

ওমার হিশাম আলতালিব

ড. ওমার হিশাম আলতালিব। ১৯৬৭ সালে ইরাকের কিরকুক শহরে। ১৯৬৮ সালে তাঁর বাবা-মার সাথে আমেরিকায় বসবাস শুরু এবং তাঁর স্কুল জীবন সেখানেই। ১৯৮৯ সালে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে বিএ ডিগ্রি ১৯৯৩ সালে সমাজবিজ্ঞানে এমএ লাভ করেন। ২০০৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো থেকে পিএইচডি এবং লাভ করেন। ১৯৮৯-৯২ সালে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন থেকে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ফেলোশিপ পান। ১৯৯৮-এ ভ্যালি কলেজ, শিকাগো এবং ১৯৯৯ সালে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি নর্থওয়েস্ট, গ্যারি, ইন্ডিয়ানা-তে এডজাঙ্কট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ২০০০-২০০৩ সালে ওহাইওর অ্যাশল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিজ্ঞান এবং অপরাধবিজ্ঞানে সহকারি অধ্যাপক এবং ২০০৫-২০০৬ সালে ভার্জিনিয়ার সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশনস ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন আলেকজান্দ্রিয়াতে সিনিয়র নলেজ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সামাজবিজ্ঞান বিভাগে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরিবার, শিক্ষা, বৃত্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে একাডেমিক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা xi

প্রথম অধ্যায়: ১৯-৫৪

সুষ্ঠু প্যারেন্টিং বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এটি আমরা শুরু করব?

ভূমিকা ২০
শিশুর বিকাশের ধাপসমূহ ২৩
সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি: প্যারেন্টিং-এর বিভিন্ন ধরন ২৪
সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি কীভাবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে? ৩০
সুষ্ঠু প্যারেন্টিং-এর সূচনা: ভবিষ্যৎ কাজের পূর্ব প্রস্তুতি ৩২
সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক তথ্যের ব্যবহার ৩৯
কলেজে কি সন্তান প্রতিপালন শিক্ষা দেয়া উচিত? ৩৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোর্সের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতিমালা ৪৫
উপসংহার ৪৮
করণীয়: ০১-০৭ ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: ৫৫-১৩৬

পরিবার-এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা

ভূমিকা ৫৭
প্যারেন্টহুড বা অভিভাবকত্বে উত্তরণ ৫৮
বিবাহের স্থায়িত্বের ওপর সন্তানদের প্রভাব ৬০
আমেরিকায় পরিবারের আকার-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৬৬
সিঙ্গেল-প্যারেন্ট পরিবার ৬৮
সফল সিঙ্গেল-প্যারেন্ট হবার নীতিসমূহ ৭৩
নবি-রসুলগণের ওপর সিঙ্গেল মাতৃত্বের প্রভাব ৭৪
ইসমাঈল আ., মুসা আ., ঈসা আ. ও মুহাম্মদ সা. ৭৪
একজন প্যারেন্ট কি অন্যজনের বিকল্প হতে পারে? ৭৬
ইসলাম ও তালাক প্রসঙ্গ ৭৮
ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ৮৩
কুরআনের ভাষায় পরিবারের উদ্দেশ্য ৮৬
মুসলিম পরিবারগুলোর স্খলন ৯০
শিশু উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা ৯৩
যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার ৯৯
আমেরিকায় প্যারেন্টিং-এর প্রচলিত ভুল ধারণা ১০১

কলাম্বিয়ান হাই স্কুলের গণহত্যা থেকে শিক্ষা ১০৭
শিশুদের মূল্যবোধ শিক্ষাদান: রক্ষণশীল বনাম উদারনীতি বিতর্ক ১০৯
মুসলিম দেশগুলোর পরিবার বনাম যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার ১১১
ব্রিটেনে বসবাসরত মুসলিমদের কাহিনি ১১৪
মুসলিম প্যারিন্টিং-এর ওপর পশ্চিমা প্রভাব ১১৫
যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যারেন্টিং ১১৬
স্বাধীনতা নাকি বাস্তবতা? ১১৭
কোথায় সন্তানদের বড় করবেন? ১২৩
একটি কেস স্টাডি: পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তরের কারণে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংঘাত ১২৩
পশ্চিমা চিন্তার হারিয়ে যাওয়া দুটি ধারণা ১২৫
ধর্মীয় মূল্যবোধ বনাম কর্তব্যমূলক মূল্যবোধ ১২৬
পরিবারের কৃষি মডেল: পরিবার যখন শস্যক্ষেত, সন্তানরা চারা আর বাবা-মা সেখানে মালী ১৩০
করণীয়: ৮-১৫ ১৩১

তৃতীয় অধ্যায়: ১৩৭-১৫৬
সন্তান লালন-পালনের সর্বোত্তম পন্থা: জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ
সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ: সফল প্যারেন্টিং-এর প্রথম ধাপ ১৩৮
মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ১৪১
কুরআনের আলোকে জীবনের লক্ষ্যসমূহ: ইমানদারদের প্রার্থনা ১৪১
হাদিসের আলোকে মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৪৫
কফি এবং জীবনের অগ্রাধিকার ১৪৯
উপসংহার ১৫০
করণীয়: ১৬-২০ ১৫২

চতুর্থ অধ্যায়: ১৫৭-১৯০
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য: শিশুদেরকে এরূপে গড়ে তোলা যেন তারা সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসে
ভূমিকা ১৫৭
বর্তমান যুগে শিশুদের মনে বিশ্বাস স্থাপনের কিছু উপায় ১৫৯
আত্মকেন্দ্রিকতার সংস্কৃতি: সামাজিক দায়িত্বের প্রতি অনীহা ১৬০
নিজ দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা ১৬৬
বিকৃত সংস্কৃতি: পশ্চাদমুখিতা ও কুসংস্কার ১৬৮
ভারসাম্যপূর্ণ পথ: বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ ১৭১

শিশুদের মনে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি **১৭৩**
দোয়ার শিক্ষা প্রদান: সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার স্মরণ **১৭৭**
তাওবার (অনুশোচনা) শিক্ষাদান **১৭৮**
রসুল সা. ও অন্যান্য নবিদের সম্পর্কে শিক্ষাদান **১৭৯**
শিশুদের আদব শিক্ষা **১৮০**
কোনটি আগে শেখাবেন- তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে না কি আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসেন? **১৮১**
করণীয়: ২১-২৫ **১৮৫**

পঞ্চম অধ্যায়: **১৯১-২০৬**

সাধারণ চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ভূমিকা **১৯২**
বাবা-মায়েরা যেসব মৌলিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন **১৯২**
অভিজ্ঞতার অভাব **১৯৩**
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম: শিশু প্রতিপালনের কাজ একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব (২৪ঘণ্টা/৭দিন) **১৯৪**
শিশু প্রতিপালন একটি অনমনীয় কাজ **১৯৫**
শিশু প্রতিপালন হলো সময়, শ্রম ও টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ **১৯৫**
শিশুর বিকাশে বাবা-মা ছাড়াও আরো অনেক কিছুর প্রভাব রয়েছে **১৯৫**
ছোটো শিশুরা কথার মাধ্যমে ভাব প্রকাশে অক্ষম **১৯৬**
প্যারেন্টিং বহুবিধ দক্ষতার সমন্বয় **১৯৭**
বাবা-মাকে একটি টিমের মতো কাজ করতে হবে **১৯৮**
সন্তান লালন-পালনে সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অপরিহার্য **১৯৮**
বাবা-মা সম্পর্কে সন্তানদের উপলব্ধি বাবা-মায়ের ধারণার বিপরীতও হতে পারে **১৯৯**
শিশুকে কখন কী বলতে হবে তা জানুন **১৯৯**
শিশুর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল ধারণার অনুপ্রবেশ **২০১**
নিজের দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা **২০২**
শিশু প্রতিপালন সম্পর্কে বাইবেলের কিছু উদ্ধৃতি **২০৩**
উপসংহার **২০৪**
করণীয়: ২৬ **২০৫**

ষষ্ঠ অধ্যায়: ২০৭-২২০

প্রচলিত ভুল ধারণা, ভ্রান্তি ও জনশ্রুতি এবং এ থেকে বাঁচার উপায়

ভূমিকা **২০৮**

প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করা ও গুপ্ত ফাঁদগুলো সম্পর্কে সচেতন করা **২০৮**

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্যারেন্টিং পদ্ধতিগুলোর অন্ধ অনুসরণ **২০৮**

অপরের অন্ধ অনুকরণ **২০৮**

সন্তানের মাধ্যমে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছার পূর্ণতা দেবার চেষ্টা **২০৯**

পিতৃত্ব-মাতৃত্বের দায়িত্বভার অন্যের কাঁধে অর্পণ করা **২১০**

শিশুকে শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝানোকেই যথেষ্ট মনে করা **২১০**

শক্তি প্রয়োগ করে সন্তানকে বশীভূত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা **২১১**

বাবা-মা সন্তানদের থেকে বয়সে বড় এবং সন্তানরা তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন **২১২**

সব সন্তানকে একই ছাঁচে ফেলা **২১২**

ছোটোদের কাছ থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ আশা করা **২১৩**

শিশুরা যা চায় তা-ই কিনে দেয়া **২১৪**

সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস, জনশ্রুতি (Myth) এবং এর খণ্ডন **২১৪**

করণীয়: ২৭-২৮ **২২০**

সপ্তম অধ্যায়: ২২১-২৩৯

যখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়

ভূমিকা **২২২**

রাগ, অবাধ্যতা, বদমেজাজ, ক্রোধ এবং অশ্রু **২২৪**

অবাধ্য সন্তানকে নিয়মের মধ্যে আনার কিছু উপায় **২২৪**

ভীতি প্রদর্শন: আপনি এবং আপনার শিশু কী করবেন? **২২৬**

আপনার শিশু বুলিড বা নির্যাতিত হলে পরবর্তীতে কী ঘটতে পারে? **২২৭**

টিনেজার: বয়ঃসন্ধিকালের ধারণা পর্যালোচনা **২৩০**

টিনেজার এবং আমাদের ক্রোধ **২৩২**

রাগী কিশোর-কিশোরীদের বাবা-মা হবার কারণে আমাদের মাঝেও ক্রোধের জন্ম হয় **২৩৪**

আমাদের নিজেদের জন্য ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য কী করতে পারি? **২৩৫**

উত্তম যোগাযোগের কিছু নীতি **২৩৫**

করণীয়: ২৯-৩০ **২৩৮**

ভূমিকা

মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে আর দান করা হয়েছে উন্নত চিন্তাশক্তি। কাজেই মানব শিশু লালন-পালনের জন্য দরকার তাত্ত্বিক (Theoretical) এবং বাস্তব (Practical) জ্ঞান। যেহেতু নতুন বাবা-মায়েদের এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থাকে না সেহেতু তাদের সন্তান গ্রহণের পূর্বেই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করে নেয়াটা জরুরি।

আমরা বাড়ি, গাড়ি বা দামি আসবাবপত্রের জন্য যতটা সময় ও শ্রম ব্যয় করি, দুঃখজনক হলেও সত্যি, সন্তানকে মানুষ করার জন্য সেই পরিমাণ চেষ্টা ও শ্রম দিতে চাই না। কিন্তু আবার আশা করি যে, আমরা সঠিক পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি ছাড়াই ভালো ফল পেয়ে যাব। মনে রাখা দরকার, শিশু লালন-পালন বিষয়টি ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে থাকার মতো ব্যাপার নয়।

সাধারণত দেখা যায় প্যারেন্টিং বিষয়ে বাইরের কোনো সহযোগিতা খুব একটি না থাকায় বাবা-মায়েরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে প্রায়শই ভুল করেন আর তারপর নিজেদের ভুল থেকে শেখেন (যাকে বলে Trial and Error)। এভাবে অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ফলে প্রথম শিশুর সময়ের তুলনায় পরের শিশুগুলোর সময় তারা বেশি দক্ষতার সঙ্গে প্যারেন্টিং করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হলো এভাবে যখন এ মূল্যবান দক্ষতা ও জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে তাদের আয়ত্তে চলে আসে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। সন্তানরা ততদিনে বড় হয়ে যায় আর তাদের ওপর এ জ্ঞান খাটানোর আর সময় থাকে না।

ভালো পারেন্টিং-এর গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক বেশি। চ্যালেঞ্জিং এই কাজের জন্য দরকার পূর্ব প্রস্তুতি ও অখণ্ড মনোযোগ। কাজেই আগে থেকেই এ বিষয় সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি। সর্বোপরি এজন্য নিজের কাছে স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের কাছে এবং পুরো পরিবারের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া জরুরি।

সন্তান লালন-পালনের মতো একটি কঠিন কাজের ক্ষেত্রে যোগাযোগ (Communication) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ তাকে উদ্দীপ্ত করে ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। বাবা-মায়েদের এটি জানা খুবই জরুরি যে, কখন ও কীভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তদপেক্ষা বেশি জরুরি এটি বুঝাতে পারা যে, কীভাবে ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনতে হবে এবং তাদেরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। বাবা-মায়েরা যেহেতু তাদের সন্তানদের অপরিসীম ভালোবাসেন সেহেতু সন্তানদের স্বার্থেই বাবা-মায়েদের নিজেদের যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) এবং শোনা ও বোঝার দক্ষতা (Listening Skill) বাড়াতে হবে। মনে রাখা জরুরি যে, যোগাযোগ একটি

দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এটিকে (শুধু বাবা-মা বলবে আর সন্তানরা শুনবে জাতীয়) স্থবির একমুখী করা ঠিক নয়। বাবা-মায়ের দায়িত্ব হলো কোনো রকম চাপ প্রয়োগ না করে সন্তানদের ভিতরের সকল সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা। এক্ষেত্রে অন্য বাবা-মায়েদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নতুন বাবা-মায়েদের তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

পুরনো সবকিছুই যে ভালো তা নয়। কাজেই বাবা-মায়েদের নতুন অনেক কিছুও বিবেচনায় আনতে হবে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন অনেক পরিস্থিতি ও সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে যার সমাধানের নতুন পথ খুঁজে বের করা জরুরি। সাধারণত প্রত্যেক বাবা-মা চান তার সন্তান সবার সেরা হোক। এ গ্রন্থে আমরা বাবা- মায়েরা সাধারণত যেসব নির্দোষ ভুল করে থাকেন সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব। এছাড়াও বাবা-মায়েরা সচরাচর যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন সে বিষয়ে আলোচনাও থাকবে এখানে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এ গ্রন্থে আনা হয়েছে তা হলো শিশুদের মধ্যে 'লিডারশিপ' এর গুণ (Leadership Trait) তৈরি করা। এ বিষয়টিকে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বা অদ্ভুত মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে, এখানে নেতৃত্বের যোগ্যতা বলতে ক্ষমতার পিছু নেয়া নেতাদের নেতৃত্ব বুঝানো হচ্ছে না বরং সৎ, দক্ষ ও ধীশক্তি সম্পন্ন নৈতিক মানুষ তৈরির কথা বলা হচ্ছে; যারা সমাজের দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সক্রিয় সদস্য হবে।

বর্তমানে অনেক কিশোর-কিশোরীর কাছে ঘরের চাহিদা একটি থাকার হোস্টেল আর খাওয়ার রেস্তোরাঁর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এমতাবস্থায় ঘরে সুখ-শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি বাবা-মা ও সন্তানদের উভয়ের জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। ঘর শুধু একটি থাকার স্থান না, বরং এটি একটি সৃজনশীল প্লাটফর্ম যেখানে পরিবারের সদস্যরা এক একজন অভিনেতা অভিনেত্রী। আর তাদের মধ্যকার কার্যকলাপ হলো অভিনয়ের স্ক্রিপ্ট। এ মঞ্চে প্রত্যেকের তার নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে জানা থাকা জরুরি।

এটি খুবই দুঃখজনক যে, অনেক বাবা-মা এবং সন্তান জানে না কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করতে হয়, যার ফলস্বরূপ পরিবারটি একটি অকার্যকর পরিবারে রূপান্তরিত হয়। অনেক বাবা-মা ও সন্তান একে অন্যকে ভয় পায় বা সন্দেহপূর্ণ চোখে দেখে- তারা জানে না কীভাবে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে হয়। এভাবে একসময় তারা একে অন্যকে বুঝতে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়, হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে পড়ে। পরিশেষে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

প্যারেন্টিং একটি বিশাল দায়িত্ব, যা পালন করা অবশ্যই কঠিন। কিন্তু তাই বলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে শেষ

সময় বলে কোনো কথা নেই। পুরনো ভুল নিয়ে বসে না থেকে বরং বিশ্বাস করতে হবে যে সম্পর্ক উন্নত করার সময় এখনো আছে। "যদি এটি করতাম", "যদি এটি না করতাম"- এমন হা-হুতাশ করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। অনুশোচনা বা 'যদি' জিনিসটি আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করে না। আমাদের ভুল কাজ দ্বারা হয়তো আমরা আমাদের পরিবারের ক্ষতি করে ফেলেছি। কিন্তু এটিও মনে রাখা দরকার যে, আমাদের নিয়তে ত্রুটি ছিল না; আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না ক্ষতি করা। কাজেই আগের ভুলগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট না করে আমাদের বেশি সময় ব্যয় করা উচিত সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। আমি কী করতে পারতাম বা আমার কী করা উচিত ছিল এটি নিয়ে পড়ে না থেকে আমাদের ভাবা উচিত এ মুহূর্তে কী করলে আমরা একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ পেতে পারি। এখন থেকে আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে ওয়াদাবদ্ধ হতে পারি যে, আমরা আগের থেকে ভালো (Better) বাবা-মা হবার চেষ্টা করব; পিছন নিয়ে হা-হুতাশ না করে বরং আমরা পিছনের ভুল থেকে শিক্ষা নেবো এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করব। অতীত তো কঠিন কঙক্রিটের মতো যা পাল্টানো সম্ভব নয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ হলো নরম কাদার মতো যাকে যেমন খুশি তেমন আকৃতি দেয়া যায়।

আজকাল অনেক বাবা-মা (আমরাসহ) মনে করেন যে, তাদের বাবা-মা হবার আগেই যদি প্যারেন্টিং-এর জ্ঞান ও কলা-কৌশল জানা থাকতো তাহলে অনেক ভালো হতো। এমন হলে তারা তাদের সন্তানদের আরো বেশি কার্যকরী পন্থায় লালন-পালন করতে পারতেন। বেশিরভাগ বাবা-মা মনে করেন যে, সন্তান লালন-পালনে আরো বেশি সময় দেয়া প্রয়োজন ছিল। পিছনের দিকে তাকালে আমরা দুঃখের সাথে অনুধাবন করি যে, আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি; এ মূল্যবান সময়টাকে আমরা অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পারতাম। আমরা আশা করি, আমাদের সন্তানরা আমাদের এ সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা করবে আর নতুন বাবা-মায়েরা আমাদের মতো ভুল করা থেকে বিরত থাকবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি ভুল থেকে কঠিন শিক্ষা পাবার কষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

এ সমস্ত পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এ গ্রন্থে সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা যাতে না হয় সে লক্ষ্যে প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা মাদকাসক্তি, যৌন বাহিত রোগ, অপরাধ কিংবা বিষণ্নতার মতো কঠিন সমস্যার সমাধান দিতে পারব- এমন নিশ্চয়তা তো দিতে পারি না। কিন্তু আমরা একটি প্রতিরোধধর্মী পারিবারিক গাইডলাইন দেবার চেষ্টা করব, যাতে এ ধরনের কঠিন

পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

যথাযথ প্যারেন্টিং-এর জন্য দরকার দক্ষতা ও প্রস্তুতি, যাতে সন্তানরা জীবনে সফল হতে পারে এবং বাবা-মায়ের জন্য গর্বের কারণ হতে পারে। আশার কথা হলো, প্যারেন্টিং-এর ব্যাপারে তথ্য ও কৌশল পাওয়া আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ। মূল্যবান কোনো কিছুরই যেমন সোজা বা শর্টকাট কোনো রাস্তা হয় না, তেমনি পারেন্টিং-এর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তবে আশার কথা হলো, উন্নততর বাবা-মা (Better Parent) হবার সময় কখনোই ফুরিয়ে যায় না; তাতে আপনার সন্তানের বয়স হোক চার কিংবা চল্লিশ।

সব বাবা-মাই চান তাদের সন্তান সুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষে পরিণত হোক। এ গ্রন্থটি আপনার সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আপনাকে সাহায্য করবে; আপনার সন্তানের সাথে একটি পরিপূর্ণ ও সফল সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করবে। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, "আপনার স্বপ্ন আপনাকে নয়, বরং আপনিই আপনার স্বপ্নকে এগিয়ে নিন"। যদিও আপনার কিশোর সন্তানকে গড়ার সর্বোচ্চ সময় ছিল দশ বছর আগে তার শৈশবে, কিন্তু সুযোগটি এখনো হাতছাড়া হয়ে যায় নি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সুযোগটি আজকে; কাজেই একে কাজে লাগান। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই আপনার নিয়ত ও চেষ্টাকে কবুল করবেন।

আমরা গ্রন্থটিতে পরিসংখ্যান ভিত্তিক কিছু তথ্য দিয়েছি, যাতে পাঠক বর্তমান পরিস্থিতির একটি সঠিক চিত্র পেতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পরিসংখ্যান সর্বদা পরিবর্তনশীল; কাজেই এ সংখ্যা থেকে ধারণা নেয়া যেতে পারে কিন্তু একে ধ্রুব ধরে নেয়া যাবে না।

এক গ্রন্থে সব দেশের, সব সংস্কৃতির সমস্যা তুলে ধরা সম্ভব নয়। আশা করা যায়, অনুবাদের সময় এ ব্যাপারটি মাথায় রেখে অনুবাদকগণ যতটা সম্ভব এটিকে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির কাছাকাছি নিয়ে যাবেন।

গ্রন্থটি মূলত সম্মানিত লেখকদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন যা তারা দীর্ঘকাল মুসলিম দেশে ও পশ্চিমে বসবাস করার মাধ্যমে অর্জন করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলার ওহি, রসুল সা.-এর নির্দেশনা ও মানব সভ্যতার অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় করা হয়েছে। জ্ঞানের এ তিন উৎসকে এখানে পরিপূরক হিসেবে আনা হয়েছে। এভাবে গ্রন্থটি সন্তান লালন-পালন বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভারসাম্যপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

লেখকবৃন্দ

নভেম্বর ২০১২, ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ

তিনি কাঁদতে কাঁদতে আসলেন, এটি ছিল ১৯৬৯ সাল

ভেজা চোখে এক মা বললেন, "ভাই আলতালিব, দয়া করে সাহায্য করুন। আমার মেয়ে, আমি ওকে কোলে-পিঠে বড় করেছি। যা চেয়েছে সবকিছুই তাকে দিয়েছি। এখন সে ১৯ বছরের কিশোরী। গত রাতে সে আমাকে ছেড়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছে। আমি জানি না এখন সে কোথায়"?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বোন, আপনি তাকে সবকিছু দিয়েছেন বলতে কী বোঝাচ্ছেন"?

তিনি বললেন, "খাবার, কাপড়-চোপড়, খেলনা, টাকা-পয়সা, যা যা তার দরকার ছিল সব"!

আমি বললাম, "তাকে কি ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন? কুরআনের শিক্ষা দিয়েছিলেন? রসুল সা., মুসলিমদের ইতিহাস, সংস্কৃতি"?

তিনি বললেন, " না, কিন্তু তাকে তার প্রয়োজনের সবকিছু দিয়েছি"!

আমি মনে মনে বললাম, "হায়! আমরা সন্তানদের আল্লাহ তাআলার শিক্ষা আর নৈতিক প্রশিক্ষণ না দিয়ে বড় করে তুলি আর আশা করি যে, তারা আবু বকর রা., উমার রা. এবং আলী রা.-এর মতো নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হবে। তেঁতুল গাছে আম-কাঁঠাল ধরে না। আমরা ১৯ বছর দেরি করে ফেলেছি। বোন, শুধু খাবার আর পোশাক-পরিচ্ছদেই মানুষের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ না"।

এরপরে এক বছরের অনেক ধৈর্য, ভালোবাসা, প্রজ্ঞা আর চেষ্টার পর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে সেই মেয়ে আর তার স্বামী (সেই প্রেমিক) ধীরে ধীরে ইসলামে ফিরে এসেছে- তারপর চার সন্তানসহ ধর্মের অনুশাসন মেনে সংসার করেছে।

যদি সত্যি সন্তানের জীবনে অবদান রাখতে চান, তবে তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলন। তারা যাতে মন থেকে অনুভব করে যে আপনার উপর তারা নির্ভর করতে পারে এবং তাদের যেকোনো প্রয়োজনে আপনি তাদের পাশে থাকবেন (এমনকি তারা ভুল করলেও)। সন্তানদের পিছনে সময়, চেষ্টা আর টাকা বিনিয়োগ হলো সব থেকে লাভজনক বিনিয়োগ! আপনার সন্তান যেন আপনাকে সর্বদাই বলছে -

"বাবা-মা-

আমাদের পিছনে ফেলে সামনে যেও না, কারণ আমরা হয়তো তোমাদের অনুসরণ করতে পারব না।

আমাদের সামনে হাঁটতেও বলো না, কারণ আমরা হয়তো তোমাদের পথ দেখিয়ে সামনে নিতে পারব না।

তবে আমাদের সাথে থেকো, বন্ধুর মতো"। (Albert Camus)

আপনি কি এ আর্জি শুনতে পান?

প্রথম পর্ব

প্যারেন্টিং: ভিত্তি প্রস্তুতকরণ

প্রথম অধ্যায় : সুষ্ঠু প্যারেন্টিং বলতে কী বুঝায়? কীভাবে এটি আমরা শুরু করব? **১৯**

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবার-এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা **৫৫**

তৃতীয় অধ্যায় : সন্তান লালন-পালনের সর্বোত্তম পন্থা: জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ **১৩৭**

চতুর্থ অধ্যায় : সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য: শিশুদেরকে এরূপে গড়ে তোলা যেন তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে **১৫৭**

পঞ্চম অধ্যায় : সাধারণ চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ **১৯১**

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রচলিত ভুল ধারণা, ভ্রান্তি ও জনশ্রুতি এবং এ থেকে বাঁচার উপায় **২০৭**

সপ্তম অধ্যায় : যখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায় **২২১**

প্রথম অধ্যায়

সুষ্ঠু প্যারেন্টিং বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এটি আমরা শুরু করব?

- ভূমিকা ২০
- শিশুর বিকাশের ধাপসমূহ ২৩
- সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি: প্যারেন্টিং-এর বিভিন্ন ধরন ২৪
- সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি কীভাবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে? ৩০
- সুষ্ঠু প্যারেন্টিং-এর সূচনা: ভবিষ্যৎ কাজের পূর্ব প্রস্তুতি ৩২

  মনে রাখুন যে, শিশুকে লালন-পালন একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া ৩৩

  সঠিক লক্ষ্য স্থির করুন এবং অবিরাম এর উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান ৩৪

  মূলনীতিগুলো চর্চার মধ্যে রাখুন এবং অন্য বাবা-মায়েদের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করুন ৩৪

  নিজে শিশুদের জন্য ভালো আদর্শ হোন এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলুন ৩৫

  শিশুদেরকে ভুল ও সঠিকের পার্থক্য করতে শেখান ৩৫

  উন্নতি সাধনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালান এবং মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বদ্ধমূল করে দিন ৩৬

  সংলাপের কৌশলে দখল অর্জন ও উন্নতি সাধন করুন ৩৬

  সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালন উপভোগ করুন ৩৭

- সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক তথ্যের ব্যবহার ৩৯
- উপসংহার ৪৮
- করণীয় ০১-০৭ ৪৯

ভূমিকা

একটি সুখী শান্তিপূর্ণ পরিবার- যেখানে সবাই মিলেমিশে বসবাস করছে, একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে, সন্তান-সন্ততিরা ধর্মের অনুশীলন করছে এবং সর্বোপরি যে পরিবারগুলো সুসমন্বিত - তাদের দেখে অনেকে মনে করেন এসব বুঝি নিজ থেকে এমনি এমনি হয়ে গেছে। আসলে কি তাই? না, এসবের পিছনে রয়েছে কঠিন পরিশ্রম। এটি সন্তানদের সঙ্গে বাবা-মায়ের সুগভীর উন্নত সম্পর্কের ফসল। ভালো প্যারেন্টিং আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মতো। বলা যেতে পারে, এটিই সন্তানদের সঠিক আবেগ-অনুভূতি, তাদের মানসিক এবং দৈহিক বিকাশের মূল চাবিকাঠি।

এক কথায় ভালো প্যারেন্টিং শিশুদের ভালোবাসাপূর্ণ একটি উষ্ণ পরিবেশ দেয় যেখানে তারা পুরোপুরি বিকশিত হতে পারে। বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজ সন্তানদের মজবুত সম্পর্ক তৈরি হতে একটি ইতিবাচক পরিবেশ দরকার যেখানে পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ (Improve Communication) সাবলীল হয়; ফলে বাবা-মা ও সন্তান-সন্ততি পরস্পরকে বুঝতে পারে এবং একে অন্যের কাছাকাছি আসতে পারে। সফল যোগাযোগের জন্য কী প্রয়োজন? ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনাবোধই সফল যোগাযোগ ও সুগভীর সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রুক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সার্বক্ষণিক সমালোচনা পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে ইতিবাচক যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কই শিশুদেরকে উৎসাহিত করে উৎকর্ষ সাধনের কঠোর চেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে।

আজকের দিনে মুসলিম প্যারেন্টিং আপাদমস্তক সমস্যায় জর্জরিত। অধিকাংশ বাবা-মায়ের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় লেখাপড়া জানা না থাকায় (বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না নেয়ায়) তারা প্যারেন্টিং বা শিশু লালন-পালনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় বেশ আনাড়ি থেকে যান। তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন নিজেদের বাবা-মা ও আত্মীয়দের অনুশীলন করা রীতি এবং নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি বা কমন সেন্সের ওপর।

এর বেশির ভাগই সেকেলের, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, সময় অনুপযোগী ও গবেষণাহীন। আমাদের মনে রাখা জরুরি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্যারেন্টিং জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভুল ছিল না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব অথবা সেসময় প্যারেন্টিং সম্ভবত একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক অর্থ বহন করত। ফলে এই উৎস থেকে আহরিত জ্ঞান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান সময়ের প্যারেন্টিং সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়।

অনেক বাবা-মা রয়েছেন যারা উচ্চশিক্ষিত কিন্তু অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে সন্তান লালন-পালন করেন। অনেক বাবা-মা আবার অন্য কোনো বাবা-মা অথবা প্রতিবেশীদের অনুসরণ করেন যারা নিজেরাই এ বিষয়ে স্বচ্ছ কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখেন না। আবার অনেকে নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো সন্তানের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ আছেন যারা বাবা-মা হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন অথবা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেন; আর সঠিক উপলব্ধির অভাবে কিংবা সময়ের অভাবে প্যারেন্টিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরোপুরি ছেড়ে দেন কাজের লোক, স্কুল শিক্ষিকা, আত্মীয়, নিকটজন, টেলিভিশন বা কম্পিউটার গেমের ওপর। এটি বিশেষভাবে কিছু তেল সমৃদ্ধ দেশের বৈশিষ্ট্য। যেখানে কাজের লোক দ্বারা শিশুপালনের অশুভ চর্চা শিশুর চরিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। এ গ্রন্থে আমাদের লক্ষ্য হলো এসব সমস্যা সংশোধনে বাবা-মাকে সাহায্য করা এবং তাদের নেহাত নির্দোষ ভুলগুলো দূর করা অথবা নিদেনপক্ষে কমানো। বলতে পারেন যে, আমরা আপনাদের একটি ভালো বীমা নীতির প্রস্তাব করছি যা প্যারেন্টিং-এর অধিকাংশ সাধারণ ভুল ও চোরা গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে বাবা-মাকে রক্ষা করবে।

দুর্ভাগ্যবশত অনেক সময়ই প্যারেন্টিং-এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়কে খুব হালকাভাবে নেয়া হয় এবং এ বিষয় নিয়ে খুব কমই চিন্তা করা হয়। অথচ এ বিষয়টি অনেক বেশি চিন্তা ভাবনার দাবি রাখে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মধ্যে কতজন বাবা-মা আছেন যারা এমন একটি আমানতদারিতাপূর্ণ কাজ নিয়ে আগে থেকেই যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে ভেবেছেন? যদি আমরা এমনটি ভাবতে পারতাম তবে তা আমাদের জন্য উপকারীই হতো। আমাদের একথা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে প্যারেন্টিং-এর জন্য পরিকল্পনা, কৌশল এবং দক্ষতার মিশেল অপরিহার্য।

আসুন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখি:

প্রশ্ন ১ : কোন কাজে ব্যবস্থাপনা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, নার্সিং, রন্ধনশিল্প এবং যোগাযোগসহ সবরকম জ্ঞানের দরকার হয়?

প্রশ্ন ২ : কোন কাজের জন্য কোনো ডিগ্রি, সত্যায়নপত্র এমনকি একটি লাইসেন্সেরও দরকার পড়ে না?

প্রশ্ন ৩ : কোন কাজটি সব থেকে বেশি অবহেলা, না বোঝা অথবা ভুল বোঝার শিকার?

প্রশ্ন ৪ : কোন কাজটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা একজন মানুষের সারা জীবন, পূর্ণাঙ্গ বয়স, এমনকি তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনকেও প্রভাবিত করে?

প্রশ্ন ৫ : কোন কাজটি শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে?

এসব প্রশ্নের এক ও একমাত্র উত্তর হলো প্যারেন্টিং

একবার ভাবুন: ডিগ্রি বা দক্ষতা না থাকলে আমরা কোনো মেকানিক, মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান বা ডাক্তার নিয়োগ করি না। কিন্তু প্যারেন্টিং-এর ওপর কোনো ধরনের ট্রেনিং বা জ্ঞান ছাড়াই আমরা বাবা-মা হয়ে যাই। এসএসসি সার্টিফিকেট পেতে আমাদের ১০ বছর সময় লাগে, কিন্তু বাবা-মা হবার জন্য এক বছরের লেখাপড়ারও দরকার হয় না। উন্নত দেশে গাড়ি চালাতে, শিকার করতে, এমনকি মাছ ধরতেও লাইসেন্স লাগে, কিন্তু আমরা বাবা-মা হবার জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আমরা অধিকাংশ বাবা-মায়েরা কী করছি আসলে? আমরা পিতৃত্ব-মাতৃত্বের দায়িত্বগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি না। এর পিছনে চিন্তাভাবনা, চেষ্টা ও সময় খরচ না করেই ভাবছি আমাদের সন্তান সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হবে। সচরাচর যে চেষ্টাগুলো আমরা করি। তা হলো- শিশুদের লেখাপড়ার দেখাশোনা, স্কুলের ফলাফলের খোঁজ-খবর রাখা, মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়া, শিশুদের নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে যাওয়া, উপহার দেয়া ইত্যাদি। এসবের বাইরে আরো যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সে ব্যাপারে বাবা-মায়েরা থাকেন একেবারেই উদাসীন।

লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছানোর ফাস্ট ট্র্যাক (Fast Track) কোনো মডেল আমাদের কাছে নেই। আমরা শুধু একটি প্রক্রিয়ার কথা বলতে পারি যা বাস্তবায়ন করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকটা সহজ হতে পারে। আমরা নিশ্চিত যে, ভালো

প্যারেন্টিং-এর সুদীর্ঘ রাস্তাটি সবসময়ই সংস্কারযোগ্য; প্যারেন্টিং করতে করতেই প্রতিনিয়ত যার উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যেতে হয়। আমরা আপনাদের কোনো শর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত পথ দিতে পারছি না। কেননা এর আসলে কোনো শর্টকাট হয় না।

শিশুর বিকাশের ধাপসমূহ

ছয় তক্ত, সন্তান যখন নেই; যখন ছয় সন্তান, কোনো তক্ত নেই

বিয়ের আগে সন্তান লালন পালনের জন্য আমি ছয়টি তক্ত ঠিক করে রেখেছিলাম। এখন আমার ছয়টি সন্তান, কিন্তু কোনো তক্ত নেই।
John Wilmont, EARL OF ROCHESTER
(Brown, 1994)

প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে যে, শিশুরা বিকাশের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বড় হয়। এ ধাপগুলো জানা ও বুঝা বাবা-মার জন্য জরুরি। কারণ প্রতিটি ধাপেই চাহিদা অনুযায়ী প্যারেন্টিং-এর ধরন পরিবর্তন করতে হয়। শিশুর বিকাশ ও উৎকর্ষের ধাপগুলো হলো: ১. নবজাতক, শৈশব (টডলারস) এবং প্রাক-প্রাথমিক (০-৭); ২. কিশোর বা প্রি-টীনজ (৮-১১); ৩. কিশোর-তরুণ বা ইয়াং-টীনজ (১২-১৪); এবং ৪. তরুণ বা টিনেজার বা ইয়াং-এডাল্টস (১৫-২২)। এসব ধাপে সন্তানদের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হয় যা বাবা-মায়ের বোঝা ও পূরণ করা জরুরি।

মূলত শিশুরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার স্তর থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যায়। বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে ক্রমবৃদ্ধির এ ধাপসমূহ নিয়ে সফল আলোচনা হওয়া জরুরি। দ্বন্দ্ব (conflict) বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, কিশোর-তরুণদের (ইয়াং এডাল্ট ১৫-২২) ও বাবা-মায়ের মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কাজ করে। এ সময় এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সম্পদ যেমন টাকা পয়সা, থাকার জায়গা, সময় এসবের ব্যবহার নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। তারুণ্যের পরে সন্তানরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তারা স্বাবলম্বী হয়ে যায়। এসময় বাবা-মায়ের দায়িত্ব হলো তাদেরকে নিজের মতো করে চলতে দেয়া আর

অন্যদিকে নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। কিন্তু অনেক বাবা-মা বয়স্ক সন্তানদের ওপর ভালোবাসা বা অধিকারের নামে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চান। তারপর একটি সময় আসে যখন এ সমীকরণ উল্টে যায়। শেষ বয়সে এসে সম্ভবত বাবা-মায়েরাই সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কাজেই দেখা যায় স্বাবলম্বিতা মূলত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা; যা বাবা-মা ও সন্তান উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, উপদেশ, মতবিনিময় এবং একে অন্যের দেখাশোনা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি: প্যারেন্টিং-এর বিভিন্ন ধরন

এখানে আমরা প্যারেন্টিংয়ের চারটি মূল ধরন চিহ্নিত করব। সাধারণত বেশিরভাগ বাবা-মায়েরা এ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করেন। তবে একথাও সত্য যে, এ চারটি প্রধান শ্রেণি বিভাগ ছাড়াও প্যারেন্টিং ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে।

১. একক কর্তৃত্ব পরায়ণ/ একনায়কতান্ত্রিক (Authoritarian/ Dictatorial): এ ব্যবস্থায় বাবা-মায়েরা প্রত্যাশা করেন যে, ছেলেমেয়েরা তাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত হবে এবং অবাধ্য হলেই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

২. কর্তৃত্বশীল (Authoritative): এ ব্যবস্থায় বাবা-মা আশা করেন যে, সন্তানরা তাদের কথা শুনবে এবং তার বিপরীতে বাবা-মা ও সন্তানদের প্রয়োজনে সাড়া দেবেন। এ ধরনের বাবা-মা তাদের নিয়ম-নীতির একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন সন্তানদের কাছে এবং এ নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষে যুক্তি হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সুবিবেচিত কারণ তুলে ধরেন। এতে শিশুরা বুঝতে পারে যে, বাবা-মায়ের প্রত্যাশাটি স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা অর্থহীন নয়।

৩. অতীব সহনশীল ধরন (Permissive): এ পদ্ধতিতে বাবা-মায়েরা সন্তান যেমন চায় তেমনটি করারই অনুমতি দেন। তাই

এখানে দ্বন্দ্ব খুবই কম, কারণ বাবা-মা সন্তানের চাওয়ার কাছে সবসময়ই নতি স্বীকার করেন।

৪. অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক (Democratic): এ পদ্ধতিতে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সন্তানদের সম্পৃক্ত করেন।

সাধারণত সমাজবিজ্ঞানীরা কর্তৃত্বশীল (Authoritative) প্যারেন্টিং-এর পদ্ধতিটিকে সমর্থন করেন। আপনার সন্তান পালনের নিজস্ব ধরনটিকে যাচাই করে নিন এবং সিদ্ধান্ত নিন এ চারটি ধরনের কোনটিতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। নিজেকে প্রশ্ন করুন কেন আপনি এ ধরনকে পছন্দ করছেন; আর কেন আপনি এ বিশেষ পদ্ধতিতে আবদ্ধ রয়েছেন? এ ধরনের আত্মবিশ্লেষণ আপনাকে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দেবে। আর এভাবেই আপনি আপনার ভালো দিকগুলো আরো বাড়াতে পারবেন এবং দুর্বল দিকগুলো সেরে নিয়ে ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারবেন।

স্বেচ্ছাচারী/শাসনমূলক (Authoritarian) সন্তান লালন পদ্ধতির ওপরে একটি টিকা: বল প্রয়োগ আর ভীতির এক সংস্কৃতি

মুসলিম এবং কিছু সংখ্যালঘু জাতির মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বিশ্বাস রয়েছে যে, সন্তান লালনের ক্ষেত্রে শাসনমূলক পদ্ধতি একটি কার্যকর পন্থা। এ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সন্তানদের খারাপ আচরণগুলো বন্ধ করা যায়। মজার ব্যাপার হলো, এ মতবাদটি ভালো আচরণ ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির জন্য উৎসাহ প্রদান করার বদলে নেতিবাচক আচরণ প্রতিরোধের ওপরে বেশি জোর দেয়। এ পদ্ধতিতে পারিবারিক প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নয় বরং ভীতি প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা প্রাধান্য পায়। এ পরিবেশ থেকে আসা শিশুরা ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল হয়। তারা বৃহৎ পরিসরে সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। এ পদ্ধতি যেহেতু বহুল প্রচলিত এবং এর প্রতিক্রিয়া যেহেতু শিশুদের ওপর নেতিবাচক, তাই এ বিষয়ে আমরা আরো একটু গভীরভাবে আলোকপাত করতে চাই।

মুসলিম বাবা-মায়েদের প্রচলিত প্যারেন্টিং পদ্ধতি হচ্ছে কড়া শাসনের

প্রয়োগ ও কর্তৃত্বপরায়ণতা, যেখানে পারস্পরিক সংলাপ, অংশগ্রহণ আর পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এভাবে মুসলিম পরিবারের ভিতরে কর্তৃত্বপরায়ণ রীতির বীজ খুব ছোটোবেলা থেকেই শিশুমনে বপন করা হয়। এরপর সূক্ষ্মভাবে তার প্রসার ঘটে বাড়ির বাইরে যেমন স্কুলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং চূড়ান্তভাবে সরকার ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে।

পরিবারে বাবার জবরদস্তিমূলক আধিপত্য থাকে সন্তানদের ওপরে; ছোটোদের ওপরে থাকে বড়দের এবং মেয়েদের ওপরে ছেলেদের। পুরুষরা সাধারণত হয় কর্তৃত্বশীল মনিব; পুরো পারিবারিক আবহের কোথাও অংশীদারিত্ব এবং দায়িত্বশীলতার ধারণার অস্তিত্ব মেলে না। অথচ রসুল সা. পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতাকে উৎসাহিত করে বলেছেন:

তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল)। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে (বুখারি)।

আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতি হচ্ছে বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে কোনটা করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না তার একটি স্বেচ্ছাচারী তালিকা তৈরি করে দেন। কিন্তু এসবের জন্য কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করেন না। সন্তানরা ব্যাখ্যা জানতে চাইলে রুটিন মাফিক জবাব দেন: 'তোমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে করো'; 'এটি এভাবেই করতে হয় '; 'এটিই নিয়ম'; 'আমি যেভাবে বলছি সেভাবে করো, আমার কাজ অনুকরণ করো না' অথবা 'বেশি তর্ক করো না'। অনুসন্ধিৎসু শিশুরা তাদের আগ্রহের জন্য কখনো কখনো কঠোর ভর্ৎসনার মুখোমুখি হয় এবং বেয়াদব, অভদ্র বা অবাধ্য হিসেবে অভিযুক্ত হয়। আবার অনেক সময়ই জবাব জানা না থাকলেও অনুসন্ধিৎসু শিশুদের চুপ করানোর জন্য 'এর জবাব আমার জানা নেই'- এটি না বলে বাবা-মা অযথার্থ একটি জবাব দিয়ে দেন।

এর মানে এটি নয় যে, এ ধরনের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের যত্ন নেন না; বরং তারা তাদের সন্তানদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসেন এবং অনেক বেশি যত্ন নেয়ার চেষ্টা করেন। তথাপি সমস্যা হচ্ছে কঠোর হওয়া এবং নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টায় তারা কার্যত (অনেকটা অজান্তে) আধিপত্যসুলভ আচরণ করেন। মনে রাখতে হবে, আধিপত্য বিস্তার আর প্রশিক্ষণ এক নয়। এ ব্যাপারটি অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়। মূলত আধিপত্যসুলভ স্বভাব

আবেগীয়, মনঃস্তাত্ত্বিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ গড়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর। আধিপত্য নয় বরং শিশুদেরকে লালন-পালন করার জন্য বাবা-মায়ের উচিত তাদেরকে অংশগ্রহণমূলক পরামর্শের[১] আওতায় আনা, যাতে তারা তাদের মতামত প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কুরআনে বলা হয়েছে:

> যাদের কাজ-কর্ম পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।
>
> (সুরা আশ শূরা, ৩৮)

> আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয়সম্পন্ন। আপনি যদি রূঢ় চিত্তের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। তাই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। এরপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন। আল্লাহর উপর ভরসাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন।
>
> (সুরা আলে ইমরান, ১৫৯)

আধিপত্যসুলভ ও কড়া শাসনমূলক আচরণের ফলে শিশুরা আপাতদৃষ্টিতে তাদের বাবা-মায়ের প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার করলেও সেটি হয় বিশ্বাস ও ভালোবাসা বিবর্জিত ভয় নির্ভর ফাঁপা সম্মান। ভয় (অর্জিত ভয় এবং সহজাত ভয়) বিষয়ে ১৫ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এ ধরনের কর্তৃত্বমূলক আচরণ শিক্ষাব্যবস্থায়ও বিদ্যমান; যেখানে শিক্ষকদের প্রতি শিশুদের সম্মান শিক্ষাপ্রীতির কারণে না হয়ে বরং শিক্ষকের অসন্তোষ বা শাস্তির ভয়ে হয়ে থাকে। এর ফলস্বরূপ অনেক শিশু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আশানুরূপ ভালো ফলাফল করতে পারে না। অনেক দেশের মতো আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও জবরদস্তিমূলক শিক্ষানীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন- বুঝেশুনে বা হাতে কলমে শেখার বদলে আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষাই বইভিত্তিক ও মুখস্থ নির্ভর।

এমতাবস্থায় বাবা-মা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাহবা দেবার তেমন কোনো সুযোগ নেই। এ প্রক্রিয়ায় তারা এমন কিছু মানুষ গড়ছেন যাদের মানসিক গঠন

---

[১] Participative Consultation.

ও সামাজিক আচরণ একনায়কসুলভ এবং কর্তৃত্বপরায়ণতার আদলে তৈরি হচ্ছে। যার প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখতে পাই মুসলিম দেশগুলোর সরকারি প্রশাসনে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, সামাজিক আন্দোলনে, পুলিশ বিভাগে, জাতীয় সেনাবাহিনীতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কারখানাগুলোতে প্রভু ও ভৃত্যসুলভ আচরণ। এ পরিস্থিতির মধ্যেও যে একদল হাতে গোনা ব্যক্তি এ শিক্ষাব্যবস্থার কুপ্রভাবের বাইরে থাকতে সমর্থ হন বা সমাজের এ নেতিবাচক ধারায় নিমজ্জিত হন না, তাদের তেমন কোনো অবলম্বন থাকে না। তারা হয় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনজোয়ারের সাথে গা ভাসিয়ে চলার দ্বিমুখীতায় বাধ্য হন, নয়তো এ ঘুনেধরা সমাজের মধ্যে বেমানান কন্টক হয়ে বেঁচে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাদের ভোগ করতে হয় মানসিক যন্ত্রণা আর হতাশা।

মুসলিম মানসে যেমন সংকট বিরাজ করছে তেমনি মুসলিম পরিবারগুলোতে শিশু লালন-পালনে, বিশেষ করে শিশুদের সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগ অনুভূতি গঠনেও বিরাজ করছে এক গভীর সংকট। সমন্বিত পদ্ধতিগত সুশৃঙ্খল নীতির অভাব[২] এবং জ্ঞানের খণ্ডিত ও বিভক্তিকরণ[৩] মুসলিম সংস্কৃতি ও চিন্তায় বিকৃতি সাধন করেছে। এসবের সাথে সাথে প্যারেন্টিং-এ দক্ষতা ও মনোযোগের অভাব শিশুদের সুষ্ঠু আবেগগত ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে 'ইমরান (সভ্যতা বিনির্মাণ ও উন্নয়ন), ইতকান (উৎকর্ষ) এবং তাফাক্কুর (অনুসন্ধিৎসা)'-এর ধারণা বর্তমান মুসলিম পরিবারগুলোর সন্তান প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং আমাদের সন্তান লালন-পালন অনেকটাই পরিকল্পনাহীন ও চিন্তাহীন এবং বশ্যতা ও অনুকরণমূলক। চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তব এবং নিয়মানুগ হওয়ার বদলে মুসলিমরা হয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা জিন আর জাদুর[৪] ধারণায় নিমজ্জিত এবং বিজ্ঞানমনস্কতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এক্ষেত্রে অনেকেই মনে করেন, এই যে বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা এবং মানসিকতার সংকট যা মুসলিম উম্মাহকে প্রায় পঙ্গু বানিয়ে ফেলেছে তা থেকে উম্মাহকে বের করে আনার দায়িত্ব মুসলিম চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের উপরে। এ কথা সত্যি যে, এক্ষেত্রে তাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বস্তুত সমস্যার

---

২ Lack of a Coherent Methodological Approach.

৩ Fragmentation and Compartmentalization of Knowledge.

৪ জ্বিন ও জাদুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু এসবের কার্যকারিতায় বিশ্বাস ও এসবের অনুশীলন করার কুসংস্কার আমাদের সমাজকে পেয়ে বসেছে।

সমাধানের মূলে রয়েছেন বাবা-মা। বাবা-মায়েরা যদি এটি উপলব্ধি করতে পারেন তবে তাদের দ্বারাই সম্ভব সুস্থ, সবল, ভারসাম্যপূর্ণ, কুসংস্কারমুক্ত চিন্তাশীল সন্তান ও প্রজন্ম গঠন; যারা নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এবং চূড়ান্তভাবে মুসলিম উম্মাহর পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

বর্তমানকালে শিশু প্রতিপালনের দুঃখজনক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- বাবা-মায়ের সীমাহীন মূর্খতা, যা তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা;
- সমাজে বিদ্যমান ভীতির সংস্কৃতি, যা সৃষ্টিশীলতা এবং উদ্যমের পরিবর্তে কেবল গোলামী মানসিকতার জন্ম দেয়;
- সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের পরিবর্তে অন্যদের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্য (ভেড়ার পালের মানসিকতা) এবং
- পরিবারে ও রাষ্ট্রে আধিপত্য ও দমনমূলক নীতির চর্চা।

একটি সভ্যতার বিকাশ বা ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে প্যারেন্টিং পদ্ধতির অভ্যন্তরে। সন্তান প্রতিপালন এমন একটি বিষয় যা একটি পরিবার, সমাজ এবং একটি সভ্যতার বিনির্মাণ করতে পারে কিংবা এর ধ্বংস সাধন করতে পারে। সভ্যতা বিনির্মাণের কাজ কোনো খণ্ডকালীন কাজ নয় বরং এটি একটি অনিঃশেষ কাজ; এটি একটি জীবন পদ্ধতি এবং অব্যাহত গতিশীল প্রক্রিয়া। এর শুরু আছে; শেষ নেই। সভ্যতা বিকশিত এবং উন্নত হওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে। এটি ক্রমাগত অনুসন্ধান, আবিষ্কার এবং উৎকর্ষের (ইহসান) বিষয়। বাবা-মায়েদের প্রতি অনুরোধ প্যারেন্টিং-এর এ শক্তিকে উপলব্ধি করুন এবং বৃহত্তর সমাজে সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতির যে বিশাল প্রতিফলন তা নিয়ে ভাবুন।

বাবা-মায়ের ভয় ও দমনের মধ্যে বড় হওয়া শিশুরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। পরিণামে এসব শিশুরা দায়িত্বানুভূতিহীন হয়ে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অদক্ষ হয়ে বেড়ে ওঠে। ভয়ের মধ্যে থাকা শিশুরা নিজেদের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যেতে যেতে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে অনীহা তৈরি হয় এবং তারা নেতার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস হারিয়ে ফেলে। এর পরিণামে সমাজে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে বেড়ে ওঠা শিশুরা শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি মেনে নেবার মানসিকতাসম্পন্ন এবং সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ও

নির্লিপ্ত মানুষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া সমাজ থেকে টিম স্পিরিট নষ্ট করে দেয়; 'সবে মিলে করি কাজ'- মানসিকতাকে গলা টিপে হত্যা করে এবং সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গড়ে ওঠাকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুর মনে গেঁথে দেয়া এ পশ্চাদমুখী এবং স্থবির কুসংস্কারের সংস্কৃতি পরিণামে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নকে রোহিত করে।

ইসলামি সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বিকশিত হতে পেরেছিল কারণ সেসময় শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো মনে রাখা হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেসময় শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়টি শিশুপালনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হতো; মনোযোগ দেয়া হতো শিশুর প্রয়োজনীয় মানসিক ও আবেগিক উন্নয়নের দিকে। আমাদের সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। 'কেন এমন উন্নত একটি সংস্কৃতি ক্ষয় পেতে পেতে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে চলে গেল?' এ প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে একটি বিষয়ের মধ্যে- 'জন্মের পর থেকে কীভাবে আমরা আমাদের শিশুদেরকে গড়ে তুলছি'। এর পরে মুসলিম ইতিহাসে অসংখ্য মহতী সংস্কারের উদ্যোগ ঘটেছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ উদ্যোগেই প্যারেন্টিং বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়নি।

সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি কীভাবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে?

আমাদের বাবা-মায়ের সাথে আমাদের সম্পর্ক আর আমাদের সন্তানদের সাথে আমাদের আচরণ-এ দুয়ের মধ্যে কি কোন যোগসূত্র আছে? যেসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের সাথে খারাপ আচরণ করেন, তারা প্রায়ই বলেন, তারাও শৈশবে এরূপ খারাপ আচরণ পেয়েছেন। একজন ব্যক্তির বাল্যকালের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা কি তার পরিণত বয়সে শিশু প্রতিপালনের একটি আন্তরিক, সংবেদনশীল এবং উদ্দীপনাময় পদ্ধতির উৎস হতে পারে? সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি কি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এভাবে স্থানান্তরিত হয়?

একজন মা অথবা বাবার নিজের শৈশবের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে তার সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতিতে প্রভাব রাখে। সাধারণত কোনো বাবা-মা তাদের নিজেদের শৈশবে অনুকূল ও সহায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করলে তারাও তাদের নিজেদের সন্তানদের বেলায় আন্তরিক, সংবেদনশীল এবং অনুপ্রেরণাদায়ী বাবা-মায়ে পরিণত হন। অনুকূল ও সহায়ক প্যারেন্টিং শিশুর তিন বছর বয়স থেকেই তার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে (Baumrind, 2008)।

সাধারণত ছোট শিশু ও টডলার শিশুদের সাথে মায়েদের চেয়ে বাবাদের আচরণ ভিন্ন হয়। যদিও বেশির ভাগ বাবা-মাই তাদের দায়িত্বশীলতা, উদ্দীপনা, স্নেহ-মমতা এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমান, কিন্তু বাবারা সাধারণত মায়েদের চেয়ে শারীরিক কার্যক্রম ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বেশি করে থাকেন। আবার বাবা-মা উভয়ই মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তানের সাথে বেশি খেলাধুলা করেন। বাবা-মায়ের শিক্ষাগত স্তরও পরবর্তীকালে স্কুল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের সাফল্যকে প্রভাবিত করে। মজার ব্যাপার হলো, বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা যত বেশি হয়, সহায়ক হিসেবে মা তত বেশি শিশুদের সাথে সময় কাটান ও যত্ন নেন (Ricks, 1985)।

শিশু লালন-পালনে আমরা যেমন আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করি তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের থেকে ভিন্নতাও অবলম্বন করি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শিশুপালন পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক। যেমন জরিপে দেখা গেছে প্রায় অর্ধেক দাদা-দাদি/নানা-নানি মনে করেন, তারা যেভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে বড় করেছেন, তাদের নাতি-নাতনিরা তার চেয়ে ভিন্নভাবে বড় হচ্ছে। তাদের অর্ধেক বলছেন, তারা নিজেরা বাবা-মা হিসেবে যতখানি উদার ছিলেন, তাদের সন্তানরা নিজেদের সন্তানদের সাথে তার চেয়েও বেশি উদার। অর্ধেকের কিছু কম সংখ্যক বলছেন, তারা নিজেদের সন্তানদের দিয়ে বাড়িতে যে পরিমাণ কাজ করাতেন, তাদের সন্তানরা নাতি-নাতনিদেরকে তার থেকে অনেক কম কাজ দিচ্ছে; তারা তাদের সন্তানদেরকে যতটা সুযোগ-সুবিধা দিতেন তার চেয়ে তাদের নাতি -নাতনিরা বেশি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে (Zogby International, 2006)। সব চিন্তাশীল বাবা-মাই নিজস্ব সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে নিজেদের শৈশবে তারা কীভাবে লালিত হয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা ও

পর্যালোচনা করার প্রয়াস পান। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা কখনো কখনো সেই পদ্ধতির অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি করেন। আবার কখনো কখনো নিজেদের সন্তানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির কিছুটা উন্নয়ন সাধন করেন।

বাবা-মা যতই চেষ্টা করুক না কেন তাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্তানরা এক একজন স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন মানুষ। তারা স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী এবং তাদের কৃতকর্মের দায় ও জবাবদিহিতা তাদের নিজেদেরই। বাবা-মা সর্বোচ্চ যা করতে পারেন তা হলো তাদের সহায়তা এবং পথনির্দেশ দান; যাতে একদিন তারা আনন্দ ও গর্বের সাথে বলতে পারেন যে, 'আমরা বাবা-মা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি'।

সুষ্ঠু প্যারেন্টিং-এর সূচনা: ভবিষ্যৎ কাজের পূর্ব প্রস্তুতি

সুষ্ঠু প্যারেন্টিং শুরু হয় গর্ভে সন্তান আসারও অনেক আগে। যেমন, বিয়ের জন্য ভালো সঙ্গী বাছাই করা মূলত বিবাহপূর্ব প্যারেন্টিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে বিয়ের পূর্বেই প্যারেন্টিং-এর সচেতনতা শুরু হয়ে যায়। বিয়ের পরে গর্ভবতী মাকে তার স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দিকে নজর দিতে হয়। আবার দেহে যাতে কোনো ক্ষতিকর পদার্থ প্রবেশ না করে সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়। বাবাকেও নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে হবু মায়ের যত্ন নিতে হয়। যতদূর সম্ভব তার কাজ লাঘব করে দিতে হয় এবং তার যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম, ঘুম ও আরামের সুযোগ করে দিতে হয়।

এ গ্রন্থে আমরা সুষ্ঠু প্যারেন্টিং-এর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ওপরে বাবা-মাকে একটি সার্বিক ধারণা দেবার চেষ্টা করব। আমরা বিশ্বাস করি, আগে থেকেই ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জগুলোর আসল পরিধি বাবা-মায়ের জানা থাকলে সেগুলো মোকাবিলা সহজ হয়। পূর্ব ধারণা তাদের জটিলতাগুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে; পরিস্থিতিকে অতি বিশাল কিংবা অতি তুচ্ছ করে দেখার ভ্রান্ত ধারণা থেকে বিরত রাখে। তারা যদি মনে করেন সন্তান প্রতিপালন খুবই সহজ, তাহলে নিজেদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজন অনুভব করবেন না।

আবার যদি তারা মনে করেন এটি অতীব জটিল কাজ, তাহলে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন।

শিশু প্রতিপালন একদিকে যেমন জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, উদ্দীপনাময় এবং সর্বোপরি আনন্দময় এক অভিজ্ঞতা তেমনি এটি অনেক বড় একটি দায়িত্বও বটে, যার অনেক ধরনের চাহিদা রয়েছে। মানুষের পুরো জীবনটাই হচ্ছে অসংখ্য পরীক্ষার সমষ্টি। সেসবের মধ্যে সন্তান প্রতিপালন হচ্ছে অন্যতম বড় একটি পরীক্ষা। এ কাজে কাল্পনিক ধারণাগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখে বাস্তবতা উপলব্ধি করা জরুরি। সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালন খুব সহজ নয়; পুরোপুরি নির্ভুলও নয়। সন্তান বাবা-মায়ের ধৈর্য এবং সহনশীলতার এক বড় পরীক্ষা। এমনকি সন্তান যখন কাছে নাও থাকে তখনও তাদের চিন্তা বাবা-মায়ের মন-মগজ দখল করে রাখে। মূলত শিশুর আগমন মানুষের জীবনকে নাটকীয়ভাবে বদলে দেয়।

সব শিশুর মধ্যেই যেমন মেধা ও সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, সেরকম থাকে সকল বাবা-মায়ের মধ্যেও। সন্তান প্রতিপালন বিষয়টি একাকী করার মতো ব্যাপার নয়। অনেক বাবা-মা সন্তানের লালন- পালনে শিক্ষক, আয়া, আত্মীয়-স্বজন, ধর্মীয় নেতা এবং বন্ধু-বান্ধবসহ অনেকের সহায়তার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন।

বাবা-মায়েরা শিশু গর্ভে আসা মাত্রই নিচের নির্দেশনাগুলো পালন করার মাধ্যমে প্যারেন্টিং প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। এর মাধ্যমে বাবা-মায়েরা সার্বিক ধারণা পাবেন যা তাদের অসংখ্য করণীয় এবং বর্জনীয় কাজের মধ্যে দিশেহারা হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। নিচের আটটি মূলনীতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এগুলো আপনাকে আপনার পরিবার ও সংসার সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে ও সম্যক সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সহায়ক হবে।

১. মনে রাখুন যে, শিশুকে লালন-পালন একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া

শিশুকে একজন নীতিবান মানুষ, কর্মপরায়ণ নাগরিক ও সম্ভাবনাময় নেতা করে গড়ে তোলা একটি প্রাত্যহিক কাজ, যা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে। রোমান্টিক সম্পর্কের ইতি ঘটতে পারে, বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্ক সুগভীর ও অবিনশ্বর। এটি এমন এক সম্পর্ক যা জীবনের ভয়াবহ ঝড় মোকাবেলা করে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মজবুত বন্ধন হিসেবে টিকে থাকে।

২. সঠিক লক্ষ্য স্থির করুন এবং অবিরাম এর উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান

লক্ষ্য (Goal) নির্ধারণ করলে আপনি সংশয় এড়াতে পারবেন এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবেন। লক্ষ্য নির্ধারিত হলে আমরা কোথায় যেতে চাই এবং কীভাবে সেখানে যেতে হবে তা পরিষ্কার হয়ে যায় (পরবর্তীতে আমরা সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্য বিষয়ক চার্ট তুলে ধরব)। লক্ষ্য কিংবা রোড ম্যাপ না থাকলে বাবা-মা সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং নিজের অজান্তেই ভুল করে ফেলেন। কারণ তাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় নিজেদের কাজের পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন। লক্ষ্য নির্ধারণ ও তার বিপরীতে কাজের যাচাই করে নেবার অর্থ এই নয় যে, বাবা-মায়ের কোনো ভুলই হতে পারবে না। বাস্তবে ভুল হবেই! কিন্তু মূলকথা হলো, ভুলটা বুঝতে পারা এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আরো দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। শিশুদের জন্যও একই বিষয় প্রযোজ্য, তাদেরকেও লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের ভাবতে হবে: আমরা কি আমাদের শিশুদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছি? আমাদের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কীভাবে চলতে হবে তা কি আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি? আমাদের প্রত্যাশাগুলো কী এবং সেই প্রত্যাশা পূরণে কী কী দক্ষতা প্রয়োজন তা কি আমরা তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি?

৩. মূলনীতিগুলো চর্চার মধ্যে রাখুন এবং অন্য বাবা-মায়েদের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করুন

শিশু প্রতিপালনের ওপরে বিভিন্ন বই বা সাহিত্য অধ্যয়ন করে এবং অন্যদের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে এ ব্যাপারে অনেক দিকনির্দেশনা লাভ করা সম্ভব।

সন্তান লালন-পালনের সাধারণ মূলনীতিগুলো প্রায় সকল বাবা-মায়ের কিছুটা জানা থাকলেও এতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া রোজকার গৃহস্থালি কাজের চাপের দরুন তারা সেগুলো মেনে চলতে ও বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হন। সে যাই হোক তারা কিন্তু নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একে অন্যের কাছ থেকে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে আরো ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। আপনি একক (Single Parent), বিবাহিত, গৃহস্থ অথবা কর্মজীবী– যাই হোন না কেন, বিচ্ছিন্নভাবে শিশু প্রতিপালনের কাজটি খুবই কঠিন।

৪. নিজে শিশুদের জন্য ভালো আদর্শ[৫] হোন এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলুন

বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা ও বাবা মায়ের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা কীভাবে চলবে সে শিক্ষা দেয়া। শিশুদের জন্য বাড়িই হলো মর্যাদা, সাহস, আত্মশৃঙ্খলা, ভালোবাসা, সমবেদনা, পারস্পরিক নির্ভরতা ও দায়িত্ববোধ শেখার জায়গা। শুধু কথা বা বক্তৃতা দিয়ে সন্তানদের প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা যায় না। এর জন্য নিজেদের কাজের মাধ্যমে উদাহরণ পেশ করতে হয়। শত উপদেশ বাণীর চেয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ শ্রেয়।

৫. শিশুদেরকে ভুল ও সঠিকের পার্থক্য করতে শেখান

অন্য কোনো ছেলে-মেয়েদের অসদাচারণ বা নিচু স্বভাবের কথা শুনলে অনেক বাবা-মা প্রায়ই মন্তব্য করেন যে, 'আমার সন্তান এমন না'; 'আমার সন্তান অন্য রকম'। এটি ভাবা ভুল যে, কেবলমাত্র আপনার সন্তান বলে সে খারাপ আচরণের প্রভাব মুক্ত কিংবা সে নিজে থেকেই একজন ভালো মানুষে পরিণত হবে। প্রকৃত সত্য হলো, একটি শিশু আমাদের প্রত্যাশার থেকে ভিন্ন আচরণ করতে পারে । আর এটিই স্বাভাবিক যে, আমাদের সন্তানরা আমাদের চারপাশে বেড়ে ওঠা আর পাঁচটি শিশুর মতোই শিশু। আদম আ. থেকে আসা মানবজাতির অংশ হিসেবে আমরা সবাই ভালো খারাপের পার্থক্য করার মতো বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন। মানুষ মাত্রই ভুল করবে। তফাৎটা হলো, আমাদের কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে

---

[৫] Role Model.

বেশি ভুল করবে; কেউ ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হবে এবং সংশোধিত হবে; আর অন্যরা ভুল করতেই থাকবে। আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও আমাদের সমস্যাগুলোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের জীবনে এমন কোনো বিষয় বলতে গেলে পাওয়া যাবে না, যার অভিজ্ঞতা কোনো না কোনোভাবে অন্য আরেকজনের নেই।

৬. উন্নতি সাধনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালান এবং মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বদ্ধমূল করে দিন

আমরা যদি বড় দৃশ্যপট চিন্তা করি, তাহলে সত্যিকার একটি মানবিক সভ্যতার পুনরাবির্ভাব সম্ভব কেবল নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই সেসব ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে হবে, যারা দৃঢ় ও সচ্চরিত্রের অধিকারী; স্বার্থপরতা, লালসা এবং দুর্নীতি থেকে মুক্ত। এসব ব্যক্তিত্বের ভিতরে থাকতে হবে সততা, বিনয় এবং অন্যকে ভালোবাসার গুণ। ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দৈবক্রমে ঘটে যায় না। এগুলো আসে একটি সুখী পরিবার, স্থিতিশীল পরিবেশ আর প্রতিশ্রুতি-শীল বাবা-মায়ের[৬] কাছ থেকে।

[৬] Committed Parents.

৭. সংলাপের কৌশলে দখল অর্জন ও উন্নতি সাধন করুন

কথা বলুন! আপনার সন্তানের সাথে আলোচনা করুন যেকোনো বিষয়ে এবং এমনকি আপনি সারাদিনে কী করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে আপনার অনুভূতি কী এবং আপনার সন্তান এটি-সেটি নিয়ে কী ভাবছে সে বিষয়ে। যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দিন; আপনার সন্তানকে চিনুন, জানুন। আপনি আপনার চিন্তাকে কীভাবে প্রকাশ করছেন তা আপনার সন্তানের জানা জরুরি। সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো ছাড়াও ভাষার উন্নয়ন এবং স্পষ্টভাষিতার জন্যও কথা বলা জরুরি। আপনাকে যাতে 'বিরক্ত' করতে না পারে সেজন্য দূরে রাখার উদ্দেশ্যে টেলিভিশন, ইন্টারনেট অথবা কম্পিউটার গেম দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, কথা বলার অভাবের ফল হলো নির্জীব মেধা এবং জড়তা। টেলিভিশন দেখার নেতিবাচক প্রভাবের ওপর আমরা একটি অধ্যায় রেখেছি।

যোগাযোগের মধ্যে যেমন থাকা উচিত গুরুগম্ভীর আলোচনা, তেমনি থাকা প্রয়োজন পারস্পরিক হাসি-কৌতুক। বাবা-মায়ের অবশ্যই সন্তানদের সাথে

হাসি-কৌতুক এবং খেলাধুলা করা উচিত। কারণ হাসি-কৌতুক সম্পর্ক মজবুত করে এবং একঘেঁয়েমি ভাব দূর করে। অনেক সময় শিশুদেরকে বড় করার কাজে বাবা-মা এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা এ বিষয়টিকে উপভোগ করতে ভুলে যান। এটি একটি বড় ভুল। শিশুদের ভুবন আনন্দ ও খেলায় পরিপূর্ণ। তাদের আনন্দ করার এবং খেলাধুলার চাহিদা অসীম। যেসব বাবা-মা শিশুকে নিয়ে খেলতে বা বাইরে ঘুরতে যাওয়ার বদলে টিভি বা কম্পিউটারে মুখ গুজে পড়ে থাকতে পছন্দ করেন শিশুরা তাদের প্রতি বিরক্ত হয়। জীবন যখন নানামুখী চাপ আর উদ্বেগে পরিপূর্ণ, তখন শিশুরাই পারে কিছুক্ষণের জন্য হলেও চাপ কমানোর সর্বোত্তম ওষুধ দিতে (বাবা-মাকে তাদের শিশুসুলভ জগতে হারিয়ে যেতে সাহায্য করার মাধ্যমে)। কিছু বাবা-মা মনে করেন শিশুদের সাথে খেলাধুলা নিজেদের গাম্ভীর্য ও সিরিয়াস ব্যক্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর; এর মানে হলো জীবনের 'গুরুত্বপূর্ণ' কাজকে অবহেলা করা। বাস্তবতা হলো, আপনি যখন শিশুদের সাথে হাসেন, তখন তারা আপনার সঙ্গে সহজ ও নির্ভয় হতে ভরসা পায়। এতে আপনার সঙ্গে তাদের ভালোবাসার এক অদৃশ্য বন্ধন তৈরি হয় এবং শিশুরা তাদের আত্মপ্রকাশে সাবলীল হয়। কৌতুক এবং হাসি-ঠাট্টা করা যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৮. সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালন উপভোগ করুন

এটি আগের পয়েন্টের ধারাবাহিকতা। ওপরের মূলনীতিগুলোর প্রয়োগে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং এর প্রয়োগে আবেগসহ আনন্দের মিশ্রণ থাকতে হবে। কখনো কখনো লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য পাওয়ার দিকে বাবা-মায়ের দৃষ্টি এতটাই নিবদ্ধ থাকে যে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ আনন্দগুলো তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারটি খেয়ালে রাখুন। সন্তান প্রতিপালন একটি সামগ্রিক বিষয়; এতে লক্ষ্য যেমন জরুরি তেমনি জরুরি প্রাত্যহিক সব অভিজ্ঞতা।

শিশুদেরকে গুণগত যথার্থ সময় দেয়া এবং তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা

বাবা-মা অনেক সময় দাবি করতে পারেন যে, তারা তাদের শিশুদের '**সাথে**' প্রচুর সময় কাটান। আসলে তারা যে বিষয়টি বোঝাতে চান, তা হলো তারা তাদের শিশুদের '**সাথে**' নয়, বরং তাদের কাছাকাছি থাকেন। অর্থাৎ তাদের শিশুরা যে ঘরে আছে, তারাও সে ঘরেই আছেনঃ কিন্তু টিভি দেখছেন, পড়ায় মগ্ন আছেন, ফোনে আছেন, ই-মেইল চেক করছেন অথবা অন্য মেহমানদের সাথে আলাপ করছেন। দরকার হচ্ছে শিশুদের সাথে **সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ** করা। এ কথার মানে হলো, একসাথে পড়া, খেলাধুলা করা, ধাঁধার সমাধান করা, একসাথে রান্না করা ও খাওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা, কৌতুক করা, বাজার করা, বিল্ডিং ব্লক খেলা এবং একইসাথে থালা-বাসন পরিষ্কার করা। অন্য কথায়, শিশুকে একা ছেড়ে দিয়ে তার কাছে থাকা নয়ঃ বরং সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং শিশুর কর্মকাণ্ডে অংশীদার হওয়া।

একেই বলে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেয়া। যাকে খুব সুন্দর সময় বা Good Quality of Time বলা যায়। বেবি সিটিং বা অন্য কারো সময়দান বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের পারস্পরিক কার্যকলাপের বিকল্প হতে পারে না।

– হাসান আলতালিব

সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক তথ্যের ব্যবহার

বিভিন্ন উৎস ঘেঁটে তথ্য ও পরামর্শ সংগ্রহ সুষ্ঠু প্যারেন্টিং শুরুর একটি কার্যকরী ধাপ।

মুসলিম তথ্যভাণ্ডার বনাম পশ্চিমা তথ্যভাণ্ডার

উত্তর আমেরিকায় সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক সাহিত্য রয়েছে প্রচুর পরিমাণে (টেবিল ১.১ দ্রষ্টব্য)। পশ্চিমা বাবা-মায়েদের জন্য সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালন বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়াও শিশু প্রতিপালনকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আরো ফলপ্রসূ এবং কার্যকর করার জন্য রয়েছে অসংখ্য বই, পাঠাগার এবং ওয়েবসাইট।

টেবিল ১.১: সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক সাহিত্যের সহজলভ্যতা

লাইব্রেরি	সাহিত্য সংখ্যা
লাইব্রেরি অব কংগ্রেস	২৪৬৪
যুক্তরাষ্ট্রের ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তসজ্ঞ ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক	৩২১৫
লাইব্রেরি, ভার্জিনিয়া	৪৩২
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব কানাডা	৩৬২

সূত্র: ইউনাইটেড স্টেটস
লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (www.loc.gov)
ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক লাইব্রেরি (www. fairfaxcounty.gov/library)
লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভস কানাডা (www. collectionscanada.gc.ca)

এর বিপরীতে মুসলিম বাবা-মায়েরা যখন মুসলিম উৎস থেকে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে পরামর্শ খোঁজেন, তারা কী পান? আল-তাল এবং আল কায়সি (আরবি ভাষায় ১৯৯০ সালে) সন্তান প্রতিপালনের ওপরে ভালো মানের মুসলিম সাহিত্যের অভাব বিষয়ে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন। শিশুদের মধ্যে কীভাবে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধ এবং চরিত্র স্থাপন করতে হয় সে বিষয়ে বাস্তবমুখী বর্ণনা খুব কম বইয়ে পাওয়া যায়। সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে প্রচলিত পুরনো বইগুলো কাজে লাগাতে গিয়ে বাবা-মায়েরা সমস্যায় পড়ে যান। এসব বই মূলত আগের সময়ের চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে লিখিত। এছাড়াও সেগুলোতে সঠিক বিষয় বিন্যাস, সূচিপত্র ও তথ্যসূত্রের অভাব রয়েছে। মুসলিমদের জন্য সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক তথ্যাদি বিভিন্ন ধরনের লেখা বা সাহিত্যের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; যেমন, কিছু পাওয়া যায় ইসলামি আইন ব্যবস্থায়, কিছু কুরআনের ব্যাখ্যায় (তাফসির), কিছু ইতিহাসে, কিছু সূফি কবিতায় এবং উপদেশ বিষয়ক বইগুলোতে। ড. আল জাবালাভী (আরবি ভাষায় তার বই 'কিশোরদের শিক্ষাদীক্ষায়)[৭] বলেছেন, শিশু-লালন বিষয়ে সামান্য কিছু

[৭] Teen Upbringing.

ইসলামি সাহিত্য আছে এবং কিশোরদের উপরে বিশেষভাবে লিখিত সাহিত্যের সংখ্যা অতি নগণ্য। দ্য মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড কানাডা (MSA) ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য ইসলামি রঙ করার বই প্রকাশ করে। তখন এ ধরনের বই ছিলো না। ফলে যে সকল মুসলিম বাবা-মা পশ্চিমা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন তারা মুসলিম শিশু সাহিত্যের অভাবনীয় অভাব অনুভব করতেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লেইস্টার, ইংল্যান্ড-এর পরিচালক ড. মানাজির আহসান উল্লেখ করেছেন যে, "পশ্চিমা দেশগুলোতে আমরা মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান, মসজিদ এবং স্কুল নির্মাণে সক্ষম হলেও বাড়িতে এবং স্কুলে– উভয় স্থানেই নতুন প্রজন্মের শিক্ষার জন্য ইংরেজিতে ইসলামি সাহিত্য ও বই সরবরাহ করতে সক্ষম হইনি" (D'Oyen, 1996)।

যে পরিমাণ রচনা পাওয়া যায় তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এমনকি বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশগুলোতেও শিশু-কিশোরদের জন্য ইসলামি মূল্যবোধ সম্পন্ন বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে। আমরা মূলত ভিন্ন মূল্যবোধের সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন দেশের ইসলামি শিশুসাহিত্য প্রকাশনাসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের গ্রন্থগুলোর ব্যাপক প্রচার, প্রসারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা শীঘ্রই প্রয়োজন। বর্তমানে ইসলামি লাইব্রেরিগুলোতে শিশু লালন এবং সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক বই অপর্যাপ্ত। বেশির ভাগ রচনা বড়দের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। শিশুর বিকাশ এবং কিশোর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। ইসলামের আইনবিদগণ বিবাহের নিয়ম-কানুন, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, তালাকের খুঁটিনাটি এবং ওয়ারিশী সম্পত্তির হিসাব-নিকাশের উপরে সাহিত্য রচনা করেছেন। পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক, ভাই-বোনদের মধ্যে বিশেষ করে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বিকাশগত সম্পর্কের ওপরে আলোকপাতকারী আরো ইসলামি বইয়ের দরকার। বাবা-মা যখন বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শের বই খোঁজেন, তখন তারা সামনে পান শুধু আচার-অনুষ্ঠান এবং আইনি (ফিকহি) বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা বই।

অধিকন্তু, আরব বিশ্বের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইতিহাসের যেসব বই পড়ানো হয় সেগুলো মানুষের পারস্পরিক কর্মকাণ্ড এবং ব্যক্তিগত

উন্নয়নের দিক উপেক্ষা করে গেছে। সেসব বইতে আলোকপাত করেছে প্রধানত রাজনৈতিক বিষয়াদি এবং জাতিগত শান্তি ও যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ওপরে। শিশুদের প্রতি নবি মুহাম্মদ সা.-এর দেখানো মানবিকতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও মর্যাদা, তাদের সাথে আচরণের বেলায় তাঁর মমত্ববোধ, তাদের প্রতি তাঁর সম্মান এবং তাদের সাথে তাঁর খেলাধুলার ইচ্ছা নিয়ে যৎসামান্য কথা তাতে স্থান পেয়েছে। রসুল সা. তাঁর নিজের ছেলেদেরকে বড় করার কোনো সুযোগ পাননি। কারণ তারা শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। তবে তিনি তাঁর কন্যা (ফাতিমা, জয়নব, রুবাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে) বড় করেছেন এবং তাঁর নাতি ও আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সন্তান লালন-পালনে অবদান রেখেছেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-কেও লালন-পালন করেছেন। সম্পূর্ণ নতুন একটি সমাজ এবং শত্রুর দ্বারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পুনঃপুনঃ হুমকির মুখে থাকা একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে যারপরনাই ব্যস্ত থাকার পরও তিনি শিশুদের প্রতি কীভাবে এত মনোযোগ দিয়েছেন, তাদের যত্ন নিয়েছেন, তাদের প্রতি মমতা ও সম্মান দেখিয়েছেন - তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

শিশুদের লালন-পালনের পিছনে মুসলিম পুরুষেরা খুব কম মনোযোগ দিয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি মহিলারা করে থাকে। ফলে ইসলামি সাহিত্যে মুসলিম নারীদের এ সম্পর্কিত কাজের বর্ণনা এবং বিশ্লেষণের যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নারীদের এ অবদানের বেশির ভাগ অংশই হারিয়ে গেছে অথবা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে রসুল সা.-এর স্ত্রী এবং মহিলা সাহাবিরা কীভাবে তাদের সন্তান লালন-পালন করতেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো এবং সাহিত্য সমৃদ্ধ করার জন্য বর্তমানে গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে। এর দ্বারা যেমন সামাজিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকার বিষয়ে আরো অনেক বেশি জানার সুযোগ হবে তেমনি নারী বিষয়ক[৮] পাঠ্য দ্বারা ইসলামি গ্রন্থাগারগুলো সমৃদ্ধ হবে। এ ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে যেসব নারীরা সফলভাবে নেতৃত্ব (পুরুষ ও নারী) গড়ে তুলেছেন তাদের কর্মকাণ্ড ও পদ্ধতির ওপরেও সাহিত্যের একটি পাঠ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এটি না করতে পারলে 'মায়ের পদতলে জান্নাত' কথাটির নির্দেশনা কেবল একটি পূণ্যবাণীর চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

[৮] Women Studies

আমাদের সাহিত্যে শিশুদের মধ্যে চরিত্র ও মূল্যবোধ বিকশিত করার পন্থা ও কৌশলের চেয়ে কেবল নীতিগত আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ওপরেই জোর দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি, বুঝ ও বিশ্লেষণ করার মতো জ্ঞানের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়নি। ফলে বাবা-মায়েদের জন্য প্রাত্যহিক জীবনে সন্তান লালন-পালনের মূলনীতিগুলোর বাস্তব প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বাস্তবসম্মত কৌশল, কার্যকরী দক্ষতা এবং বাস্তব জীবনের উদাহরণ সমৃদ্ধ সাহিত্য দরকার। মুসলিম দেশগুলোতে শত শত বর্ষের দীর্ঘ মেয়াদী উপনিবেশ থাকার দরুণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি; ফলে সমাজে তারবিয়াহ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। এ সময়ে কার্য তালিকার সর্বনিম্নে পড়েছিল সামাজিক সংস্কার, উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়গুলো। এ কারণেই দীর্ঘকাল ধরে সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে লেখা অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিলো না এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো গবেষণার কথাও চিন্তা করা হয়নি।

ইবনে সাহনুন, ইবনে জাজ্জার এবং আলী আল- কাবসীর মতো মুসলিম সংস্কারকরা, যারা সবাই ছিলেন তিউনিসের কায়রাওয়ানে তারা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শিশুদেরকে নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা ও শাস্তির আওতায় রাখা যায় আর শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় সে সকল বিষয়ে। শিশু মনস্তত্ত্ব, শিশুর বিকাশ, শিক্ষা এবং শিশু লালন-পালনের বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়নি। নেতাদের প্রতিভা এবং সতর্ক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন মহান সংস্কারকদের আন্দোলন মুসলিম সভ্যতার পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারেনি তার কিছুটা ব্যাখ্যা এর মধ্যে আছে। একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতে আমাদের দরকার শিশু লালন-পালন এবং চরিত্র গঠন বিষয়ে উন্নতমানের জ্ঞান। আমাদের আরো দরকার এ বিষয়ক সঠিক শিক্ষা, দৃঢ় ইমান এবং যথাযথ দক্ষতা। এটি লক্ষণীয় যে, কুরআন আমাদের সামনে নবিদেরকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছে যাতে আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারি। নেতৃত্বের গুণাবলি শৈশবেই বিকশিত হতে পারে, যদি শিশু প্রতিপালনের কলাকৌশল ও উন্নত জ্ঞান আমাদের জানা থাকে।

২০০২ সালে কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোমতাজ আনোয়ার মুসলিমদের জন্য সন্তান প্রতিপালনের

ওপরে প্রাপ্য সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য IIIT কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি মুসলিমদের জন্য সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালন বিষয়ক বইয়ের অভাব দেখতে পেলেন। তিনি আরো দেখলেন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিশেষত নারীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার অতি অল্প। অধিকাংশ মুসলিম বাবা-মা শিশুর লালন-পালনে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আর অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করেন, যা সন্তানের সফল লালন-পালনের জন্য একেবারেই যথেষ্ট নয়। এমনকি শিক্ষিত মুসলিম বাবা-মায়েদের ক্ষেত্রেও সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে উন্নতমানের সাহিত্য ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। যদিও মুসলিম বিশ্বের সকল ভাষায় সন্তান প্রতিপালনের ওপরে কী পরিমাণ সাহিত্য রয়েছে তা পরিমাপ করা কঠিন, তবুও দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে সেগুলো অপর্যাপ্ত। কাজেই এটি সুস্পষ্ট যে চরিত্র গঠন, মূলবোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠার ওপরে ভিত্তি করে উন্নতমানের সাহিত্য রচনা এখনকার সময়ে জরুরি হয়ে পড়েছে, যা একদিকে যেমন বর্তমান যুগের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে তেমনি স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ের সমস্যাও তুলে ধরবে।

কুরআনে বর্ণিত নবিদের গুণাবলি

تعابير قرآنية	কুরআনের পরিভাষা
صدّيقاً	সৎ
رؤوف رحيم	দয়ালু ও ক্ষমাশীল
حُكماً وعلماً	জ্ঞান ও প্রজ্ঞা
زاده بسطة في العلم والجسم	শারীরিক ও জ্ঞানগত শক্তিতে সমৃদ্ধ [তালুত (আ) সম্পর্কে]
القوي الأمين	সবল ও আস্থাভাজন
حفيظ عليم	পেশাদার ও নির্ভরযোগ্য

কলেজে কি সন্তান প্রতিপালন শিক্ষা দেয়া উচিত?

যেহেতু সন্তান প্রতিপালন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, সেহেতু আমরা কেন স্কুলেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেবো না? দশজন ব্যক্তির মধ্যে সাতজনই মনে করেন, সন্তান প্রতিপালন এমন একটি বিষয়, যা আমাদের শেখা উচিত অথবা শেখানো উচিত।

- Longfield and Fitzpatrick, 1999

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে পৃথিবী বদলে গেছে। আগে একই পরিবারভুক্ত মানুষগুলো একই গ্রাম বা একই শহরে কাছাকাছি বাস করতো। এতে করে দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা-ফুফু, চাচা-মামা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুর যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ এবং সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। বর্তমানে পরিবারগুলো নানা বাস্তবিক কারণে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এখন আগের থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ, একক বাবা কিংবা মা ও কর্মজীবী মায়েদের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়েছে। একান্নবর্তী পারিবারিক যোগাযোগের ফলে পূর্বে যেভাবে সন্তানের প্রতিপালন জ্ঞান হস্তান্তর সম্ভব ছিলো বর্তমানে পরিবার বিভাজিত হয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব নয়। ফলে পরিবারে শিশু প্রতিপালন বিষয়ক 'শিক্ষকদের' যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। এটি করার জন্য আমাদের স্কুল-কলেজগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখা যায় যে, প্রথম সন্তানের চেয়ে দ্বিতীয় সন্তানকে বড় করা সহজ। কারণ এ সময়ে আমরা আগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি। কাজেই আমরা যদি আমাদের শিশু লালন-পালন অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করতে পারি, তা আনুষ্ঠানিকভাবে হোক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে তবে তাদের জন্য একাজটি কিছুটা সহজ হবে। আমাদের কি তাই করা উচিত না?

'সন্তান প্রতিপালন' বিষয়কে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক এবং আকর্ষণীয় মনে হলেও বাস্তবে এটি অনেক দূরের কথা। এ ধরনের কোর্স চালু করতে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক শিক্ষকের ব্যবস্থা করা একটি বড় সমস্যা। পারিবারিক জীবন কোনো মৌলিক বিজ্ঞান নয়; এটি অনুভূতি, সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গতারও বিষয়। যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা কলেজে সন্তান প্রতিপালন শিক্ষার বিরোধিতা করছেন তাদের যুক্তিগুলো হলো- সন্তান প্রতিপালনের মতো বিষয়কে শ্রেণিকক্ষে

আবদ্ধ সূত্র হিসেবে পড়ানোর বিষয় না; যদিও সন্তান পালনে পেশাদারী দক্ষতা কার্যকরী, তবুও বাবা-মায়েদের উচিত হবে না তাদের দায়িত্ব শিক্ষক বা পেশাদারদের হাতে ছেড়ে দেয়া। প্রতিটি পরিবারই যেহেতু স্বতন্ত্র, বাবা-মায়ের উচিত হবে তারা যেন প্যারেন্টিং-এর জন্য তাদের বিচক্ষণতা, সহজাত জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করেন। নিজের করা ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া এবং পরিবারের স্বায়ত্তশাসনও সংরক্ষণ করা দরকার। সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টি গণিতের মতো তাত্ত্বিক কোনো বিষয় নয়। যেসব শিক্ষক তাত্ত্বিক শিক্ষাদানে সক্ষম, তারা সন্তান প্রতিপালনের মতো বাস্তব বিষয়ে শিক্ষা প্রদানে সক্ষম নাও হতে পারেন। তাছাড়া সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ এবং কর্তৃত্বপরায়ণতা পরিহারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এতে করে বাবা-মায়ের আস্থা এবং জবাবদিহিতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। যথেষ্ট গভীর শিক্ষা ও শক্ত প্রশিক্ষণ ব্যতীত পারিবারিক দ্বন্দ্ব বিষয়টি নিয়ে কথা বলা শিক্ষকদের জন্য সঠিক নয়।

ওপরের এ যুক্তিগুলোর ভিত্তি থাকলেও একথা সত্যি যে, সুসংহত একটি প্যারেন্টিং কোর্সের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না। মাথা ব্যথা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু মাথার প্রয়োজনীয়তা কমে না, সেহেতু অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিতে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসও বাদ দেয়ার পরিবর্তে আমাদেরকে অবশ্যই পরিবারের দায়িত্বশীলতার মূল্য শিক্ষা দেয়া উচিত। নিম্নে আলোচিত সন্তান প্রতিপালনের উদাহরণটি যুক্তরাজ্য থেকে নেয়া হলেও মুসলিম বিশ্বেও সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। যেমন ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়া'র ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের জন্য সন্তান প্রতিপালনের ওপরে একটি কোর্স এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সন্তান প্রতিপালনের ওপরে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোর্সের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতিমালা

২০০০ সালে ব্রিটিশ সরকার স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য 'সন্তান প্রতিপালন' শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ক্লাস চালু করেছে। পরিবার ভাঙন এবং শুধু মা অথবা শুধু বাবা কেন্দ্রিক পরিবার ব্রিটেনের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো ইউরোপেই এটি একটি ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে (Woolf, 1999)। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষাবিদ, সরকারি চাকরিজীবী এবং মনস্তত্ত্ববিদদের দেয়া পরামর্শের

ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিম্নের বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে নীতিমালা চালু করেছে (Burgess 2009):

- বৈবাহিক বিরোধে করণীয়;
- শিশুদেরকে সঠিকভাবে শাস্তি দেয়া;
- বড় কোনো বিপণি কেন্দ্রে একটি শিশুর রাগ কীভাবে সামলানো যায় সে বিষয়ে বাস্তব পরামর্শ;
- বাবা-মায়ের ভূমিকা;
- সন্তান লালন-পালনের আর্থিক ও বাস্তবিক দিক;
- প্রশংসার মাধ্যমে সন্তান ও বাবা-মা উভয়ের মধ্যকার আত্মসম্মান বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ;
- ভালোবাসা এবং নিরাপত্তার মূল্য বনাম বস্তুগত জিনিসের মূল্য, তুলনামূলক বিশ্লেষণ;
- অধিকার এবং স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বানুভূতি;
- বিয়ের গুরুত্ব;
- সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা;
- পারিবারিক জীবনের মানসিক চাপ মোকাবেলার কৌশল।

ব্রিটিশ সরকার মনে করেছে, এ পাঠ্যসূচি কিশোরীদের গর্ভধারণ এবং শিশুদের মধ্যে অপরাধমূলক আচরণের হার কমাতে সাহায্য করবে। তাছাড়া পরিবারের নিয়ম মেনে চলতে শেখাই হলো সামাজিক নিয়ম -শৃঙ্খলা ও আইন মেনে চলতে শেখার প্রথম ধাপ যা তাকে আইন ভেঙ্গে কারাবন্দী হওয়া থেকে দূরে রাখবে।

> সন্তান প্রতিপালন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হলেও এটি সবচেয়ে উপভোগ্য, উদ্দীপনাময় ও সর্বোপরি আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতা– যার স্বাদ আমরা সবাই পেতে চাই।
>
> -Battol Al-Toma, Author and Mother, Personal Letter

বিজ্ঞানের জন্য দরকার প্রণালী, কাঠামো আর অনুমান।

কলার জন্য দরকার বিচক্ষণতা, কৌশল, অন্তর্জ্ঞান, ভালোবাসা আর বাস্তব জ্ঞান।

সন্তান প্রতিপালন বিজ্ঞান, কলা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয়।

আমাদের শিশুরা কি অস্বাভাবিক?

সন্তান প্রতিপালনের জটিলতাগুলোর মুখোমুখি না হওয়ার কারণে কিছু বাবা-মা ভেবে বসেন তাদের সন্তান বুঝি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন। এক মা জানালেন, "আমাদের সন্তানাদি হওয়ার কয়েক বছর আগের ঘটনা এটি। আমাদের প্রতিবেশী তখন বাইরে। আমরা তাদের ঘর-দরজা সাফ করে তাদেরকে চমকিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের ছোটো তিনটি শিশু সন্তান ছিলো। সারাবাড়ি ছড়ানো ছিলো ওদের একগাদা খেলনা। আমরা কাজ শুরু করার ছয় ঘণ্টা পর অবিশ্বাসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ঢলে পড়লাম, তাদের সোফায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। এটি স্বাভাবিকতা হতে পারে না। এমন হলে আমরা কখনো সন্তান নেবো না। দুটি বছর আর দুটি সন্তান হওয়ার পর এখন বুঝি, আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ি কতটা স্বাভাবিক ছিলো। আমাদের নিজেদের ঘরেরও এখন একই রকম 'এখানে শিশু সন্তান আছে' -দশা।

শিশুরাই মানবতার ভবিষ্যৎ-
শিশুদের দিয়েই আমরা পৃথিবীকে বদলাতে পারি।

- শিশুদের ব্যাপারে আপনি যেমন বিশ্বাস রাখবেন, তারা তেমনভাবেই বেড়ে উঠবে। ব্যাপারটি অনেকাংশে এরকম যে, আপনি শিশু সন্তানকে বলুন 'তুমি পারবে'। দেখবেন সত্যি সত্যিই সে তা পেরে গেছে। অন্যদিকে যদি এমনটি বলেন যে, তুমি পারো না অথবা তোমাকে দিয়ে হবে না, তবে তারা সেটি আর পারবে না।
- একটি জাতি হলো তার পরিবারগুলোর সমষ্টি এবং তার নারী-পুরুষের সমষ্টি ।
- আমরা যদি একটি জাতিকে বদলাতে চাই, তাহলে আমাদের ঘরগুলো বদলাতে হবে আগে।
- একটি শিশু ঝুঁকির মধ্যে থাকার মানে হলো একটি (ভবিষ্যৎ) পরিবার ঝুঁকির মধ্যে আছে।
- স্মার্ট এমন আহামরি কিছু না, আটপৌঁড়ে আমিত্বে যার প্রকাশ। কিন্তু স্মার্ট এমন কিছু, যা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন।
- পরিবারে পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।
- আপনার শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে একজন পিতা বা মাতা হিসেবে আপনার ভূমিকাও বিবর্তিত হতে হবে- সময়ের সাথে সাথে আপনাকে একজন ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক থেকে একজন পরামর্শক বা কনসালট্যান্ট-এ; একজন প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজার থেকে একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টায় বা মেন্টর-এ বদলাতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির অবস্থা নিশ্চয়ই পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে শাস্তি দিতে চান (তাদের কুকর্মের পরিণতিস্বরূপ), তখন তা কেউ ঠেকাতে পারে না। তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। (সুরা আর-রাদ, ১১)

উপসংহার

আনুষ্ঠানিক কোনো কোর্স শিক্ষা দেয়া হোক বা না হোক, একটি বিষয় নিশ্চিত যে, সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের গুরুত্ব এবং ব্যাপকভাবে সমাজে এর প্রভাব ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছে। বিবাহ, সন্তান প্রতিপালন, শিশুর বিকাশসাধন এবং শিশুর যত্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্বন্ধে বাস্তবে মুখোমুখি হওয়ার আগেই যদি জ্ঞান আহরণ সম্ভব হতো তবে ভবিষ্যৎ বাবা-মায়েরা অনেক সমস্যাই প্রতিরোধ করার সুযোগ পেতেন। সমাজে তথাকথিত 'সেক্স এডুকেশন'-এর গুরুত্ব নেই। বরং নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দায়িত্বশীল ফলাফলে আগত যে শিশু, তার সঠিক লালন-পালনের শিক্ষাটিই গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মা যদি তাদের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ সম্পর্কের সফলতা যে তাদের নিজেদের জীবনের সাথে সাথে সমাজের সফলতাও বয়ে আনবে বুঝতে পারেন, তবেই তারা সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের কলা ও বিজ্ঞান উপলব্ধি করতে আগ্রহী হবেন। ফলে তারা সন্তানের জন্য যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকার আনন্দের সাথে করবেন। আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য বাবা-মায়ের বদলে শুধু সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করাটা বহুলাংশে জুয়াখেলার মতো; এটি আসলে কৌশলে বাবা-মায়ের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার নামান্তর। শিশুর কল্যাণে বাবা-মায়ের চেয়ে বেশি মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা আর কে চালাতে পারে? এ প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে আর কে টিকতে পারে?

করণীয়

করণীয়- ১: আপনি কি কখনো ভেবেছেন 'কেন'?

আপনার সন্তানের সাথে নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করুন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদেরকে শোনান।

ভাবতে বলুন কেন:

- কেউ কেউ মহাপণ্ডিত হতে পারেন কিন্তু সামাজিকভাবে হন ব্যর্থ;
- একজন মা অথবা বাবা স্নেহপরায়ণ ও আন্তরিক হতে পারেন কিন্তু পরিবারের সাথে সময় কাটান না;
- একজন ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ হতে পারেন কিন্তু অযৌক্তিক;
- একজন ব্যক্তির প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে কিন্তু তিনি অন্যদেরকে অবিশ্বাস করেন;
- একজন ব্যক্তি বড় চিন্তাবিদ হতে পারেন কিন্তু অগোছালো বা বিশৃঙ্খল;
- একজন ব্যক্তি উদারভাবে নিজের স্বার্থে সময় দিতে পারেন কিন্তু অন্যদের জন্য একটুও দিতে চান না;
- একজন ব্যক্তি ধনী হতে পারেন কিন্তু কৃপণ।

যথাযথভাবে সন্তান লালন-পালন এ ধরনের সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

করণীয়- ২: আপনার প্রতিপালন পদ্ধতি

শিশুপালনের কোন ধরনটি আপনার কাছে বেশি আকর্ষণীয়? আপনার সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতির একটি দুর্বলতা খুঁজে বের করুন এবং এর উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। এটি আপনার সন্তানদের সাথে আলোচনা করুন।

করণীয়- ৩: শিশুদের স্বাভাবিক অসদাচরণের একটি তালিকা

আমার সন্তান কি বিশেষ?[৯]

কিছু বাবা-মা মনে করেন তাদের সন্তান অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো অথবা অনেক খারাপ; যেন তারা এক বিশেষ প্রজাতির। আসলে শিশুরা তাদের সমসাময়িকদের বেশির ভাগ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা ধারা গ্রহণ করে। তাই এক্ষেত্রে সমসাময়িক অন্যান্য বাবা-মায়ের অভিজ্ঞতা জেনে নেয়া জরুরি। আপনার শিশুর মধ্যে যেসব সমস্যাগ্রস্ত আচরণ আছে, সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন এবং পরস্পর আলোচনা করুন কীভাবে সেগুলোর উন্নতি ঘটানো যায়। শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এমন একটি আচরণ দিয়ে শুরু করুন, যেটি সংশোধন করা সহজ।

এখানে কিছু শিশুর কতগুলো সমস্যাগ্রস্ত আচরণ দেয়া হলো

স্কুলে অসফলতা
অলসতা
খুব কম বা খুব বেশি খাওয়া

এমনভাবে চুলকাটা, যা আপনি অনুমোদন করেন না
প্রত্যুত্তর দেয়া
এমন বন্ধুদের সাথে থাকা, যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন না

সালাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানানো
ঘরের কাজে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানানো
দীর্ঘক্ষণ গোমড়ামুখে নীরব হয়ে থাকা

নাস্তা করতে অস্বীকৃতি জানানো
বোকার মতো ঝুঁকি নেয়া
বড়দেরকে অসম্মান করা

বেশি রাতে বাড়ির বাইরে থাকা
বাড়িতে থাকা অপছন্দ করা
বাইরে একেবারেই বের না হওয়া

চুরি করা
মিথ্যা বলা
ধূমপান করা

কসম করা এবং অভিশাপ দেয়া
অতিমাত্রায় টিভি দেখা
অন্যদেরকে আঘাত করা

মুখে মুখে তর্ক করা
ভৌতিক ভিডিও দেখা
অস্বাস্থ্যকর/জাংক ফুড খাওয়া

প্রতিবেশী/মুরুব্বীদের সাথে রূঢ় আচরণ করা
এমন পোশাক পরা যা আপনি অনুমোদন করেন না
উচ্চ আওয়াজে গান/টিভি/রেডিও শোনা

ভালোভাবে পরিষ্কার না হওয়া
বাথরুমে অনেক সময় ধরে থাকা
সারাবাড়ি জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখা

বাবা-মায়ের জন্য নোট: আপনার পরিবেশ কি এসবের চর্চা পরিহারের এবং আপনার সন্তানকে- আমার বাবা-মায়ের কী সমস্যা এমন একটি তালিকা তৈরির সুযোগ দেয়? এ রকম চর্চায় তাদেরকে সংযুক্ত করার সাহস এবং প্রজ্ঞা কি আপনার আছে?

[৯] Uniqe

করণীয়- ৪: একটি কবিতার প্রতিফলন

আপনার পরিবারের সবাইকে একসাথে বসতে বলুন এবং কোনো সন্তানকে কবিতাটি জোরে আবৃত্তি করতে বলুন। আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে অনুরোধ করুন নিজের ব্যক্তিগত আচরণের ওপরে এবং একে অন্যের ওপর এর প্রতিফলন ঘটাতে বলুন ও উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে বলুন।

পথের মাঝে ধাক্কা খেলাম অপরিচিতের সাথে;
'মাফ করবেন, মাফ করবেন', জবাব দিলাম তাতে।

'মাফ চাইছি আমিও ভায়া', লোকটি বলে ওঠে,
'আপনাকে যে দেখতে পাইনি মোর দুচোখেতে।

সেদিন যখন পাকাচ্ছিলাম সন্ধ্যাবেলার খানা,
ছেলে চুপি আসলো পাশে, হয়নি আমার জানা

ঘুরতে গিয়ে বলতে গেলে ফেলেই দিলাম ওকে;
সরতে বলি সামনে থেকে ভ্রূকুঞ্চিত চোখে।

বুঝিনি যে আমার ভাষা কঠিন ছিলো কত;
ভাঙলো ছেলের ছোট্ট হৃদয়, ফিরলো হয়ে নত।

যখন আমি বিছানাতে, ঘুমাইনি তখনো,
শীর্ণ কোনো কণ্ঠ এসে বললো, 'শোনো শোনো–

দুজনেরই বিনয় তখন পড়লো গলে গলে;
বিদায় বলে যে যার পথে আবার গেলাম চলে।

কিন্তু যখন বাড়ির ভিতর, উল্টোটা ঠিক ঘটে,
প্রিয় এবং ছোটো বড় সবার সাথেই বটে।

গেলাম তখন নিজের কাছে নিজেই ছোটো হয়ে;
দুচোখ দিয়ে অশ্রু ভরা নদী গেলো বয়ে।

আস্তে উঠে ছেলের পাশে গিয়ে ডেকে তুলি,
'ওঠো ওঠো খোকা আমার, দেখো এ ফুলগুলি।

আমায় দেবে তাই এনেছো? বলি নরম গলায়।'
মুচকি হেসে বললো, 'জি মা, পেলাম গাছের তলায়।

তোমার মতোই সুন্দর তাই ফুল কুড়িয়ে আনি;
জানি তুমি ফুলপ্রেমী মা, নীলের বিশেষ জানি।'

সৌজন্যটা দেখাও ভালোই অপরিচিতের বেলায়;
কিন্তু প্রিয় পরিবারকে রাখো হেলায়-ফেলায়।

গিয়ে দেখো রান্না ঘরের মেঝের ওপর ফেলা
দরজা ঘেঁষে নীল গোলাপী হলুদ ফুলের মেলা

ফুলগুলো সব তোমার ছেলে তোমায় দেবে বলে
নিজেই গিয়ে বাগান থেকে একা একা তোলে

চুপি চুপি তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলো কেনো?
তোমায় সে যে চমক দেবে, ভাঙ্গে না তা যেন।'

আজকে আমার আচরণে স্যরি বলি বেটা;
তোমার সাথে চেঁচিয়েছিলাম, হয়নি উচিত সেটি।

ঠিক আছে মা, ঠিক আছে মা, বললো তখন বালক;
তোমাকে মা ভালোবাসি, তা যা কিছুই হোক।

আমিও তোমায় ভালোবাসি, বলি প্রত্যুত্তরে;
আমার কাছে ফুল যে প্রিয়, নীলটা বিশেষ করে।

- অজ্ঞাতনামা

করণীয়- ৫: অতীতের বাবা-মা বনাম আজকের বাবা-মা

নিচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবুন এবং আপনার সন্তানের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করুন:

আপনার বাবা-মায়ের সাথে আপনার যতটা ঘনিষ্ঠতা সে সময়ে ছিলো, তার চেয়ে কি নিজের সন্তানের সাথে আপনি বেশি ঘনিষ্ঠ? (যুক্তরাষ্ট্রের ৭৬% বাবা-মা জবাব দিয়েছেন হ্যাঁ)।

আপনি যখন কলেজে পড়তেন, তখন আপনার বাবা-মা আপনার সাথে যে পরিমাণ কথা বলতেন আপনি কি আপনার সন্তানের সাথে তার চেয়ে বেশি কথা বলেন? (যুক্তরাষ্ট্রের ৭১% বাবা-মা জবাব দিয়েছেন হ্যাঁ (Kantrowitz and Peg, 2006)।

দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং আত্মীয়-স্বজনের গল্প উল্লেখ করার মাধ্যমে পুরো পরিবারকে বলুন কীভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করতে। এটি শিশুদের বাবা-মা এবং পরিবারের পরিচিতির শেকড়ে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়াও এটি এমন ইতিহাস শেখাবে যা ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা ।

করণীয়- ৬: বাবা-মা হিসেবে আপনি পরিবর্তন আনতে পারেন

নিচের ঘটনাটি আপনার সন্তানদের সাথে আলোচনা করুন:

এক বন্ধু আমাকে বলল, 'আমি আমার সন্তানের সাথে কী করি সেটি তেমন বড় কোনো বিষয় নয়। আমিতো একাই একজন ব্যক্তি মাত্র।'

পৃথিবীর প্রতিটি লোকই যদি 'একা একজন সাধারণ ব্যক্তি হওয়ার কারণে' ভিন্ন কিছু করা বন্ধ করে দিত, তাহলে এ ভিন্ন কিছু করার জন্য কে থাকত? এটি একটি ভুল বিশ্বাস। আমরা জানি, আল্লাহর নবিদের প্রত্যেকে একজন ব্যক্তিই ছিলেন। ইতিহাসের মহান পুরুষ এবং নারী সাহাবি, জ্ঞানী আর বিদ্বান ব্যক্তিরাও প্রত্যেকেই একজন মাত্র ব্যক্তি ছিলেন। তারা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছেন। স্টিভ জবস এবং বিল গেটসের কথাই ভাবুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন: আপনার জীবনে কে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন? তিনি কি কোনো আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, প্রশিক্ষক নাকি ধর্মীয় শিক্ষক? আপনার সন্তানদেরকে আপনার গল্প বলুন এবং তাদের জীবনে কে পরিবর্তন এনে দিয়েছে তা আলোচনা করতে বলুন।

করণীয়- ৭: শিশুরা, তোমরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করো?

শেল সিলভারস্টেইনের 'দ্য গিভিং ট্রি' গল্পটি আপনার কোনো শিশুকে জোরে জোরে পড়তে বলুন। এরপর আপনার সন্তানদের কাছে জানতে চান, তারা আপনার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে। কী, কখন এবং কীভাবে? তারপর আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন তা বলুন।

শেল সিলভারস্টেইনের 'দ্য গিভিং ট্রি' গল্পটি জঙ্গলের একটি গাছের সাথে ছোটো এক ছেলের সম্পর্ক নিয়ে। গাছটি সবসময় ছেলেটি যা চায় তাই দেয়। ছেলেটির

বাল্যকালে গাছটি তার শাখাগুলো বাড়িয়ে দেয়, যাতে সে এগুলোতে ঝুলতে পারে। পরবর্তী সময়ে গাছটি তাকে বসার জন্য ছায়া দেয়, খাওয়ার জন্য আপেল দেয় এবং ঘর বানানোর জন্য ডালপালা দেয়। ছেলেটি যত বড় হতে থাকে, গাছের কাছে তার প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। কিন্তু যে গাছটি তাকে সাহচর্য দেয়ার জন্যই জন্মেছে সেই দুঃখী গাছটিকে সে এর পরিবর্তে কিছুই দেয় না। আত্মত্যাগের এক পর্যায়ে গাছটি সেই ছেলের কাছে নিজেকেই দিয়ে দেয় কাটার জন্য, যাতে সে নৌযাত্রার জন্য একটি নৌকা বানাতে পারে। ছেলেটি এখন একজন পুরুষ। মুড়ো গাছ রেখে ছেলেটি চলে যায়। অনেক বছর পর ছেলেটি বৃদ্ধ হয়ে গেলে বিশ্রামের জন্য একটি নিরিবিলি জায়গা খোঁজে। আবার সে গাছটির কাছে ফিরে আসে। গাছটি তার মুড়ো বা কাণ্ড দিয়েই শেষ পর্যন্ত ছেলেটির সঙ্গী হতে পেরে আনন্দ উপভোগ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার-এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা

- ভূমিকা ৫৭
- প্যারেন্টহুড বা অভিভাবকত্বে উত্তরণ ৫৮
  বিবাহের স্থায়িত্বের ওপর সন্তানদের প্রভাব ৬০
- আমেরিকায় পরিবারের আকার- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৬৬
- সিঙ্গেল-প্যারেন্ট পরিবার ৬৮
  সফল সিঙ্গেল-প্যারেন্ট হবার নীতিসমূহ ৭৩
  নবি রসুলগণের ওপর সিঙ্গেল মাতৃত্বের প্রভাব ৭৪
  ইসমাঈল আ., মুসা আ., ইসা আ. ও মুহাম্মদ সা. ৭৪
- একজন প্যারেন্ট কি অন্যজনের বিকল্প হতে পারে? ৭৬
  ইসলাম ও তালাক প্রসঙ্গ ৭৮
- ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ৮৩
  কুরআনের ভাষায় পরিবারের উদ্দেশ্য ৮৬
  মুসলিম পরিবারগুলোর স্খলন ৯০
  শিশু উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা ৯৩
- যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার ৯৯
  আমেরিকায় প্যারেন্টিং-এর প্রচলিত ভুল ধারণা ১০১
  কলাম্বিয়ান হাই স্কুলের গণহত্যা থেকে শিক্ষা ১০৭
  শিশুদের মূল্যবোধ শিক্ষাদান: রক্ষণশীল বনাম উদারনীতি বিতর্ক ১০৯
- মুসলিম দেশগুলোর পরিবার বনাম যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার ১১১
- ব্রিটেনে বসবাসরত মুসলিমদের কাহিনী ১১৪
- মুসলিম প্যারেন্টিং-এর ওপর পশ্চিমা প্রভাব ১১৫

- যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যারেন্টিং **১১৬**
- স্বাধীনতা নাকি বাস্তবতা? **১১৭**
- কোথায় সন্তানদের বড় করবেন? **১২৩**

  একটি কেস স্টাডি: পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তরের কারণে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংঘাত **১২৩**
- পশ্চিমা চিন্তার হারিয়ে যাওয়া দুটি ধারণা **১২৫**
- ধর্মীয় মূল্যবোধ বনাম কর্তব্যমূলক মূল্যবোধ **১২৬**
- পরিবারের কৃষি মডেল; পরিবার যখন শস্যক্ষেত: সন্তানরা চারা আর বাবা-মা সেখানে মালী **১৩০**
- করণীয়: ৮-১৫ **১৩১**

ভূমিকা

পরিবার কী? এর ভূমিকা আর উদ্দেশ্য কী? পরিবার কীভাবে কাজ করে? কোন কোন উপাদান পরিবারকে মজবুত করে? কোন ব্যাপারগুলো একে অস্থিতিশীল করে? একে সফল করার পিছনে এর প্রত্যেকটি সদস্যের কতখানি অবদান রাখা জরুরি? এর সাফল্য কীভাবে পরিমাপ করা যায়? ভালো প্যারেন্টিং এবং সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। এ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়াও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে পরিবারের শক্তিশালী ভূমিকা সম্পর্কেও পাঠকদের অবহিত করব। পরিবার শুধু এর সদস্যদের ওপরই নয় বরং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। এ অধ্যায়ের শেষে আমরা পশ্চিমা ও মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত প্যারেন্টিং-এর অনুশীলন তুলে ধরব।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা ভালো প্যারেন্টিং কেন গুরুত্বপূর্ণ; কীভাবে উত্তম প্যারেন্টিং পদ্ধতি শেখা যায় এবং সন্তানদের গড়ে ওঠা কীভাবে প্যারেন্টিং পদ্ধতি বাছাইয়ের ওপর নির্ভরশীল- এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে ভালো প্যারেন্টিং কেবলমাত্র প্যারেন্টিং-এর নিয়ম-কানুনগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার ওপরেই নির্ভর করে না, বরং এর ব্যাপ্তি আরো গভীরে। পরিবারের ধরন প্রকৃতি এবং এর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক গভীর জ্ঞান ও সচেতনতাও ভালো প্যারেন্টিং-এর জন্য জরুরি। আর সে বিষয়েই আলোকপাত করা হবে এ অধ্যায়ে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে ভালোবাসা, যত্ন (তত্ত্বাবধান ও তদারক) ও নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। একটি ভালোবাসাপূর্ণ উষ্ণ পারিবারিক পরিবেশ বাবা-মা ও সন্তান সবার জন্যই প্রয়োজন। ভালো প্যারেন্টিংই পারে সন্তানদের সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন সভ্য মানুষে পরিণত করতে।

এ অধ্যায়ে আমরা আরো আলোচনা করব সিঙ্গেল-প্যারেন্ট পরিবার, তালাক, পরিবারের আকারের পরিবর্তন এবং মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পারিবারিক অবস্থা নিয়ে। মনে হতে পারে যে, মুসলিম পরিবারের অস্থিতিশীলতা সন্তান প্রতিপালনের ওপর খুব একটি প্রভাব ফেলে না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা অনেক ভিন্ন। সমাজকে সুদৃঢ়, স্থির ও বেগবান করার জন্য স্থিতিশীল পরিবার অপরিহার্য। সুস্থ পরিবার ছাড়া উন্নত সমাজ সম্ভব নয়- মুসলিম সমাজের জন্য এ কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য।

পরিবারকে নানাজন নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। কেউ কেউ মনে করেন, পরিবার হলো কিছু মানুষের

সমষ্টি যারা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অনেকে মনে করেন, এটি একটি সামাজিক একক। আবার অনেকে বলেন, এক বাড়িতে বসবাসরত বাবা-মা ও সন্তানদের সমষ্টি-ই পরিবার। পরিবার নিয়ে নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত থাকলেও ঐতিহ্যগতভাবে পরিবারের সংজ্ঞা বিবাহ ও সন্তান-সন্ততির সাথে সম্পর্কযুক্ত। গতানুগতিকভাবে ধারণা করা হতো যে, যদিও বিয়ের মাধ্যমে নতুন একটি পরিবারের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তথাপি বিয়ে কেবলমাত্র দুটি ব্যক্তির অংশিদারিত্ব নয়, বরং দুটি বিস্তৃত পরিবারেরও মিলন। সময়ের বিবর্তনে আধুনিক পরিবার ধারণায় (বিশেষ করে পশ্চিমে) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; যৌথ পরিবার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে একক পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। তাছাড়া পরিবারের আকারও পরিবর্তিত হচ্ছে, কারণ মানুষ কম সংখ্যক সন্তান গ্রহণ করছে।

প্রকৃতপক্ষে, পরিবারকে কেবলমাত্র এর অংশসমূহের সমষ্টিকারক একটি পাত্র হিসেবে না দেখে আরো বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা জরুরি। এটি যেমন এর অংশের সমষ্টি, ঠিক তেমনি এটি নিজেও একটি বৃহৎ সমষ্টির অংশ। প্রত্যেকটি পরিবারই একটি বৃহৎ সংস্কৃতির অংশ এবং আদর্শগতভাবে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির ধারক। পরিবারে আমাদের ভূমিকার গুরুত্বের গভীরতা আমাদের অনুভব করা অত্যন্ত জরুরি। একটি পরিবার শুধুমাত্র একটি পরিবার নয়, বরং এটি একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনাগার, একটি ক্ষুদ্র সরকার এবং ক্ষুদ্র পরিসরে মানবিক মূল্যবোধ ও মানবিয় গুণাবলীর চর্চা কেন্দ্র; এটি বাইরের বৃহৎ পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র মডেল।

প্যারেন্টহুড বা অভিভাবকত্বে উত্তরণ

যখন আমরা একটি পরিবারের কথা ভাবি, স্বভাবতই আমাদের চিন্তায় আসে বাবা-মা আর সন্তানদের কথা। প্রথম শিশুর আগমনের মধ্য দিয়ে একটি পরিবার- যুগল পর্যায় থেকে ত্রয়ী পর্যায়ে উত্তরণ লাভ করে, আর বাবা-মা প্রথম পিতৃত্ব-মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সন্তান লাভের মধ্য দিয়ে বাবা-মা জীবনের যে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেন, সেখানে তাদেরকে সেই পরিবর্তিত নতুন

জীবন পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সন্তান আসার সঙ্গে যে কষ্ট, উদ্বিগ্নতা, সুখ আর আনন্দ আসে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাদেরকে একটি সমন্বয় কাল (Adjustment Period) অতিবাহিত করতে হয়। উল্লেখ্য, একটি মুসলিম পরিবারে যখন একটি শিশুর জন্ম হয়, তখন সেই নবজাতককে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় (Zaydan, Abdul Kareem, in Arabic, 1993):

- নবজাতকের কানে আজান দেয়া। আল হাকিম আবু রাফি থেকে বর্ণনা করেন, "আমরা দেখেছি যে, রসুল সা. হযরত আলী রা.-এর পুত্র হাসানের কানে আজান দেন যখন তার মাতা ফাতিমা তাকে জন্ম দেন"। ডান কানে আজান এবং বাম কানে সালাতের ইকামাহ পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একত্ব, নবি মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের সত্যতা এবং ভবিষ্যতে শিশুটিকে সালাত আদায় শিক্ষাদানের কথা বিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
- দেরি না করে তার নামকরণ করা। শিশুকে একটি ভালো অর্থবোধক নাম দেয়া জরুরি (এর মাধ্যমে আপনি শিশুর সামনে এক অনুসরণীয় আদর্শ উপস্থাপন করতে পারেন)। নাম যে আরবি বা ঐতিহাসিক নাম হতেই হবে এমনটি নয়; তবে শর্ত হলো নামের অর্থটি সুন্দর হওয়া উচিত। এমন নাম রাখার চিন্তা করা যেতে পারে যা একাধিক ভাষায় উচ্চারণ করা ও লেখা সহজ।
- শিশুর জন্য আকিকা'র (জন্ম উদযাপন) ব্যবস্থা করা। 'আকিকা (আরবি শব্দ) বলতে- নবজাতকের জন্য একটি পশু জবাই করে আল্লাহ তা'আলার নামে উৎসর্গ করা বোঝায়। রসুল সা. তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের জন্য একটি দুম্বা কুরবানি করেছিলেন। এটি সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে অথবা পরবর্তী সময়ে করা যায়। এর গোশ্ত রান্না করে সামাজিক উৎসবে লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়ানো যায়। ধনী-গরিব উভয় পরিবার ও সমাজের লোকদের খাওয়াবার জন্য এর গোশ্ত ব্যবহার করা উচিত। উল্লেখ্য, আকিকার পশুটিকে হতে হবে সুস্থ ও নিখুঁত। জবেহ করার সময় নিচের দোয়াটি পড়তে হবে। "আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু

করছি, হে আল্লাহ তা'আলা আপনার থেকে আপনারই উদ্দেশ্যে শিশুটির (নাম) জন্য এ আকিকা"।

- আহমদ এবং তিরমিযির বর্ণনা মতে, রসুল সা. বলেন, প্রত্যেক শিশুই আকিকার জন্য দায়বদ্ধ থাকে যা শিশু জন্মের সাত দিনের মধ্যে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। এ শিশুটির মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং একটি নাম রাখতে হবে। এ কাজগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে, কিন্তু বাধ্যতামূলক করা হয়নি। রসুল সা. তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (*রাদিআল্লাহু আনহা*)-কে সন্তানের কেটে ফেলা মাথার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা গরীবদের দান করতে বলেন। ইহুদিদের প্রচলিত রীতি প্রায় এ রকমেরই, তবে খ্রিস্টানদের দীক্ষা অনুষ্ঠানে তাদের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

বিবাহের স্থায়িত্বের ওপর সন্তানদের প্রভাব

সন্তান আগমনের সাথে সাথে পরিবারের ওপর একটি চাপের সৃষ্টি হয়। একথা সত্যি যে, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব একটি অসামান্য পাওয়া, কিন্তু এর অভিজ্ঞতা সবসময় রোমাঞ্চকর হয় না। বাবা-মা হবার সাথে সাথে দম্পতিকে মেনে নিতে হবে যে, জীবনটা আর আগের মতো থাকবে না; সেই সাথে সামনে যেসব সমস্যা আসবে তার জন্যও নিজেদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। বাবা-মাকে সন্তানদের স্বার্থে নিজেদের অনেক স্বার্থকেই বিসর্জন দিতে হবে, এমনকি তাদের বাব-মা হবার যোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। বাবা-মায়েদের জন্য, বিশেষ করে মায়েদের জন্য শিশুর অবিরাম চাহিদা পূরণের ধকল ও ক্লান্তিকে মেনে নেয়া সহজ ব্যাপার হবে না। অপরদিকে বাবারা ঘরে ফিরে হয়তো দেখবেন না স্ত্রীর আনন্দময় মুখ, হাসিখুশি শিশু অথবা গোছালো পরিপাটি ঘর-দরজা। অনেক বাবাই নিজের স্ত্রীদেরকে অধিক কাজের চাপে বিধ্বস্ত দেখবেন এবং পূর্বের মতো স্ত্রীকে তাদের প্রতি অতটা যত্নশীল পাবেন না।

মাতৃত্বের সাথে যুক্ত থাকে শারীরিক, আবেগিক[১] ও মানসিক ক্লান্তি। অল্প ঘুম এবং অবিরত শিশুর যত্ন অনেক মজবুত সম্পর্কেও প্রভাব ফেলে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

---

[১] Emotional

তুমি একই সময়ে সবকিছুতে সেরা হতে পারবে না!

আমি মা, ঘরে থাকি, কোনো কাজ করি না- এমনটি অসম্ভব।[২]

একই সময়ে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী, মা, গৃহিণী এবং পুরোদমে কর্মজীবী হবার চেষ্টা করো না। তুমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক কাজ করতে পারবে। সন্তান তোমার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে, তাই পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করো, পরিবার বান্ধব এবং নমনীয় হও।

সন্তানের যত্নের পাশাপাশি দম্পতি যখন পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খায় তখন অর্থনৈতিক বিষয়গুলোও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বিবাহিত জীবনের ওপর এসব কিছুর প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে। ফুল টাইম চাকরি করেন এমন বাবা-মায়েদের জন্য এসময়টি অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কিছু বাবা-মা সন্তানদের চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে (Child Care Centre) না রেখে পালাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শিফটে চাকরি করেন, যাতে সবসময় কোনো একজন শিশুর সঙ্গে বাসায় থাকতে পারেন। যদিও এটি শিশুর জন্য ভালো, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জন্য সবসময় অনুকূল হয় না। এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের মধ্যে দ্রুত সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। কার ভাগে ঘর পরিষ্কার করা বা বাসন-কোসন ধোয়া পড়েছে এ ধরনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ এবং অসম্মানজনক মানহানিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিতে পারে। অপরদিকে, যেসব বাবা-মায়ের মধ্যে সন্তানের সাথে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে না পারার অপরাধবোধ কাজ করে- তারা 'দাম্পত্য সময় কমিয়ে' 'সন্তানের জন্য সময়'কে বর্ধিত করতে পারেন। আবার কিছু বাবা-মা সেটি পুষিয়ে নিতে চান সন্তানদের উপহার, টাকা এবং অস্বাস্থ্যকর ফাস্ট ফুড দিয়ে যা পরিণামে শিশুদের নষ্ট করে, আর বাবা-মা আরো বেশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়েন।

[২] There is No Such Thing as Mother who has no work

এ ধরনের চাপ বৈবাহিক সম্পর্ককেই প্রতিকূলতার মুখে ফেলতে পারে। বিশেষ করে যখন দম্পতি তাদের সীমিত সময় আন্তরিক আলাপের চেয়ে পরস্পরের প্রতি অনুযোগ-অভিযোগ করেই অতিবাহিত করে। বাবা-মায়ের মধ্যকার বৈবাহিক দ্বন্দ্ব সন্তানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যথেষ্ট পরিমাণ পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে অনেক বাবা-মায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তা তাদের অবিরত দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেয়।

নিচে কিছু পরামর্শ দেয়া হলো বাবা-মাকে তাদের প্যারেন্টহুড তথা অভিভাবকত্বে উত্তরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করবার জন্য। আশা করা যায় স্বামী-স্ত্রী থেকে বাবা-মা হওয়ার পথে পরিবারের গতিময় পরিবর্তনে এ পরামর্শগুলো অনেকটা চাপ কমাবে।

> পরিবারের দিকে খেয়াল দাও, দেখবে সমাজ আপনা থেকেই ঠিক হয়ে গেছে।[৩]
> Confucius

১. দৈনিক কিংবা সপ্তাহে স্বামী-স্ত্রী একসাথে নিজস্ব সময় কাটানোর জন্য কিছু সময় বরাদ্দ করুন। একসাথে বেড়াতে যান, কিছু কাজ একসাথে করুন কিংবা রাতের খাবারটা একসাথে খান। দিনের বেলায় প্রয়োজনীয় ফোনালাপ সেরে ফেলে অথবা সকালে কিছুটা আগে ঘুম থেকে জেগে কিছু সময় সঞ্চয় করুন- যাতে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি দেয়ার কিছুটা সময় বের করতে পারেন। শিশুর দেখাশোনার দায়িত্বটি অন্য কোনো বিশ্বস্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়াটাও একটি ভালো ব্যবস্থা (যেমন: ধরুন সেই দম্পতির সাপ্তাহিক বেড়াতে যাবার সময়টায় আপনারা তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করলেন, আবার তারা আপনাদের সময়ে আপনাদের সন্তানদের ভার নিলেন)।

২. জীবনসঙ্গীর সাথে প্রত্যাশাগুলো ভাগাভাগি করে নিন। প্যারেন্ট হিসেবে নতুন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যা আপনি লক্ষ করছেন সেসব উদ্বেগের বিষয় তার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন। আপনার স্বাস্থ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং চাকরির ওপর প্যারেন্টহুডের প্রভাব নিয়ে কথা বলুন।

৩. জীবনসঙ্গীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ, ইবাদত, যৌনমিলন এবং শরীর চর্চায় সময় দিন। যদিও শিশুর চাহিদা আপনার সময়ের প্রায় সবটুকু নিয়ে নেয়, তারপরও জীবনসঙ্গীর জন্য সময় বের করে নিন। এমনকি ময়লা কাপড়-চোপড় অথবা অপরিষ্কার বাসনকোসন ধোয়ার জন্য পড়ে থাকলে তেমন ক্ষতি নেই।

৪. আপনার মতামত প্রকাশ করুন; দ্বন্দ্বকে গুরুত্বহীন ভেবে এড়িয়ে যাবেন না। কোনো ব্যাপারে বিবাদকে সম্পর্কের মধ্যকার কোনো ফাটলের ইঙ্গিত হিসেবে নিন এবং দুজনে মিলে পরামর্শ বা আলোচনার (Counseling) মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করুন।

৫. বিশ্বস্ত বন্ধু বা অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাথে কথা বলুন, যার বাবা কিংবা মা হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এটি আপনার বিষণ্নতা দূর করতে সাহায্য করবে। কথা বলার জন্য একই লিঙ্গের ব্যক্তি নির্বাচন করুন এবং কোনো অবস্থাতেই আপনার স্বামী বা স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় কোনো বিষয় প্রকাশ করবেন না।

বাবা-মায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশীদারিত্বের ওপর প্যারেন্টিং নির্ভর করে- যেখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব আলাদা অথচ সম্পূরক। এমনকি সন্তানদের সাথে খেলা করার ব্যাপারটিতেও এটি সত্যি; বাবা-মা এক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে সন্তানদের প্রয়োজনে। দেখা যায়, মা শিশুকে আলিঙ্গন করেন, বুকে টেনে প্রশান্তি দেন এবং দুহাতে জড়িয়ে আদর ও ভালোবাসায় ভাসিয়ে দেন। অপরদিকে, বাবা সন্তানকে শূন্যে বাতাসে ছুঁড়ে দেন আবার ধরে ফেলে তার সাথে মজা করেন (অবশ্য এটি সন্তানের দুবছর বয়সের পর); সন্তানকে পিঠে চড়ান, তার সাথে মেঝেতে কুস্তি কুস্তি খেলেন। এ দুধরনের অনুশীলনই প্রয়োজন শিশুকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে এবং শিশুর ভিতরে লুকিয়ে থাকা কঠোরতা ও অহংকার প্রকাশে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং ঝুঁকি গ্রহণের গুণ তৈরি করতে। বাবা-মা উভয়কেই তাদের ভূমিকা পূর্ণ করতে হবে তাদের

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনে। একজন বাবার জন্য প্যারেন্টিং হলো নিজের স্ত্রীর সাথে অংশীদারিত্ব। মনে রাখবেন, নিরাপত্তাদানকারী বাবা হিসেবে আপনার ভূমিকা অপূরণীয়। আপনাকে জানতে হবে কখন 'বাবা' হতে হবে আর কখন 'বন্ধু' হতে হবে- অর্থাৎ কখন সুরক্ষা দিতে হবে এবং কখন আপনার সন্তানকে 'উপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের' জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

সন্তানের আগমন বাবা-মায়ের বৈবাহিক সম্পর্কে যতটাই প্রতিকূল প্রভাব ফেলুক, পরিণামে সন্তান মূলত বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রতিশ্রুতিশীল করে তোলে। চিত্র ২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে- যে দম্পতির যত বেশি সন্তান, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। বাবা-মায়ের ওপর নির্ভরশীল সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা-মা তাদের বিবাহকে রক্ষা করে ও ছেলে-মেয়েদের উচ্চতর জীবনের জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যায়। সাধারণত দেখা যায়, অসুখী হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকগণ বিশেষ করে ছোটো শিশুর মায়েরা বিবাহ রক্ষায় বেশি আগ্রহী হন। সন্তানরা কখনো সংসারে সুখ বাড়ায়, আবার কখনো কমায়; কিন্তু তারা নিশ্চিতভাবে বৈবাহিক স্থিতিশীলতা বাড়ায় ও তালাক এড়িয়ে একত্রে থাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

বৈবাহিক স্থিতিশীলতার উপর সন্তানদের প্রভাব

FIG 2.1 (KNOX AND SCHACHT 1997)

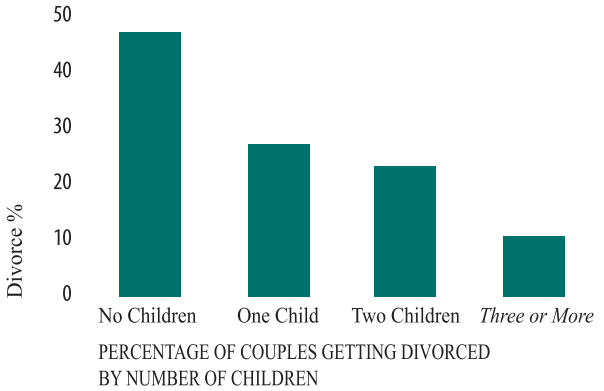

PERCENTAGE OF COUPLES GETTING DIVORCED
BY NUMBER OF CHILDREN

আর্থার ব্রুকস তার গ্রন্থ Gross National Happiness-এ ব্যাখ্যা দেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বাবা-মা হওয়া স্বামী-স্ত্রীরা, নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী থেকে অধিক সুখী। যার একটি কারণ হলো, সন্তান জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। তাছাড়া বিবাহিত দম্পতিদের (যাদের সপ্তাহে গির্জায় যাওয়ার সম্ভাবনা অবিবাহিতদের চেয়ে দ্বিগুণ) অবিবাহিতদের চেয়ে বেশি সুখী হবার সম্ভাবনা থাকে, এজন্য নয় যে তারা সম্পদশালী, বরং এ কারণে যে তাদের জীবন অধিক সমৃদ্ধ (Brooks, 2008)।

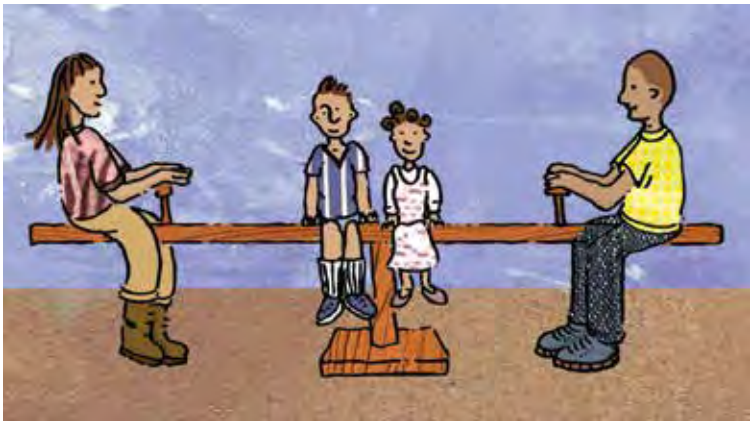

কার কী করণীয়:

বাবা-মা : একটি সুখী গৃহ সৃষ্টি করবে।

সন্তান : বাবা-মায়ের কাছ থেকে শিখবে ও তাদের সাহায্য করবে।

দাদা-দাদি/নানা-নানি : বংশ পরম্পরায় পরিবারকে একসাথে বেঁধে রাখবে।

বন্ধু : বাবা-মা কে সাহায্য করবে।

শিক্ষক : সন্তানকে শিক্ষিত করবে।

সংস্কারক : বাবা-মাকে ভালো প্যারেন্টিং-এর জ্ঞান প্রদান করবে।

সন্তানদের সঙ্গে বসবাস- একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায়

অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। (সুরা ইনশিরাহ, ৯৪: ৫-৬)

অনেক সময় নবজাতক শিশুর বাবা-মায়ের মনে হয় যে, এ নির্ঘুম রাত আর বুঝি শেষ হবে না। অথচ দেখতে না দেখতেই সন্তানরা বেড়ে ওঠে আর একসময় যে যার পথে চলেও যায়। বাবা-মা-সন্তান সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিচ্ছেদের দিকেই অগ্রসর হয়। বিবাহিত বাবা-মা সন্তান আগমনের পূর্বে যেমন তারা কেবল দুজন থাকে, তেমনি করে সন্তানরা বড় হয়ে চলে যাবার পর তারা আবার দুজন হয়ে যায়। প্যারেন্টিং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পুরো জীবন ও বিবাহিত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাত্র। সন্তানের সাথে যাপিত জীবন পুরো জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আর বিবাহিত জীবনের অর্ধাংশের কিছু বেশি। বছরের হিসেবে সে যাহোক, একবার যিনি বাবা-মা হন তিনি সারাজীবনই বাবা-মা থাকেন। এ সম্পর্ক চলতে থাকে অনন্তকাল ধরে, এমনকি সন্তানদের বিয়ের পর গৃহত্যাগ করে চলে যাবার পরও। মূলত সন্তান কাছে থাকুক আর হাজার মাইল দূরে, এ সম্পর্ক চলতেই থাকে (এবং থাকা উচিত)। এরপর বাবা-মা অগ্রসর হন দাদা-দাদি, নানা-নানি হবার পর্যায়ে।

আমেরিকায় পরিবারের আকার-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আমেরিকাতে পরিবার ছোটো হয়ে আসাটা পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। অল্প সংখ্যক ছেলে-মেয়ে হওয়ায় সন্তানরা বাবা-মায়ের মনোযোগ বেশি লাভ করে। এভাবে পারিবারিক বন্ধন আরো দৃঢ় ও নিবিড় হয়। কিন্তু অপরদিকে, এমন পরিবারের সন্তানরা ছোটো ভাই-বোনদের দেখাশোনার দ্বারা যে দক্ষতা লাভ হয় তা থেকে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য, বেবি বুমার প্রজন্ম (১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ এর মধ্যে ৭৭ মিলিয়ন আমেরিকান জন্মগ্রহণ করেছিলো) মাত্র ৮০ মিলিয়ন (৮ কোটি) শিশু জন্মদান ও লালন-পালন করেছিল। অর্থাৎ

যখন আমেরিকানদের আয় ও শিক্ষা বেড়ে গেলো, তখন তাদের পরিবারের আকার হলো ছোটো। স্বল্প সন্তান গ্রহণকে সহজ করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং গর্ভপাত খুব সহজলভ্য হলো। এর আগের যুগে বাবা-মা সন্তানদের ভাবতো মিষ্টি বানানোর মতো। প্রথম কয়েকটি হয়তো ঠিকমতো হবে না কিন্তু আপনি আরো কয়েকটি বানাতে তো পারেনই। এখন অনেক পরিবারে মাত্র একজন বা দুজন সন্তান, সুতরাং বাবা-মা তাদের প্রতি মনোযোগ আর মনোনিবেশ করতে পারেন। এছাড়াও আরো যে কয়েকটি কারণে পরিবারের আকার ছোটো হয়ে আসছে তা হলো- বাবা-মা দুজনই কর্মজীবী এমন পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারের স্থানান্তরিত হওয়ার হার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে পরিবারের দূরত্ব বেড়ে যাওয়া।

১৯৬০ সালে ৭৭ শতাংশ আমেরিকান মহিলা বিয়ে করে এবং ৩০ বছর বয়সের মধ্যে সন্তান গ্রহণ করে। ২০০০ সালে মাত্র ৪৬ শতাংশ আমেরিকান মহিলা বিয়ে করে এবং ৩০ বছর বয়সের মধ্যে সন্তান গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ের গড় বয়স ২০০০ সালে পুরুষদের জন্য ছিল ২৭ এবং মহিলাদের জন্য ২৫ বছর। ১৯৫০ সালে বিয়ের গড় বয়স ছিল যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের জন্য ২২ বছর এবং মহিলাদের জন্য ২০ বছর (Kantrowitz and Tyre, 2006)।

সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবার

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারজনে একজন শিশু সিঙ্গেল প্যারেন্ট (বাবা/মা বিচ্ছিন্ন) পরিবারে বাস করে (১২ মিলিয়ন শিশু)। প্রায় দুমিলিয়ন (২০ লাখ) আমেরিকান প্যারেন্ট সিঙ্গেল মা এবং এক মিলিয়ন প্যারেন্ট সিঙ্গেল বাবা। দশ বছরে সিঙ্গেল বাবার সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে (Leland, 1996)। সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর দুটি প্রধান কারণ হলো- তালাক এবং বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান।

বিয়ে (এবং এর সকল প্রতিশ্রুতি) কিছু যুগল নারী-পুরুষের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত যারা একসাথে বাস করে বৈবাহিক বন্ধন ছাড়া। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ মিলিয়ন শিশু অবিবাহিত প্যারেন্টস এর সাথে বসবাস করে (U.S. Census Bureau-এর হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা প্রায় ৪%)। ১.৮ মিলিয়ন শিশু বাস করে তাদের মা এবং তার সঙ্গীর সাথে, যেখানে ১.১ মিলিয়ন বাস করে তাদের বাবা ও তার সঙ্গিনীর সাথে (U.S. Census Bureau, 2002)।

U.S. Census, 2000 গণনায় দেখা যায়, ৪.৯ মিলিয়ন বাড়িতে বাড়ির মালিক একজন অবিবাহিত বিপরীত লিঙ্গ সঙ্গী নিয়ে বসবাস করে, যা ১৯৯০ সালের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৩ মিলিয়ন বেশি।

২০০০ সালে US এ ১০৫.৫ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে

- ৫৪.৫ মিলিয়ন ছিল বিবাহিত দম্পতি।
- ৪.৯ মিলিয়ন অবিবাহিত জুটি যাদের বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী ছিল।
- ০.৬ মিলিয়ন জুটি ছিল একই লিঙ্গের অর্থাৎ সমকামী।

ত্রুটিমুক্ত তালাকের "No- Fault Divorce" ঘটনা

ত্রুটিমুক্ত তালাক-এর একটি কাঠামো হলো: যেখানে বাবা-মা উভয়ই বৈবাহিক সম্পর্ক সমাপ্ত করার ব্যাপারে একমত হন এবং বিচারক কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন না। অনেকে এ ধরনের তালাকের সমাপ্তি চান। তালাকের হার বৃদ্ধির কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার তৎকালীন গভর্নর রোনাল্ড রিগ্যান (তিনি নিজেও তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন) ১৯৯৬ সালে প্রথম আইনে সাক্ষর করেন যা দম্পতিদের ত্রুটিমুক্ত তালাক-এর অনুমতি দেয়। এর আগ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীদের আদালতে প্রমাণ করতে হতো যে অপরজন (স্বামী/স্ত্রী) অন্যায় করেছে, যাতে করে বিচারক তাদের বিবাহের ইতি টানতে পারেন (তালাকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে কারণগুলো দেখানো হতো তা হলো ব্যভিচার, বিশ্বাসভঙ্গ এবং পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া)। ফলে যেসব দম্পতিরা তালাক চাইতো তারা আদালতে নানা মিথ্যার আশ্রয় নিত বা বেসরকারি গোয়েন্দা নিয়োগ করত অন্য পক্ষের ওপর নজরদারী করার জন্য। এ কারণে এ বিল তৈরি করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল তালাকের ইচ্ছা পোষণকারী দম্পতিদের পারস্পরিক বিদ্বেষ, আক্রমণ ও ছলচাতুরীর এ ধারা বন্ধ করা। যারা উভয়েই বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে সমাপ্তি টানতে চায়, এ বিল তাদের আপোষে তা সম্পন্ন করতে অনুমোদন দেয়। এমনকি যদি একজন তালাকের ব্যাপারে আপত্তি জানায়ও, তথাপি অপরজন সঙ্গীর প্রতি অন্যায় আচরণের দোষারোপ করা ছাড়াই তালাক পেতে পারে। প্রতিটি স্টেট (নিউইয়র্ক ছাড়া) ক্যালিফোর্নিয়ার অনুসরণ করে এবং ত্রুটিমুক্ত তালাকের অনুমতি দেয়। ত্রুটিমুক্ত তালাকের অনুমোদন দেয়ার তিন বছরের মাথায় তালাকের হার আকস্মিকভাবে কমে যায়।

Leland, 1996

সিঙ্গেল প্যারেন্টরা সদা একজন একান্ত বিশ্বস্ত উপদেশদাতা পাওয়ার মতো বিরাট এক স্বস্তি ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়: সেই উপদেশদাতা হলেন তার সন্তানের বাবা অথবা মা।

আমরা মনে করি, একজন শিশু বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জন্ম নিলেও বাবা-মায়ের পিতৃত্ব-মাতৃত্ব কমে যায় না। বরং সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে তাদের বড় করতে বাবা-মায়ের বাড়তি ধকল নিতে হয়। সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে সন্তানকে মানুষ করার জন্য দরকার বিপুল সহ্য শক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ় মানসিক জোর। কর্মক্ষেত্র ও পরিবারের চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সহজ কথা নয়। মানসিক ও আবেগজনিত উভয় দিক থেকেই সিঙ্গেল প্যারেন্টিং কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর। সিঙ্গেল প্যারেন্টিং-এ অনেক বেশি ধৈর্য ও দক্ষতার প্রয়োজন দ্বৈত প্যারেন্টিং-এর তুলনায়। সিঙ্গেল প্যারেন্টের নিজেকেই বাবা ও মায়ের দ্বৈত ভূমিকাই পালন করতে হয়। এককভাবেই নিতে হয় সব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, জোরদার করতে হয় পারিবারিক সব নিয়ম-কানুন, সামলাতে হয় সন্তানের অসদাচরণ, মেটাতে হয় সন্তানদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ; আর এসবের পরে মেনে নিতে হয় একাকীত্বকে। এর অর্থ এ নয় যে, দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারে সবসময় সবকিছু ভালো যায়, তবে সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের সবকিছু আরো বেশি কঠিন। বিশেষ করে আত্মিক বা মানসিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সব বাবা-মায়েরই ইতিবাচক মনোভাব থাকা প্রয়োজন। সিঙ্গেল প্যারেন্টদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি সত্যি।

শিশুদের ক্ষেত্রে, সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে বেড়ে ওঠা মানে দ্বিতীয় জনের (বাবা বা মা) যত্ন ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। তবে সবক্ষেত্রেই দ্বিতীয় জন একেবারে নিষ্ক্রিয় বা শিশুর জীবনে অনুপস্থিত থাকে না। তালাকপ্রাপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় প্যারেন্ট সন্তান লালন-পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে শিশুরা দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারের শিশুদের থেকে বেশি অসহায় বোধ করে। সিঙ্গেল প্যারেন্টরা তাদের সন্তানদের আদর-ভালোবাসায় কোনো কমতি করেন না। তবে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা যত বেশি থাকে, শিশুদের কষ্ট তত কম হয়।

নিচে শিশুদের ওপর সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের নেতিবাচক প্রভাবের কিছু তথ্য দেয়া হলো (Harper and Mclanahan, 2004):

- সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারগুলো তুলনামূলকভাবে মহিলা ও কিশোর বয়সী শিশুদের জন্য কম কল্যাণকর।
- সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে বেড়ে ওঠা মেয়ে সন্তানদের কিশোরী বয়সে যৌন তৎপরতায় জড়িত হবার সম্ভাবনা অধিক।

- পিতার অবর্তমানে বেড়ে ওঠা শিশু ও কিশোররা শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির অধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- ভগ্ন পরিবার থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে।
- কোনো কোনো সম্প্রদায়ে, সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অধিক অপরাধ প্রবণ হয়।
- সিঙ্গেল প্যারেন্ট শিশুরা অবহেলা ও অবমাননার ঝুঁকিতে বেশি থাকে এবং পরিশেষে তাদের জেলে যাবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

এ গ্রন্থে বর্ণিত ভালো প্যারেন্টিং-এর নীতিগুলো সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের ক্ষেত্রে ততটাই প্রযোজ্য, ঠিক যতটা প্রযোজ্য দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারে। সব বাবা-মাই একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন:

১. মানসিক দৃঢ়তা প্রদর্শন: বাবা-মাকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখলে শিশুর জগৎ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। যেহেতু সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে শিশুর দ্বিতীয় প্যারেন্ট অবলম্বন হিসেবে থাকে না সেহেতু সর্বদা সিঙ্গেল প্যারেন্টকে পরিস্থিতি বিবেচনা করে চলতে হয় এবং স্থিতিশীল ও দৃঢ় থাকতে হয়। তাদের আবেগ ও মানসিকতা হতে হবে মজবুত ও সুস্থির।

২. দ্বৈত ভূমিকা পালন: সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে অনুপস্থিত প্যারেন্টের ভূমিকা পূর্ণ করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গেল বাবাকে মানসিক ও নৈতিকভাবে শিশুদের নিকটবর্তী ও স্নেহশীল হতে হয় (যা মূলত মায়ের ভূমিকা)। এ বিষয়ক কিছু Self-help গ্রন্থ আছে যা বাবা-মাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

৩. আত্মসম্মানবোধ জোরদার করা: সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের শিশুদের মানসিকতা ও আত্মসম্মানবোধ এমনভাবে জোরদার করা জরুরি যাতে তারা নিজেদের নিয়ে লজ্জিত বোধ না করে। তাদের মধ্যে এমন বিশ্বাস জোরদার করা দরকার যে তারা নিজেদেরকে দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারের শিশুদের চেয়ে ছোট মনে না করে। সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর ও সুখী পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করা সিঙ্গেল প্যারেন্টদের কর্তব্য। এ শিশুদেরকে রসুল মুহাম্মদ সা.-এর ছোটোবেলার গল্প শোনান যে, তিনি তাঁর শৈশবে পিতা-মাতা দুজনকেই হারিয়ে ছিলেন। খেয়াল রাখুন, শিশুরা দ্বিতীয় প্যারেন্ট-এর অভাব বোধ করছে বলে সেই শুন্যতা পূরণ করতে গিয়ে তাদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে ফেলবেন না। তারা যাতে আপনার অপরাধবোধ বা দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে নষ্ট হয়ে না যায় সে ব্যাপারে সাবধান হন।

৪. নিরবচ্ছিন্ন ভাবের আদান-প্রদান: প্যারেন্ট ও শিশুদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি। প্যারেন্ট ও শিশুদের জীবন অনেক সহজ-সুন্দর হয় যেখানে একটি ভালোবাসাপূর্ণ, স্নেহপরায়ণ সম্পর্ক ও অনুকূল সহায়ক পারিবারিক পরিবেশ বজায় থাকে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে যে, সিঙ্গেল প্যারেন্ট হবার অর্থ এটি নয় যে, কোনো সহযোগিতা না নিয়ে একা একাই শিশুদের লালন-পালন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এটি দ্বৈত প্যারেন্টিং-এর মতো আনন্দদায়ক ও সফল অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হতে পারে। এমনকি তার চেয়ে ভালোও হতে পারে। কেননা অনেক দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারেই উচ্চমাত্রায় বৈবাহিক দ্বন্দ্ব ও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে।

সফল সিঙ্গেল-প্যারেন্ট হবার নীতিসমূহ

সফলভাবে সন্তান লালন-পালনে এবং সন্তানের সাথে দ্বন্দ্ব কমাতে নিচের পরামর্শগুলো সিঙ্গেল প্যারেন্টরা অনুসরণ করতে পারেন।

- বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। ভালো বন্ধু-বান্ধব তৈরি করে তাদের দাওয়াত দিন এবং তাদের সন্তানদের সাথে আপনার সন্তানদের মেলামেশা ও আহারের সুযোগ করে দিন। অন্যান্য সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারকে জানুন। মনে রাখবেন, যদিও আপনি সিঙ্গেল প্যারেন্ট কিন্তু আপনি একা নন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে আপনি পেতে পারেন মানসিক সমর্থন, সাহচর্য, সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সাহায্য, দুঃখ-কষ্ট বলার বিশ্বস্ত জায়গা আর একটি দরদী মন। সচেতনতার সঙ্গে বন্ধু নির্বাচন করুন, বাছাই করুন- যত্নবান, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসী লোক যিনি প্রয়োজনের সময় আপনার পাশে থাকবেন। আপনার যদি বর্ধিত পরিবার থাকে তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলুন এবং নিয়মিত একে অন্যের সাথে দেখা করুন। আপনার প্যারেন্টিং-এর চাপ (বর্ধিত) পরিবারের অন্যান্যদের সাথে ভাগ করে নিতে সংকোচ করবেন না এবং যখনই প্রয়োজন পড়বে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন।
- যখনই সুযোগ হয় আপনার শিশুদের নিয়ে বেড়াতে যাবার ও আনন্দঘন দিন কাটাবার পরিকল্পনা করুন। সুন্দর মুহূর্ত ও ঘটনাগুলো স্মরণীয় করে রাখবার জন্য স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করুন, যাতে পরবর্তীতে সেটি উপভোগ করতে পারেন।
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সন্তানদের যুক্ত করুন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। এটি

তাদের আত্মসম্মান বাড়াবে এবং তারা নিজেদেরকে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভাবতে শিখবে। বিশেষ করে সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারগুলোতে শিশুদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রতিনিয়ত প্রয়োজন। টিম হিসেবে কাজ করলে, সংসারের কাজের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলে আপনার ওপরে চাপ অনেকটা কমে আসবে।

- আপনার ক্রোধ ও ব্যক্তিগত উদ্বেগের প্রভাব শিশুদের ওপর যাতে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন। শিশুদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনি উপলব্ধি করবেন যে, শিশুরা সাধারণত শঙ্কিত থাকে। তারা সবসময় একটি মানসিক আশঙ্কার মধ্যে থাকে, যদি তাদের বাবা-মায়ের কিছু হয়ে যায় তবে তারা এ পৃথিবীতে একা হয়ে পড়বে। আপনার সব প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করুন এবং আপনার পক্ষে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করার পর বাকি সবকিছু তাঁর হাতে ছেড়ে দিন।
- যদি আপনি তালাক নেন তবে ছেলে-মেয়েদের কোনো এক পক্ষ নিতে বাধ্য করবেন না। শিশুদের 'ভালো প্যারেন্ট' এবং 'মন্দ প্যারেন্ট' এ দুপক্ষ থেকে বাছাই করে নিতে বলবেন না। বাবা-মা উভয়ের প্রতিই শিশুদের থাকে অপরিমেয় অনুরাগ এবং একজনের পক্ষ নিয়ে অন্যকে সরিয়ে দেয়া তাদের জন্য কষ্টকর।
- সর্বোপরি, ইতিবাচক এবং আল্লাহ নির্ভর হোন। ভালো প্যারেন্টিং দক্ষতাসম্পন্ন সিঙ্গেল প্যারেন্টও সফলভাবে তার সন্তান লালন-পালন করতে পারে। একদল ভালো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাহায্যে একটি সহায়ক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন। সন্তানদেরকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলাটা প্যারেন্ট তথা অভিভাবকদের সংখ্যার ওপর নয় বরং তাদের গুণ, যোগ্যতা ও পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে।

নবি-রসুলগণের ওপর একক মাতৃত্বের প্রভাব

ইসমাইল আ., মুসা আ., ইসা আ. এবং মুহাম্মদ সা.

মানবজাতির কাছে পাঠানো কয়েকজন মহান নবি সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। নিচে আমরা চারজন নবির মায়েদের গল্প সংক্ষেপে বর্ণনা করব। এসব বিখ্যাত মায়েদের শক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সকল বাবা-মায়ের জন্য প্রেরণাদায়ক।

ইসমাইল আ.

কুরআনে ইসমাঈল আ.-এর কাহিনী:

> অতঃপর যখন পুত্র তার সাথে কাজকর্ম তথা চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন সে (ইবরাহিম আ.) বলল, হে পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি জবেহ করছি; এখন তোমার কী অভিমত"? সে (ছেলে) বলল, "হে আমার আব্বা! আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবে পাবেন। (সুরা সফফাত, ৩৭: ১০২)

আমরা জানি যে, নবি ইবরাহিম আ. তার বড় পুত্র ইসমাঈল আ.-এর সাথে খুব বেশি সময় বসবাস করার সুযোগ পাননি। কারণ তিনি ফিলিস্তিন, মিশর ও ইরাকের জনগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন। মূলত ইসমাইল আ.-এর মাতা হাজেরা তাকে লালন-পালন করেন মক্কার এক উপত্যকায়। মাতা হাজেরাই ইসমাঈল আ.-কে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আত্মবিশ্বাস শিক্ষা দেন।

মুসা: আ.

> এবং আমি ইশারা করলাম মুসা আ.-এর মাকে; স্তন্য দান করো, অতঃপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে নদীতে ভাসিয়ে দেবে এবং কোনো ভয় বা দুঃখ করবে না, তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব। (সুরা আল-কাসাস, ২৮: ৭)

মুসা আ.-এর মা সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওপর এতটাই ভরসা করেছিলেন যে, শিশু মুসা আ.-কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরাউনের গৃহে তিনিই মুসা আ.-এর লালন-পালনের এবং দুধদানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন-এর কারণ শিশু মুসা অন্যান্য দুধ মাতাদের কাছ থেকে দুধ পান করছিলেন না। কত বড় ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছিলেন! কত বড় নিদর্শন তিনি রেখেছিলেন! তিনি নিজ শিশুর জীবনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি এভাবে অবিচল আস্থা স্থাপন করে পরবর্তী একজন সফল নবির জন্য নেতৃত্বের গুণাবলীর এক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

ইসা আ.

> অতঃপর এক ফেরেশতা মারিয়ামকে বলল- হে মারিয়াম! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান

করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন...। (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৪২)

ইসা আ. ছিলেন পিতৃহীন সন্তান, বেড়ে ওঠেন কুমারী মাতা মারিয়ামের তত্ত্বাবধানে। মারিয়াম ছিলেন সিঙ্গেল মা যিনি ভালোবাসা, ত্যাগ এবং সততার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মান প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআনের একটি সম্পূর্ণ সুরা তার নামে অবতীর্ণ হয়েছে যেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্রতম এবং সর্বোচ্চ ইমানদার নারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

রসুল মুহাম্মদ সা.

মুহাম্মদ সা. জন্মগ্রহণ করেন একজন এতিম শিশু হিসেবে। তার মা আমিনা বিনতে ওয়াহহাব ছিলেন সিঙ্গেল প্যারেন্ট। তিনি ছয় বছর পর্যন্ত তাকে লালন-পালন করেন, যে সময়ে তাঁর (রসুল সা.-এর) অনুকরণীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তি গড়ে ওঠে। মায়ের মাধ্যমে দয়া, ভালোবাসা, সততা, সৃষ্টিশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসের গুণাবলিসমূহ তাঁর অন্তরে মূল বিস্তার করে।

মাতৃত্বের প্রভাব অপরিমেয়!

সন্তান লালন-পালনে মায়ের অমূল্য অবদানের কৃতিত্ব কতটুকুইবা আমরা স্বীকার করতে পারি?

- শিশু পৃথিবীতে তার মাকে চিনেই জন্মগ্রহণ করে, এরপর মা তাকে চেনায় এটি তার বাবা।
- ইমাম আহমদ হতে বর্ণিত- হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে এক লোক এসে বলল- "আমি পিছনে আমার ক্রন্দনরত বাবা-মাকে রেখে আপনার কাছে এসেছি হিজরতের জন্য"। নবি মুহাম্মদ সা. বললেন- "ফিরে যাও এবং যেভাবে তুমি তোমার বাবা-মাকে কাঁদিয়েছো, সেভাবেই তাদেরকে হাসাও"।
- বর্ণিত আছে যে, এক মুসলমান ব্যক্তি তার মায়ের জানাযার সময় কাঁদছিলো আর বলছিল- "আমি কাঁদব না কেন, যেখানে জান্নাতে যাওয়ার একটি দরজা আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে"?

একজন প্যারেন্ট কি অন্যজনের বিকল্প হতে পারে?

একজন মা কখনো বাবার সম্পূর্ণ বিকল্প হতে পারেন না এবং একজন বাবাও পারেন না মায়ের বিকল্প হতে। যে শিশুরা বাবা-মা উভয়ের সান্নিধ্যে নিরাপদভাবে বেড়ে ওঠে, তারা সর্বোত্তম সাফল্য লাভ করে। মায়ের

কাছ থেকে তারা পায় অসীম ভালোবাসা, কোমল স্নেহ, মাতৃদুগ্ধ, অসীম সহনশীলতা আর ধৈর্য। অপরদিকে বাবা দেন শক্তি, দায়িত্বশীলতা, ভরাট কণ্ঠ, উচ্চ আওয়াজ, ভিন্ন গন্ধ আর অমসৃণ গালের খোঁচা যেগুলো সবই শিশুর জন্য জরুরি উদ্দীপক। তবে সাধারণত শিশুর জন্য বাবাকে হারানোর চেয়ে মাকে হারানো অধিক দুঃসহ হয়। মা শিশুকে নিরাপত্তা ও ভালোবাসা দিতে পারেন, তার চিন্তা ও পরিকল্পনাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুকে ঘিরে তৈরি হয়। পুরোদস্তুর গৃহিণীরা শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন থাকেন এবং সবদিক থেকেই তারা শিশুদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ থাকেন। তার নিত্য কর্মসূচির পুরোভাগে থাকে সন্তানরা। শিশুকে ভালোবাসা ও শান্তির জোয়ারে ভাসিয়ে তাদের জীবনকে সফল করে তোলার মতো প্রত্যয় ও সামর্থ্য তাদের থাকে (George Tremblay and Allen Israel, 1998)।

একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, ছেলেদের জন্য মায়ের তুলনায় বাবার প্রয়োজন বেশি আর মেয়েদের বাবার চেয়ে মায়ের প্রয়োজন বেশি। প্রকৃতপক্ষে, একজন বাবা মেয়ের কাছে ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ যতখানি তার ছেলের কাছে, তবে এ প্রয়োজনের ধরন খানিকটা ভিন্ন। একইভাবে একজন মা তার ছেলের বেড়ে ওঠার জন্য জরুরি যেমনি জরুরি মেয়ের জন্য। বাবা মেয়েদের দেন শক্তি, অবলম্বন এবং নিরাপত্তার উপলব্ধি। একটি মেয়ের সামনে একজন বাবা প্রয়োজন, এতে করে সে জীবনে সফলভাবে পুরুষদের সাথে চলতে পারে। অন্যথায় পুরুষরা তার কাছে হতে পারে দুর্বোধ্য, ভীতিপ্রদ অথবা অতীব মোহনীয়।

এবার প্রশ্ন হলো- একটি পিতৃহীন বালকের জন্য তার মা কি বাবার ভূমিকা পালন করতে পারে? জবাব হলো - না, পারে না এবং এটি জরুরিও নয়। শিশুদের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গঠিত যে, যদি তারা তাদের বাবা-মাকে কখনো দেখার কথা মনে নাও করতে পারে, তবুও তারা তাদের বাবা-মা কেমন হতে পারে সেটি সম্পূর্ণভাবে কল্পনা করে নিতে সক্ষম। এমনকি খুঁটি-নাটি বিষয়গুলোও নিখুঁত এ কল্পনা থেকে বাদ যায় না। শিশুরা অন্য লোকজনের ব্যক্তিত্বের খণ্ড খণ্ড টুকরা জোড়া দিয়ে এক আদর্শ প্যারেন্ট-এর আদল তৈরি করে নেয়। একজন পিতৃহীন ছেলের জন্য তার মা যা করতে পারেন তা হলো তাকে দাদা, চাচা ও চাচাতো ভাইবোনদের সাথে সময় কাটাবার সুযোগ করে দিতে পারেন, যেন সে তার পিতার একটি আদল নিজের মনে তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। এছাড়াও

সে তার ছেলেকে কোনো বিশ্বস্ত দরদী

পুরুষ স্কুল শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক বা ইমামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন একটি নিরাপদ পরিবেশে। তারই তত্ত্বাবধানে ও পর্যবেক্ষণে তার ছেলের সামনে এসব লোক ভালো পুরুষোচিত মডেল উপস্থাপন করতে পারে (মনে রাখতে হবে কাউকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে পর্যবেক্ষণহীন পরিবেশে শিশুকে তার সঙ্গে ছেড়ে দেয়া নিরাপদ নয়)।

কোনটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

আজ থেকে চল্লিশ বছর পর এটি কোনো বিষয়ই হবে না যে, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কী পরিমাণ টাকা ছিলো, কী ধরনের বাড়িতে আপনি থাকতেন অথবা কী রকম প্রাইভেট গাড়ি আপনি চালাতেন। যা সত্যিকার গুরুত্ব পাবে তা হলো আপনি আপনার সন্তান ও নাতি-নাতনির জীবনে কতখানি অবদান রেখে যেতে পেরেছেন।

ইসলাম ও তালাক প্রসঙ্গ

সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবার বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হলো তালাকের হার বৃদ্ধি। কিছু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তালাক নিষিদ্ধ (১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলে তালাক বে আইনি ছিল, হিন্দু ধর্মে তালাক নিষিদ্ধ ছিল এবং ফিলিপাইনে ক্যাথলিকদের জন্য তালাক নিষিদ্ধ)। ইসলাম তালাককে নিরুৎসাহিত করে, তা সত্ত্বেও অনুমোদন দেয় (নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে)। তালাকের পূর্বে মুসলিম দম্পতিকে বাধ্যতামূলক পারিবারিক মধ্যস্থতার ও সালিশের মধ্য দিয়ে যেতে

হয়। ইসলাম দাবি করে বিবাহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আত্মীয়-স্বজন জোর প্রচেষ্টা চালাবে। বিশেষ করে যদি তা শিশুদের প্রভাবিত করে। হযরত মুহাম্মদ সা. বলেন, "আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে তালাক সবচেয়ে অপছন্দনীয় আইনসিদ্ধ আচরণ" (ইবন মাজাহ)। তথাপি বলা হয়, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম এটি স্বীকার করে যে, বিবাহ অকার্যকর হয়। এটি দুঃখজনক কিন্তু বাস্তব।

বাবা-মাকে অবশ্যই তাদের বিবাহ সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এরপরও যখন তালাক সম্পন্ন হয় এবং সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়ে, তখন বাবা-মায়ের উচিত শিশুদেরকে সততার সঙ্গে এ সম্পর্কে অবহিত করা-

- তালাক ও পুনঃবিবাহের বিষয় সম্পর্কে লুকোচুরি না করে বা নতুন গল্প না বানিয়ে সন্তানদের খুব সাবধানে প্রকৃত সত্যটি অবহিত করতে হবে। বিষয়টি সন্তানদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে- কেন তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে; সন্তানদের বোঝাতে হবে। এতে তাদের কোনো দোষ নেই এবং তারা আলাদা হলেও তারা সন্তানদের ভালোবাসে। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া হঠাৎ একজন প্যারেন্ট-এর উধাও হয়ে যাওয়া কখনোই উচিত নয়। এটি শিশুদের ভিতরে তিক্ততা তৈরি করে। প্যারেন্ট হয়তো মনে করতে পারেন যে, এভাবে তিনি তার সন্তানের কষ্ট কমাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুর মনে হয়- প্যারেন্ট তাকে একটুও ভালোবাসে না। আর সেজন্যই সে ব্যাখ্যা দেয়া তো দূরের কথা, বিদায় নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না।
- এ সময় শিশুদের বাধ্য করবেন না কোনো একজনকে সমর্থন করতে কিংবা একজনের পক্ষ অবলম্বন করতে।

যখন সৎ বাবা-মা এবং সৎ পরিবার জড়িত থাকে তখন শিশুদেরকে তাদের সাথে রক্ত সম্পর্কের ন্যায় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য জোর-জবরদস্তি করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বরং এ ধরনের জোর-জবরদস্তির দরুন সম্পর্ক উন্নয়নের পথে নেতিবাচক উত্তেজনা, ঈর্ষা ও শত্রুতা তৈরি হতে পারে। একজন শিশুর জন্য এটি তুলনামূলক ভালো যে, সৎ প্যারেন্ট হিসেবে নয় বরং "আমার মায়ের নতুন স্বামী" অথবা "বাবার নতুন স্ত্রী" হিসেবে নতুন মানুষটিকে মেনে নেয়া এবং পরবর্তীতে তাকে নতুন প্যারেন্ট বা অভিভাবকের স্থান দিতে চেষ্টা করা।

শিশুদের ওপর তালাকের প্রভাব

তালাকের অব্যবহিত পরে শিশুসহ পরিবারের আয় ২১% কমে যায়। আটত্রিশ শতাংশ তালাকপ্রাপ্ত নারী (শিশুসহ) দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করে। এ সংখ্যাটি সন্তানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৭%। তালাকপ্রাপ্তদের সন্তানদের স্কুল শেষ না করা, বিয়ে বহির্ভূত সন্তান লাভ ও অসুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

Seltzer,1989

প্যারেন্ট এবং প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রীর উচিত পরিবারের সব সদস্যের সাথে দয়ার্দ্র, সম্মানসূচক এবং সহনশীল আচরণ করা। কুরআন আমাদের উপদেশ দেয় তালাকের ক্ষেত্রে সঠিক আচরণ করতে:

> তালাক দুবার অনুমোদনযোগ্য। তারপর উভয়পক্ষ হয় সম্মান-মর্যাদার সাথে একত্রে থাকবে অথবা সদয় মনোভাব নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। তোমাদের জন্য এটি কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সঙ্গত নয় যে, তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে। তবে আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতরে থেকে স্বামী-স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না- এমন আশঙ্কা যদি দেখা যায় (তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উত্তম এমন অবস্থায়) যদি তোমাদের ভয় হয় যে, এরা আল্লাহ তা'আলার বিধানের গণ্ডির ভিতর থাকতে পারবে না; তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয়), তাহলে তাদের উভয়ের ওপর এটি কোনো দূষণীয় (বিষয়) হবে না, (জেনে রাখো) এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনো অতিক্রম করো না। আর যারা আল্লাহ তা'আলার দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারা হচ্ছে সুস্পষ্ট জালিম। (সুরা বাকারা, ২: ২২৯)

তালাকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সহনশীলতা প্রয়োজন। কোনো কোনো শিশু হয়তো কখনোই সৎ বাবা-মাকে মেনে নিতে পারবে না। এসব ক্ষেত্রে করণীয় হলো শান্ত ও দয়ার্দ্র থাকা এবং সু-সময়ের অপেক্ষা করা। একসময় ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে নিজ নিজ সংসারে চলে যাবে গৃহত্যাগ করে।

আবার অনেক সময় দীর্ঘ দিনের সমস্যার পরে যখন বিয়ে ভেঙ্গে যায় তখন শিশুরা অশান্তি থেকে কিছুটা মুক্তি লাভ করে। ফলে সন্তানদের মধ্যে এক ধরনের

মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যদিও বাবার অনুপস্থিতিতে দ্বন্দ্ব কম হওয়ায় তারা কিছুটা শান্তি অনুভব করে, আবার একইসাথে বাবার জন্য ভালোবাসার টানে তার অভাব বোধও করে। শিশুরা মনে মনে আক্ষেপ করতে থাকে যদি সবকিছু ঠিক হয়ে যেত। একজন যত্নবান সৎ প্যারেন্ট একটি সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধন তৈরি করতে পারেন যা সারাজীবন বজায় থাকবে। একজন বিজ্ঞ সৎ অভিভাবক সেই, যে তার সৎ সন্তানকে বলে- 'আমি তোমার বাবা বা মা নই, কিন্তু তোমার প্যারেন্টের স্বামী বা স্ত্রী এবং তুমি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ'।

কিশোর বয়সের সন্তান নিয়ে সিঙ্গেল প্যারেন্টরা ভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এ বয়সী সন্তানটি যাতে অতিরিক্ত নির্ভরশীল ও দায়িত্বহীন হয়ে না পড়ে সেই দিকে বাবা-মাকে যেমন সাবধান থাকতে হবে, আবার অপরদিকে তার ওপর তার অনুপস্থিত বাবা বা মায়ের সব দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, ছেলেটি 'গৃহকর্তা' নয় বা মেয়েটি 'গৃহকর্ত্রী' নয়। তাছাড়া সিঙ্গেল প্যারেন্টদের কিশোর ছেলে-মেয়েদের যৌন, শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। কিশোর বয়সটি অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সময়। অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সাথে স্কুলের বাড়তি কাজের চাপের সাথেও তাদের মানিয়ে নিতে হয়। তাই তাকে ঘরের চাহিদা মেটাতে সবসময় আটকে না রেখে বাড়ির বাইরে তার নিজস্ব জগতে সব ধরনের নৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। প্যারেন্ট যতটাই একা হোন না কেন, কিশোর সন্তানের ক্ষেত্রে তাকে স্বার্থপর না হয়ে ছাড় দিতেই হবে।

বিয়ে বহির্ভূত সিঙ্গেল প্যারেন্টদের সন্তানরা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের সন্তানদের মতো নয়। প্রধান পার্থক্য সূচিত হয় বাবার প্রতি অধিকার ও সম্পর্কের ধারণায়। বিবাহিত পরিবারের একজন বাবা ইন্তেকাল করলেও সন্তানরা তাদের বাবা সম্পর্কে এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি লাভ করে; কারণ তারা তাদের বাবাকে সামাজিক ও মানসিকভাবে তাদের নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। সন্তানদের এ ধরনের মানসিক অবস্থার ফলে মায়ের পক্ষে সহজ হয় তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রদান করতে। আর এভাবেই তিনি সন্তানদের একটি অনুকূল পরিবেশ দিতে পারেন ও সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন। যার মাধ্যমে তারা শুধু উৎকর্ষ লাভই নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত পরিবারের সন্তানদেরকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। তার নিরন্তর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সন্তানদের 'জয়ী' হিসেবে তৈরি করতে পারেন, যারা বাধা ও বিপদকে অতিক্রম করতে জানে। সন্তানদের সামনে বাধা পেরিয়ে যাবার চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি তাদের সফল হওয়ার মন্ত্র শেখাতে পারেন। এ মায়েরাই পারেন সন্তানদের নিজেদেরকে প্রমাণ করার সুযোগ দিতে ও তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে।

তালাকপ্রাপ্ত অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ

- সন্তানদেরকে তাদের অন্য প্যারেন্ট সম্পর্কে খারাপ ধারণা দেবেন না।
- সন্তানদের সঙ্গে যাতে অন্য প্যারেন্ট ও তার দিকের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকে সে ব্যবস্থা করুন।
- সন্তানরা যাতে অনুভব করে যে, উভয় প্যারেন্টই তাদের ভালোবাসে সেটি নিশ্চিত করুন।
- নিশ্চিত করুন যে, আপনাদের তালাক সন্তানদের সঙ্গে উভয় প্যারেন্ট-এর সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব

ইসলাম পরিবার সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সম্মানিত জীবের মর্যাদা দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের (ইসতিখলাফ) দায়িত্বের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। এটিই হলো অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের শৈশবকালকে দীর্ঘতর করার পেছনের হিকমাহ। সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত 'পরিবার শিক্ষালয়ের' প্রাথমিক ভিত্তি হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক। যে সম্পর্কটি 'ব্যবসায়িক চুক্তি' বা 'আইনি অধিকার- দায়িত্ব' সর্বস্ব হওয়া উচিত না (যদিও পারিবারিক আইন ন্যূনতম নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ)। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত মাওয়াদ্দাহ (করুণা) এবং রাহমাহ (দয়া)। এ ভিত্তি ব্যতিরেকে বাবা-মায়ের মূল দুটি আকাঙ্ক্ষা (যা সুরা আল ফুরকানের ২৫: ৭৪ আয়াতে বর্ণিত) তথা সুখী পরিবার এবং সফল ধার্মিক সন্তান অর্জন- কখনোই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারগুলোতেও করুণা ও দয়ার অনুশীলন থাকতে হবে; বাবা-মাকে সন্তানদের প্রতি করুণাসম্পন্ন ও দয়ালু হতে হবে।

> এবং যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব আমাদের স্বামী/স্ত্রীদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও এবং তাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম করো।
>
> (সুরা আল ফুরকান, ২৫: ৭৪)

মানুষের পূর্ণ মানসিক বিকাশের জন্য পরিবার প্রথা অপরিহার্য। সৃষ্টিকর্তা আমাদের দৈহিক এবং অ-দৈহিক সবদিক থেকেই সর্বোত্তম আকৃতি দান করেছেন। আমাদের আকার, উচ্চতা, বর্ণ, চলাফেরা, বাহ্যিকরূপ এবং আমাদের মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও মানসিক গঠন- সবকিছু তিনি করেছেন সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ। এমনকি আমাদের জন্য গোত্র, সমাজ এবং জাতি তিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ রহমতস্বরূপ।

> নিশ্চয় আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম (শ্রেষ্ঠ) কাঠামোতে।
>
> (সুরা আততীন, ৯৫: ৪)

আমাদের জীবন প্ররিক্রমায় বিস্ময়করভাবে কয়েকটি পর্যায় আমরা ধাপে ধাপে অতিক্রম করি: প্রথমে ক্ষীণ ও দুর্বল শৈশব, এরপর ক্রমবিকাশ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছানো এবং পুনরায় দুর্বল, শক্তিহীন বার্ধক্যে ফিরে আসা (শক্তি, জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপের ফলশ্রুতিতে)। জীবনের পথে চলতে চলতে বাবা-মায়েরা মানসিকভাবে আরো বিকশিত হতে থাকেন। তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়তে থাকে। ফলে তারা নিজেদের সন্তান, নাতি-নাতনি এবং বৃহত্তর পরিসরে আরো বেশি অবদান রাখতে পারেন। পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সুস্থতা, অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিক সম্পর্কের যে মানসিকতার প্রয়োজন সেটি অপূর্ণ থেকে যায়, যদি একজন ব্যক্তি স্বামী বা স্ত্রীতে পরিণত না হয়। একমাত্র বিবাহের বন্ধনের মাধ্যমেই পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি মানসিক নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে পারে। কুরআন এ সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা করেছে:

> তারা (স্ত্রী) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামী) তাদের পোশাক (সুরা বাকারা, ২:১৮৭)।

বিবাহের পরবর্তী ধাপে পূর্ণতার আরেকটি উপাদানের দিগন্ত উন্মোচিত হয়: সেটি হলো সন্তান লাভের আকাঙ্খা এবং একটি পরিবারের সূচনা করা। এ পর্যায়ে চারটি সম্ভাবনা তৈরি হয়: দম্পতি হয় সন্তানহীন হবে কিংবা তারা কেবল কন্যা সন্তান অথবা কেবল পুত্র সন্তান লাভ করবে নতুবা পুত্র ও কন্যা উভয়ই পাবে। এ চারটি পরিণতির প্রতিটিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব রয়েছে দম্পতি ও সন্তানদের ওপরে।

> তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান। যাকে ইচ্ছা পুত্র এবং কন্যা উভয়ই দেন এবং যাকে ইচ্ছা কোনোটিই দেন না। তিনি সবকিছু জানেন এবং সবকিছু করতে সক্ষম।
>
> (সুরা আশ শূরা, ৪২: ৪৯-৫০)

বিবাহিত জীবনের আর একটু সামনে এগিয়ে সন্তানদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা, সন্তানদের বাবা-মা হতে দেখা এবং নাতি-নাতনি লাভের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরের ধারাবাহিক অগ্রসরতা দেখার মধ্য দিয়ে বিবাহিত দম্পতি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিদান লাভ করতে থাকে।

আমরা জানি, যে পরিবারে কেবলমাত্র একটি সন্তান রয়েছে (পুত্র অথবা কন্যা) তাদের অবস্থা একাধিক সন্তানসহ পরিবারের থেকে অনেক ভিন্ন হয়। একক সন্তান হিসেবে শিশুদের অনুভূতি আর ভাই-বোন থাকার অনুভূতি সমান হয় না। একইভাবে যে শিশুদের মামা, খালা, ফুফা-ফুফু, দাদা-দাদি বা নানা-নানি নেই তাদের অনুভূতিও ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি বর্ধিত পরিবারে শিশুদের মন-মানসিকতা সমৃদ্ধ হয় এবং পরিবার আরো বিস্তৃত হলে (বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে) মানসিক বিকাশের বিষয়টি হয় আরো বেশি সমৃদ্ধশালী। শিশুদের মনস্তাত্তিক সমৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয় তখন যখন তারা অনেকগুলো সুস্থ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যায়। এটি একজন নারীর ক্ষেত্রে ঘটে তার বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার মাধ্যমে, যেমনঃ মেয়ে, বোন, স্ত্রী, মা, খালা/ফুফু, অতঃপর একজন নানি বা দাদি হিসেবে। অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে ছেলে, ভাই, স্বামী, বাবা, মামা/চাচা এবং একজন নানা/দাদা হিসেবে ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে।

পরিবার চিরকালের জন্য পরিবার!

“আজ যদি আমরা মারা যাই- তাহলে যে প্রতিষ্ঠানে আমরা চাকরি করি সেই প্রতিষ্ঠান কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জায়গায় অন্যকে বসাবে। অথচ পরিবারকে ছেড়ে চলে গেলে পরিবার সারাজীবন আমাদের অনুপস্থিতি অনুভব করবে। কতো নির্বোধ আমরা! পরিবারের চেয়ে আমরা আমাদের কর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য নিজেকে বেশি উজাড় করে দেই।”

- ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

F A M I L Y

F Father
A and
M Mother
I I
L Love
Y You

কুরআনের ভাষায় পরিবারের উদ্দেশ্য

সুষ্ঠু পারিবারিক ঐতিহ্যগুলো একটি শিশুর মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন করে যা অনেক সময় স্কুল থেকে পাওয়া সম্ভব হয় না।

পারিবারিক জীবন নির্ভর করে পরিবারের মূল উদ্দেশ্য কী তা সঠিকভাবে নির্ধারণের ওপর। পরিবারের উদ্দেশ্য শুধু বংশধারা রক্ষা নয় বরং এর থেকে অনেক বড় কিছু। কেবল মানব সভ্যতাকে বিলুপ্তি থেকে বাঁচানোর জন্যই পরিবার সন্তান জন্ম দেয় না। পরিবারের স্বার্থে পারিবারকে টিকিয়ে রাখা বা নিজস্ব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাকে ছাড়িয়ে পরিবারের উদ্দেশ্য আরো অনেক গভীরে প্রোথিত। কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে -

> হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া পয়দা করেছেন, এরপর এ জোড়া থেকে বহু নর-নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা ভয় করো আল্লাহ তা'আলাকে, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করো এবং বিভিন্ন আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হও। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন। (সুরা আন নিসা, ৪: ১)

মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি মাত্র সত্তা বা নফস থেকে, ওই সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জোড়া এবং ওই সত্তা ও তার জোড়া থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বহু সংখ্যক নর-নারী। এ আয়াতটিতে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে, আবার বহুবচনের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতটি হলো-

> আল্লাহ তাআলাই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এ যুগল থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি তোমাদের উত্তম রিযিক দান করেছেন। তারপরও কি এরা বাতিলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (সুরা আন নাহল, ১৬: ৭২)

মানুষকে পৃথিবীতে এক বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে নিচের আয়াতটিতে:

> স্মরণ করো, তোমার মালিক যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে চাই; তারা বললো, আপনি কি

> সেখানে এমন কাউকে পাঠাতে চান যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসাসহ আপনার তাসবিহ পড়ছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। (সুরা বাকারা, ২: ৩০)

এ আয়াতটি পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে: তত্ত্বাবধায়ক ও প্রতিনিধি (খলিফা)। প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব হলো বিশ্বজাহানের উন্নয়ন (ইমরান) ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা (আদল)। কুরআন আরো দাবি করে যে, জীবন একটি পরীক্ষাস্বরূপ এবং আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর ইবাদত ও আদেশ পালন করার জন্য।

> আমি জ্বিন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে। (সুরা যারিয়াত, ৫১: ৫৬)

কাজেই বোঝা যায় যে, একটি পরিবারের মূল লক্ষ্য হলো: আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব, প্রতিনিধিত্ব, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়, আত্মীয়তার বন্ধন এবং পরস্পরের অধিকার রক্ষা করা।

নিচের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যেখানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে:

> তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এও যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য। এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সুরা আর রূম, ৩০: ২১)

যদিও পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসাকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তবে এটিই জীবনের সর্বোচ্চ ভালোবাসা নয়। মহান আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে কয়েকটি হলো সহানুভূতি, ন্যায়বিচার ও শান্তি। ইসলামে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসুল সা.-এর প্রতি ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে।

বলো, তোমাদের পিতা, ভাই, পরিবার পরিজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য যার অচল হয়ে যাওয়াকে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ি-ঘর যা তোমরা কামনা করো, যদি তা তোমার আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসুল সা. ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক ভালোবাসো তাহলে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ তাআলা কখনো পাপাচারিদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(সুরা আত তওবা, ৯: ২৪)

স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসাই হলো সকল ভালোবাসার মূল ভিত্তি। স্রষ্টাকে ভালোবাসা হলো সর্বোচ্চ ভালোবাসা। এজন্যই মানুষ বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ভুল করলেও আমরা তাদেরকে ভালোবাসি। কেননা তাদের প্রতি এ ভালোবাসা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত হয়। তাছাড়া

লক্ষণীয়, মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা কতো! মানুষ তাঁর অবাধ্য হলেও তিনি অফুরন্ত নিয়ামত বর্ষণ করে থাকেন। পরিবারের অভ্যন্তরীণ ভালোবাসাকে কুরআন এভাবে ব্যাখ্যা করে:

> ...আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তা'আলাকে যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করো এবং বিভিন্ন আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হও। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন। (সুরা আন নিসা, ৪: ১)

> তোমার প্রভু আদেশ করেন, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না এবং তোমাদের বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করো। (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৩)

ভালোবাসা ও যত্নের ক্ষেত্রে পিতার পূর্বে মাতার স্থান এবং তিনিই সম্মান পাবার প্রথম অধিকারী। এক ব্যক্তি যখন রসুল সা.-কে প্রশ্ন করলো, কে প্রথম যত্ন ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা (আল বুখারি)।

> রহমানের বান্দারা দুটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছা রাখে- একটি সুখী পরিবার এবং সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব গঠন। তারা প্রার্থনা করে থাকে- হে আমাদের মালিক, আপনি আমাদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দিন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।
>
> (সুরা আল ফুরকান, ৭৪)

আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করা পরিবারের প্রত্যেকেরই প্রধান উদ্দেশ্য; বাবা-মা, চাচা, দাদি, সন্তান, সন্ততি, নাতি-নাতনি সবার। আর পরিবারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি। সন্তানদের ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত, বিশ্ব জাহানের উন্নয়ন (ইমরান), আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসুল সা.-এর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাকে অবজ্ঞা করলে পরিবার তার কাঙ্ক্ষিত সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। প্যারেন্টিং-এর পরিতৃপ্তি আসে সন্তানদের সৎ কর্মশীল ও পৃথিবীতে তাদের জীবনোদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করতে দেখে।

এ ধারণা আত্মস্থ করে তদনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে এবং সন্তান বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের কাছেও তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

সন্তানদের মন মগজে সততা ও উৎকর্ষতার বীজ বপনের এটিই যথার্থ উপায়। যদি সন্তান বড় হতে হতে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলেও যায়, একদিন বুকের গভীরে চাপা পড়া এ বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং যথার্থ ফল বয়ে আনবে। বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধ দানের মতোই খাঁটি বিশ্বাস তথা তাকওয়া তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এর ওপর ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে সচ্চরিত্রের ভিত। একেবারে শুরু থেকেই শিশু লালন-পালনের ব্যাপারে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ন্যায়পরায়ণতার এ ভীতিই তাদেরকে তাদের চারপাশের বাধাহীন প্রচণ্ড প্ররোচণা থেকে মুক্ত থাকার শক্তি জোগাবে। সমাজের সুরক্ষার জন্য কেবলমাত্র বাহ্যিক আইন-শৃঙ্খলা আর নজরদারির ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। বরং ভিতর থেকে আসা সন্তানের অভ্যন্তরীণ আত্মিক মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মসংযম সামাজিক নিরাপত্তার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল। বাবা-মায়ের উচিত জীবনের শুরুতেই ছেলে- মেয়েদের ঐশ্বরিক জ্ঞান ও সে অনুযায়ী বিশ্বাস, সততা ও সহানুভূতি শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা।

মুসলিম পরিবারগুলোর স্খলন

সারাবিশ্বে পারিবারিক মূল্যবোধ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তালাকের হার বেড়ে যাওয়া, সিঙ্গেল-প্যারেন্ট পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, সমকামিতা ও বিবাহ বহির্ভূত সন্তান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতির প্রভাব শিশু ও বাবা-মা সবার ওপরেই পড়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম পরিবারগুলো এসব বাহ্যিক সমস্যার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এর ওপরে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও দুর্বলতা তো রয়েছেই। অথচ মুসলিম পরিবারগুলো সফলতা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে আদর্শ হবার কথা ছিল। প্রশ্ন থেকে যায়, কেন মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব জটিল কিন্তু মূলত এর কারণ উম্মাহর সামগ্রিক অধঃপতন। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অনুপস্থিতি- এসব উপাদানগুলো একযোগে মুসলিম পরিবারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

যদিও মুসলিম উম্মাহর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ তবে এটি দূষণ ও সর্বব্যাপী অশুদ্ধ আচরণ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এ দূষণগুলো চিহ্নিত করে মূল ঐতিহ্য থেকে সাবধানতার সাথে সরিয়ে ফেলে মৌলিক

বৈশিষ্ট্যগুলো পুনঃস্থাপন করতে হবে, যা একসময় উম্মাহকে দিয়েছিলো গৌরবময় সাফল্য। শিশুদের ওপর থেকে এ দূষণের প্রভাব দূর করতে হবে, অন্যথায় তারা মৌলিক চারিত্রিক খুঁত নিয়ে ভারসাম্যহীন মানুষে পরিণত হবে।

কুরআন দাবি করে: মুসলমানরা পড়াশোনা করবে (ইক্করা), যুক্তিশীল বিচার-বিবেচনা করবে (ইয়াকিলুন), চিন্তা-ভাবনা করবে (ইয়াতাফাক্কারুন), গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে (ইয়াতাদাব্বারুন) ও হৃদয়ঙ্গম করবে (ইয়াফকাহুন)। এরপরও মুসলমানদের মধ্যে কেন উচ্চমাত্রায় অশিক্ষা বিরাজ করছে? কেন তারা আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন? বিগত কয়েক শতক ধরে মুসলমানরা পরাজিত, নিহত ও অপমানিত হয়ে আসছে। তদুপরি, ভূমি, সম্পদ ও আশা হারিয়ে তাদের ভিতর জন্ম নিয়েছে বিকৃত দর্শন, তাদের সংস্কৃতি হয়েছে দূষিত এবং দুর্বল হয়েছে আত্মপ্রত্যয়। তারা হারিয়েছে তাদের চরিত্রের মৌলিকতা; নৈতিকতা ও জনকল্যাণের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে অর্থ আর ক্ষমতাকে। অলসতা, লোভ প্রভাব বিস্তার করেছে সার্বিক নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের ওপর। মুসলিম উম্মাহ সম্মুখীন হচ্ছে দুর্নীতি, রোগ, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের।

মুসলমানরা আজ ৫৬টি দেশে বিভক্ত। যাদের বেশির ভাগই পরস্পরের সাথে লড়াই ও ঝগড়ায় নিয়োজিত। তারা উৎপাদন করে কম কিন্তু ব্যয় করে বেশি; কেবল খাওয়া আর ভোগ করার জন্য তাদের বেঁচে থাকা; গঠন ও উন্নয়নের জন্য নয়। কয়েক শতকের অধঃপতন নষ্ট করেছে তাদের চরিত্র; ধ্বংস করেছে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি; দূষিত করেছে তাদের সংস্কৃতি এবং বিকাশ ঘটিয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার। সেই সাথে আমদানীকৃত ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছে। নতুন প্রজন্ম নিজেদের ওপর, নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর, নিজেদের পূর্বপুরুষ ও ইতিহাসের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছে। শিশুরা নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে, যা তাদের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা, গৌরব ও আত্মসচেতনতাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তারা মানসিকভাবে আরো বেশি পরাধীন হয়ে পড়েছে; দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে পরিবারে, এরপরে সমাজে ও সর্বশেষে বৃহত্তর পরিসরে একতা ও সম্প্রীতি ভেঙ্গে পড়েছে।

মুসলিমরা অন্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

এর হাত ধরে এসেছে প্রদর্শনের মানসিকতা (তবাররুজ), অশ্লীল যৌন কর্ম এবং ধর্মীয় দায়িত্বে অবহেলা। যা বয়ে এনেছে সাংঘর্ষিক আচরণ, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং এমন এক পরিবার যা না ইসলামিক না আধুনিক।

বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও শারীরিক ভোগের পিছনে অন্ধভাবে ছুটবার জন্য বাবা-মা ও সন্তান সবাই আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা বর্জিত হয়ে পড়েছে। ফলে সমাজের ভিত্তি প্রস্তর তথা পরিবার ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। সুযোগ্য নাগরিক তথা সাহসী, সৃষ্টিশীল, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল মানুষ তৈরির পরিবর্তে মুসলিম পরিবারগুলো উৎপাদন করছে নষ্ট ও আত্মকেন্দ্রিক ছেলে-মেয়ে। এসব ছেলে-মেয়েরা দাতার পরিবর্তে গ্রহীতা, সমাজের সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে স্বার্থপর এবং যত্নশীল হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশি ক্ষতিকর ও অপচয়ী হয়ে উঠছে।

বর্তমান মুসলিম সমাজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত; যেমন অনেক মুসলিম বাবা-মা অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও উদাসীনতার শিকার; অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়ে লেখা-পড়া ও কর্মদক্ষতা অর্জনের সুযোগ বঞ্চিত, আবার বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র অত্যাচারী স্বৈরাচারী সরকারের নির্যাতনের শিকার। অনেক মুসলিম সমাজেই নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা যায়:

- নিপীড়ন ও চাপিয়ে দেয়া মতের কারণে নিজস্ব চিন্তা ও মত প্রকাশের সীমিত সুযোগ ও চিন্তার সীমিত স্বাধীনতা।
- প্রশ্ন করার, অনুসন্ধান করার এবং কথা বলার সীমিত স্বাধীনতা।
- অনৈতিকতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে ব্যবসা ও উৎকর্ষের সীমিত সুযোগ।

- অজ্ঞতা ও পুরুষ কর্তৃক নিপীড়নের কারণে নারীর সীমিত স্বাধীনতা।
- স্বৈরশাসন ও দমন নিপীড়নের কারণে নিজেদের নেতৃত্ব বাছাইয়ে জনগণের অধিকারের সীমাবদ্ধতা।

মুসলমানরা রাতারাতি এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কিন্তু তারা অবশ্যই শুরুটা করতে পারে ভালো প্যারেন্টিং-এর মাধ্যমে, যেটি তাদের সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে। পূণ্যবান, সফল সন্তান এবং সর্বোপরি ভালো নাগরিক গড়ে তুলতে হলে মুসলমানদের প্রচলিত স্বৈরাচারী ও জোর-জবরদস্তিমূলক প্যারেন্টিং পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে এবং আন্তরিকতার সাথে প্যারেন্টিং পদ্ধতির পুনর্গঠন করতে হবে।

শিশু উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা

মুসলিম জাতির অধঃপতনের লাগাম টেনে ধরার নিমিত্তে সংস্কারমূলক অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অনেক পরিকল্পনা কার্যকরও করা হয়েছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, শিশু শিক্ষার মতো অতীব জরুরি বিষয়টি বাদ পড়ে গেছে সংস্কার কার্যবিধি থেকে। মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন রোধে এবং অবস্থার উন্নয়নে বিজ্ঞ স্কলাররা অনেক বিষয়ের উপর (দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতিসহ) তাদের শ্রম ও সাধনা দিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তথাপি ন্যায়পরায়ণ জাতি গঠনে ব্যর্থতার মূল কারণটি দূর হয়নি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে মুসলিমদের অসীম সম্ভাবনা ও যোগ্যতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়নি। সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা ও অবদানে (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ) মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে ব্যবধান যুগে যুগে বেড়েই চলেছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হলো সেই হৃত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং অবস্থার উন্নয়নে কাজ করা; শিশু উন্নয়ন, শিশু শিক্ষা ও শিশু বিকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিরীক্ষণে ভূমিকা রাখা। পরিবারের অভ্যন্তরে প্যারেন্টিং বিষয়টি দিয়ে কাজ শুরু করা অতীব জরুরি। শিশুর মন, মনন যদি বাবা-মা ও সংস্কারকদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু না হয় তবে মুসলিমবিশ্ব অবনতি, অধঃপতন ও পশ্চাদপদতার দিকে ধাবিত হতেই থাকবে।

THE INADEQUACY OF MUSLIM EDUCATORS!

ঐতিহাসিকভাবে অনেক ঐতিহ্যবাহী সংস্কারক প্রধানত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান ও এসবের আইনগত এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। আবার অন্যদিকে, অনেক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম সংস্কারকগণ পাশ্চাত্যের অনুকরণে অন্যপথে ধাবিত হয়েছেন। মাঝখানে সাধারণ জনগণ পড়ে থেকেছে শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি ও আশা নিয়ে, যা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।

অনেক ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন আবেগ ও ভাব প্রবণতায় পূর্ণ এবং তারা ইসলামের স্বর্ণযুগের অনুকরণে অবাস্তব ও বোধের দুর্গম সমাধানের প্রস্তাব করেছেন। যেখানে শিশু বিকাশে মহিলাদের (মা ও স্ত্রীর) দায়িত্ব ও ভূমিকার ব্যাপারে কোনো বাস্তবধর্মী ইঙ্গিত নেই। ফলে শিশু উন্নয়ন, শিশু শিক্ষা এবং প্যারেন্টিং সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সর্বজনগ্রাহ্য সাহিত্যকর্মের অভাব থেকেই গেছে। বাস্তবধর্মী না হওয়ায়, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সংস্কারক বা আধুনিক সংস্কারক- উভয়ের আন্তরিক সংস্কার আহ্বানে সাধারণ মানুষ নীরব, নিষ্ক্রিয় ও তৎপরতাহীন থেকেছে। বেশিরভাগ মুসলিম সক্রিয় হবার পরিবর্তে হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল। এসব সংস্কার উদ্যোগে সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ ও বোধ থেকে উদ্ভূত গবেষণালব্ধ কোনো পরিকল্পিত পদক্ষেপ ছিল না। সংস্কারকগণ স্বর্গীয় আইন (আস-সুনুন-আল-ইলাহিয়া) বা প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞানের কোনোটিকেই যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হননি।

মুসলমানদের অবশ্যই সুসন্তান গড়ে তোলার গুরুত্ব এবং এর দীর্ঘমেয়াদি সুফল উপলব্ধি করতে হবে। রসুল সা.-এর সেরা সাহাবিগণ ছিলেন পূর্ণবয়স্ক যখন তিনি (নবিজি সা.) তাদের ইসলামের আহ্বান জানান। তাদের মৌলিক চরিত্র শৈশবেই সুগঠিত হয়েছিলো। শৈশবে তারা বেড়ে উঠেছিলেন স্বাধীনচেতা ও সাহসী মানুষ হিসেবে। তারা স্বৈরাচারী শাসক দ্বারা দমিত ছিলেন না। এ প্রেক্ষিতে রসুল সা. শৈশবে চরিত্র বিনির্মাণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন: "ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে যারা উত্তম ছিল, পরবর্তী সময়েও তারাই সর্বোত্তম, যদি তারা ইসলামকে বুঝে"। শৈশবেই ব্যক্তির মৌলিক গুণাবলি প্রোথিত হয়ে যায়- একথা প্রাক ইসলামি যুগ বা ইসলাম পরবর্তী যুগ উভয়ের জন্যই সত্য। একজন শিশুকে বেড়ে ওঠার পর ইমান ও দক্ষতার শিক্ষা দেয়া যায় কিন্তু সচ্চরিত্র নয়।

যখন রসুল সা. ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০, আবু বকর রা.-এর ৩৭, উসমান রা.-এর ৩৬, উমার রা.-এর ১৯, আলী রা.-এর ১২, আর রসুল সা.-এর স্ত্রী খাদিজা রা.-এর ছিল ৫৫ বছর।[৩] মানুষের জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু সেগুলোকে জীবনে বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্বটি বাবা-মায়ের। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সম্পর্ক ও শিক্ষা ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে বাবা-মাকে চরিত্র গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগটি নিতে হয়। যদিও মানুষের মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ এবং মৌলিক প্রয়োজনগুলো সর্বদা একই থাকে; তবুও প্যারেন্টহুডের কৌশলগুলো যুগের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী পরিবর্তন, উন্নয়ন ও আধুনিকিকরণ প্রয়োজন।

উন্নত প্যারেন্টিং-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা কীভাবে সন্তানদের গড়ে তুলি তার ওপর জাতির অবস্থান নির্ভর করে। এ বিশ্বাস থেকে প্যারেন্টিং দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের কোর্স উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বিষয়টির প্রতি জনসচেতনতা আনয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলে যেকোনো জাতিকে তার চড়া মূল্য দিতে হবে। কাজেই প্যারেন্টিং-এর বিভিন্ন কোর্স (ট্রেনিং বা ওয়ার্কশপ)-এর ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। গঠনমূলক প্যারেন্টিং-এর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারি মন্ত্রণালয় গঠন অথবা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান স্থাপন হতে পারে মানবতার জন্য একটি বড় সেবা।

সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ প্রদান

আমরা যদি শিশু শিক্ষার সংস্কার করতে চাই, তবে আমাদের মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নিগূঢ় দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। শিশুদের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক বোধের অভাবের জন্য অনেক মুসলিম স্কুল আজ সমালোচনার সম্মুখীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক স্কুল শিশুদের খেলাধুলাকে দোষের মনে করে; তাদের কারিকুলাম শিশুর মানসিক উন্নয়নের স্তরগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ শিক্ষাব্যবস্থা রসকষহীন, জবরদস্তিমূলক ও অনমনীয়। শিশুদের প্রাকৃতিক কৌতূহল প্রবণতা এবং খেলাধুলার প্রতি ঝোঁককে মূল্যায়ন না করে বরং এ ব্যবস্থা যন্ত্রের মতো না বুঝে মনে রাখা ও গদ বাঁধা মুখস্থ বিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম বিশ্বে মূলত দুধরনের বিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রথমত: উন্নত ও সুপরিকল্পিত বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা যা বাছাইকৃত সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত; যেমন শাসক ও ধনীক শ্রেণি। তাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষালাভ করতো অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন, শিক্ষানুরাগ শিক্ষক (মুয়াদ্দিব)দের কাছে যাদের সরকারি ভবনে বা প্রাসাদে ডেকে আনা হতো। এ শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল শিশুদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

ওয়াশিংটন পোস্ট ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যৌথ গবেষণায় অধিকাংশ নারী-পুরুষের অগ্রাধিকারের যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা হলো- "মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা করা, পারিবারিক বন্ধন মজবুত করা, শিশুদের সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপন এবং মায়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সন্তানদের সাথে ঘরে থাকতে পারা"। ভালো প্যারেন্টিং স্পষ্টতই অগ্রাধিকারের শীর্ষে।

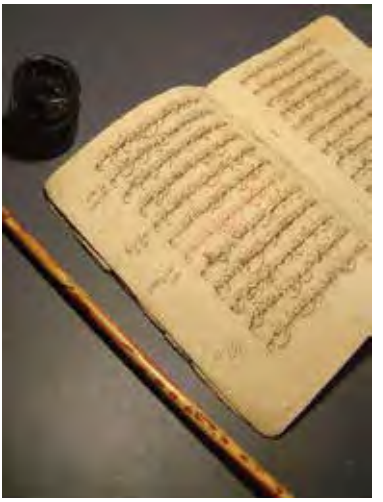

মুয়াবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান, আবদ আল-মালিক ইবন মারওয়ান, আল-হাজ্জাজ আল-সাকাফী, হারুন আল-রশিদসহ অন্যান্য শাসকগণের জন্য ছিল খ্যাতনামা শিক্ষক। এসব শিক্ষকদের শিক্ষার সমস্ত উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো যাতে তারা ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং বিভিন্ন দক্ষতা ও শরীর চর্চাসহ প্রয়োজনীয় সব শিক্ষা দিতে পারেন। তবে একক শিক্ষা তথা প্রাইভেট শিক্ষাব্যবস্থার একটি সমস্যা হলো শিশুরা অন্যান্য শিশুদের সাথে সম্মিলিত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো।

দ্বিতীয়ত এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রথমটির সম্পূর্ণ বিপরীত, কাত্তাব- এটি জনসাধারণের জন্য স্কুল, যেখানে কিছুটা কুরআন এবং মৌলিক গণিত শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষক কিংবা সুযোগ-সুবিধা কোনোটিই এ ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ছিলো না। শিক্ষকরা শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দিতেন, ছাত্রদের জন্য খেলাধুলা ছিল নিষিদ্ধ এবং মুখস্থ করাই ছিল শিক্ষার মৌলিক পন্থা। বর্তমানেও কিছু মুসলিম দেশে এ দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। ধনী অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের দেশে বা বিদেশে বেসরকারি স্কুলে পাঠান আর দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠান অপর্যাপ্ত সুবিধাসম্পন্ন সরকারি স্কুলে। বেসরকারি স্কুলগুলো আর্থিকভাবে সবল হওয়ার কারণে তারা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। তারা বিদেশি ও বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। ল্যাবরেটরি, ভিজ্যুয়াল উপকরণ, পাঠাগার, কম্পিউটার, খেলার মাঠসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করে। অন্যদিকে, সরকারি স্কুলগুলোতে এসব সুযোগ-সুবিধা থাকে না। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো মুসলিম দেশের এসব নামী-দামী বেসরকারি স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা নিয়ে বড় হয়।

এ অদক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বলি হচ্ছে শিশুরা। এভাবে শুরুতেই শিশুদের সঠিক শিক্ষার সুযোগ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে পরবর্তীতে একটি জাতির অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বিচ্যুত মন মানসিকতাকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। আর এভাবেই সুযোগের জানালাগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং আমরা যদি মুসলিম উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, তাহলে আমাদের শিশু লালন-পালন (প্যারেন্টিং) পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে, সেই সাথে পরিবর্তন করতে হবে শিক্ষাব্যবস্থার।

বিশেষ করে, শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। সফল হতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে জীবনের প্রথম শিক্ষক বাবা-মাকে দিয়ে। সন্দেহাতীতভাবে তারাই হলেন আত্মার শিক্ষক এবং চরিত্রের রূপায়ক।

যেকোনো সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে জেনে রাখা জরুরি যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সুখ আনয়নের মূল চাবিকাঠি হলো ভালো প্যারেন্টিং। তাই প্রথমত আমাদের প্যারেন্টিং সম্পর্কে ধারণা ও পদ্ধতিতে সংস্কার আনতে হবে। প্যারেন্টিং বিষয়টিতে মন ও মস্তিষ্ক এ দুয়ের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। মস্তিস্ক চায় বিচার, যুক্তি ও কৌশল। আর মনের দাবি হলো আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা ও বিচক্ষণতা। সুতরাং গঠনমূলক প্যারেন্টিং-এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও শৈল্পিক ছোঁয়া-এর কোনোটিরই অভাব থাকা উচিত নয়।

সভ্যতা বিনির্মাণে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। আর এসব প্রতিষ্ঠান তখনই সফলতা পায় যখন এগুলো সৎ, সক্রিয়, সৃজনশীল, নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেখানে পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক কাজের পরিবেশ বজায় থাকে। আর এ শক্তিশালী মন-মনন, শরীর, আত্মা ও চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির দায়িত্ব হলো পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের- অর্থাৎ বাবা-মায়ের। এ কাজটির দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম বা সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না; যদিও এ প্রতিষ্ঠানগুলো একাজে বিশেষ সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারে। ছেলে-মেয়েদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে কোনো সত্তা বা প্রতিষ্ঠানই বাবা-মায়ের চেয়ে বেশি সক্ষম নয় বা প্রাকৃতিকভাবে বাবা-মায়ের সমান ব্যাকুলতা অনুভব করে না। নিঃস্বার্থতা, দরদ ও সহানুভূতি প্যারেন্টহুড তথা অভিভাবকত্বকে মহীয়ান করে। যেখানে পৃথিবীর সবাই নিজেকে সর্বসেরা হিসেবে দেখতে চায় সেখানে একমাত্র বাবা-মাই চান সন্তানকে নিজের চেয়েও ওপরে ওঠাতে।

বাবা-মায়েরা যখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন, তখনই তারা সন্তানকে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় গড়ে তোলার জন্য নিঃস্বার্থভাবে সম্ভাব্য সবকিছুই করতে প্রস্তুত থাকেন। যখন কেউ তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে কীসে সন্তানদের মঙ্গল, তখন তারা সেভাবেই কাজ করেন। কাজেই মূল কাজ হলো বাবা-মাকে প্যারেন্টিং-এর গুরুত্ব বোঝতে সাহায্য করা। অর্থাৎ বাবা-মাকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ

সম্পর্কে সচেতন করাই হলো প্রধান কাজ। প্যারেন্টিং সমগ্র জীবনব্যাপী একটি কাজ, কেবল প্রথম পাঁচ বছরের জন্য নয়, যদিও প্রথম পাঁচ বছর প্যারেন্টিং-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ এ প্রারম্ভিক সময়ে বাবা-মাই সন্তানের জীবনে মুখ্য ভূমিকায় থাকেন। পরবর্তী সময়ে সন্তানের চরিত্র ও জীবন-মান গঠনে অন্যান্য প্রভাবকের উপস্থিতির মধ্যেও তারা মৌলিক ভূমিকা পালন করতে পারেন যদি তারা গাইড করার সঠিক পদ্ধতি জানেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন তাঁর 'It Takes a Village to Raise a Child' গ্রন্থে লিখেছেন, আমেরিকাতে ৪০ শতাংশ টিনএজ মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হয় ২০ বছর বয়সের আগেই এবং বছরে দেড় মিলিয়ন গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। অনেক আমেরিকানই তাদের সাপ্তাহিক বিনোদনের পরিকল্পনা নিজেদের পরিবার সম্পর্কে চিন্তা ও পরিকল্পনার চেয়ে বেশি গুরুত্বসহকারে করে থাকে। হিলারী ক্লিনটন আরো বলেন, বিবাহ বহির্ভূত সন্তান জন্মদানের সংখ্যা ১৯৬০ সালে শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে ১৯৯৬ সালে ২৫ ভাগে উন্নীত হয়।

শতকরা ২০ ভাগ শিশু দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করে। প্রতি বছর স্বজন হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনায় ধ্বংস হয় প্রায় ৭,০০০ শিশুর জীবন এবং প্রতিদিন ১,৩৫,০০০ শিশু স্কুলে বন্দুক নিয়ে আসে। ধনী বা দরিদ্র উভয় পরিবারের শিশুরাই শিকার হচ্ছে বিকৃতি, অবহেলা, অযত্ন এবং এমন সব মানসিক সমস্যায় যা প্রতিরোধযোগ্য। তাছাড়া, এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান অতিরিক্ত ওজন সমস্যায় ভুগছে, যা আশির দশকে ছিল এক চতুর্থাংশ।

তিনি আরো লিখেছেন যে, গড়পড়তায় একজন ১৭ বছর বয়সী ছেলে বা মেয়ে টিভিতে ১৮,০০০ খুনের দৃশ্য দেখে। একজন সাধারণ আমেরিকান ছাত্র গড়পড়তা ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে কাটায় যেখানে স্কুলে কাটায় ১১,০০০

ঘণ্টা। সাধারণ আমেরিকান শিশুরা বছরে এক হাজারেরও বেশি বার অভিনব পন্থায় সুস্পষ্ট ধর্ষণ, সশস্ত্র ডাকাতি ও হানাহানি দেখে টেলিভিশনে।

প্রশ্ন উঠে, কেন একজন শিশু ১৯৭২-এর নিক্সন ওয়াটার গেট ক্রাইসিস দেখে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অফিসে ভাংচুর করাকে অন্যায় হিসেবে দেখবে, যখন সে প্রতি রাতে প্রায় একই ধরনের ভাংচুরের ঘটনা টিভিতে দেখছে এবং এগুলোকে বীরোচিত কাজ মনে করছে? মূলত শিশুরা যখন প্রতিদিন অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে দেখে এবং এটি তাদের জীবনের প্রাত্যহিক স্বাভাবিক কাজে পরিণত হয় তখন তারা অপরাধের ব্যাপারে বোধহীন, অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়ে।

বাবা-মাকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ছেলে-মেয়েরা কুশিক্ষা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এসব থেকে সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং এগুলো উচ্ছেদের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। আমেরিকান সাহিত্যে প্যারেন্টিং-এর ওপর রচিত বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তা সমাজে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এতো পরামর্শ এবং বহু দশকের গবেষণার পরও কেন প্যারেন্টিং অবনতির দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

হলিউড সিনেমার সাধারণ প্রবণতা হলো মেধার ওপরে শারীরিক সৌন্দর্য; নৈতিকতা ও সততার চেয়ে বাহ্যিক রূপের প্রাধান্য। পাবলিক স্কয়ারগুলোতে মানব-মানবির নগ্ন মূর্তি; সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মহিলাদের শারীরিক সৌন্দর্য প্রদর্শন এখানে সাধারণ ঘটনা। ফলে শারীরিক সৌন্দর্য এখানে মূল আকর্ষণ; নৈতিকতা ও আত্মিকতা গুরুত্বহীন। বাণিজ্যিকভাবে এ ধারণা এতখানিই বিস্তার লাভ করেছে যে, এখন কুকুর-বিড়ালের জন্যও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়! অপরপক্ষে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে ইসলামের দর্শন হলো, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন; আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হলো চরিত্র ও নৈতিকতার সৌন্দর্য। এভাবে ইসলাম সব সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন করেছে কিন্তু অন্যসব সৌন্দর্যের ওপরে স্থান দিয়েছে চরিত্র, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সৌন্দর্যকে।

পারিবারিক সমস্যাগুলোকে- যেমন মাদক ও যৌন বিষয়ক সমস্যা, আমরা যেভাবে সংজ্ঞায়িত করি তার অলোকেই নির্ধারিত হয় এর সমাধানের প্রকৃতি। আমরা যদি

সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক হিসেবে দেখি, তবে এর সমাধান হবে অর্থনৈতিক। যদি এগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখি, তার প্রতিকারের উপায় হবে মূলত সামাজিক; যদি শারীরিক সমস্যা মনে করি তবে উত্তর হবে শারীরিক প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মাদককে সরবরাহের কারণে উদ্ভাবিত সমস্যা হিসেবে দেখা হয়; এর চাহিদাগত দিকটাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। কাজেই রাষ্ট্রকে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হচ্ছে জাহাজ এবং বিমানসহ বিভিন্ন সরঞ্জামে মাদকের সরবরাহ ঠেকাতে। এতদসত্ত্বেও বাস্তবে এ সমস্যার সমাধান হয়নি; বরং মাদক সম্রাটরা তাদের নোংরা ব্যবসার দ্বারা অপরিমেয় লাভ করে যাচ্ছে। সময় এসেছে বিষয়টিকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখার এবং সেভাবেই এর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার।

আমেরিকায় প্যারেন্টিং-এর প্রচলিত ভুল ধারণা

আমেরিকান সমাজের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সংঘাত শিশু মানসে বড় ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করছে। উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিকের 'Why Johnny Can't Tell Right from Wrong' (১৯৯৩), গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব বাবা-মাই চান তাদের ছেলেমেয়েরা সৎ, আস্থাভাজন, ন্যায়সঙ্গত, আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং সশ্রদ্ধ হোক। তারপরও কোন জিনিসটি বাবা-মাকে তাদের ছেলে-মেয়েদের এ আদলে গড়তে দেয় না? এর আংশিক উত্তর রয়েছে শিশু উন্নয়ন বিষয়ে সমাজে প্রচলিত শক্তিশালী মিথ বা শ্রুতিকথার প্রভাবের ওপর। আমরা আরেকটি অধ্যায়ে এসব শ্রুতিকথা বা মিথের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে আমেরিকান পরিবারকে ঘিরে প্রচলিত কয়েকটি মিথ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হলো। উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিক তার গ্রন্থে নিম্নোক্ত মিথগুলোর সমালোচনা করেছেন:

ক. **প্রতিষ্ঠাকালে যেহেতু আমেরিকা গড়ে উঠেছিল প্রধানত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ধারণার ওপর। তাই সেই দেশের শিশুদের বেড়ে ওঠা উচিত কর্তৃত্বহীনভাবে:** সেই সময়ে মানুষ বাইরে বেরিয়ে পড়ত, জঙ্গলে যেত, সেখানে নিজ গৃহ নির্মাণ করে ফসল ফলিয়ে নিজে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে, নিজেকে ও নিজ পরিবারকে বন্য পশু, চোর-ডাকাত ও বিদেশি সরকারের হাত থেকে রক্ষা করে বেঁচে থাকত। এভাবে তারা

অন্যের কর্তৃত্বের অধীন থেকে দূরে থাকত। ১৬-১৭ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে খ্রিস্টান তীর্থ যাত্রীরা ১৩টি কলোনির এই বিশাল ভূখণ্ডে আসে তাদের দেশের একনায়ক সরকারের হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য, যেখানে সরকারের আধিপত্য একেবারেই ছিল না। অনেক আমেরিকান যারা এ ধরনের সীমিত কর্তৃত্বের সুবিধা প্রাপ্ত তারা বিশ্বাস করে যে, শিশুদের সামান্য কর্তৃত্বের আওতায় অথবা একেবারে কর্তৃত্বহীন পরিবেশে বড় করাই কল্যাণকর।

প্রকৃতপক্ষে, শিশুদের সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন- যা বড়দের জন্য দরকার হয় না।

খ. **"মন্দ ছেলেই ভালো" সংক্রান্ত মিথ:** মন্দ চরিত্রগুলো সাহিত্য বা সিনেমায় চিত্রিত করা হয় সুখী ও ভালোবাসার যোগ্য হিসেবে। টম সয়্যার ও বুস্টার ব্রাউন আমেরিকান গল্পের দুটি বিখ্যাত চরিত্র যা অতীতের উদাহরণ। আর বর্তমান সময়ের সিনেমা বা টিভির "আদরণীয়" শিশু চরিত্রগুলো হলো Dennis the Menace, Bart Simpson, The Little Rascals; যে চরিত্রগুলো শিশুদের প্রভাবিত করে আসছে। এ ঐতিহ্যটি শিশুদের কল্পনার জগতকে এমনভাবে দখল করে নেয়, যে 'আনুগত্য' শব্দটি শিশুদের অভিধানে একটি নোংরা শব্দে পরিণত হয়ে থাকে।

গ. **ভালোবাসা আপনা থেকেই শিশুর ভিতরের 'সহজাত ভালো গুণগুলোকে' রক্ষা করে:** এ ধারণা এসেছে রুশো থেকে; যার মতে ভালো গুণগুলো আপনা থেকেই গড়ে উঠবে যদি শিশুদের স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া হয়। বাবা-মাকে যা করতে হবে, তা হলো কেবল তাদের ভালোবাসা। আর রুশোর মতানুসারে এ ভালোবাসা অর্থ হলো কোনো হস্তক্ষেপ না করে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া।

খ্রিস্টধর্মের সাতটি মারাত্মক পাপ

বিলাস, লোভ, আলস্য, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ও কাম-লালসা

ঘ. **'বিশেষজ্ঞের জ্ঞান'- সর্বদা সঠিক এবং কখনোই ভুল নয়:** বিশেষজ্ঞদের মতের ওপর ভিত্তি করে অনেক বাবা-মা সন্তান -সন্ততি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব থেকে সরে এসেছেন। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত 'সহজাত গুণ' মিথের পক্ষে মত দিয়েছেন। শিশুদের স্বাতন্ত্র্য, সৃষ্টিশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির প্রতি বর্তমানে অতি গুরুত্ব দেবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিছু বিশেষজ্ঞ চান বাবা-মা তাদের সন্তানদের নিয়মনীতি ও আনুগত্য শিক্ষা দেয়ার বদলে নিজেদেরকে সন্তানদের সাথে মানিয়ে নেবে।

ঙ. **নৈতিক সমস্যাগুলো হলো মানসিক সমস্যা:** আচরণগত সমস্যাগুলোকে দেখা হয় যথাযথ আত্মসম্মানের অভাব অথবা অপূর্ণ মানসিক চাহিদার কারণে সৃষ্ট সমস্যা হিসেবে। অনেক শিশু বিশেষজ্ঞ এ ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন যে, অনেক আচরণগত সমস্যাই শিশুদের নিছক অভিলাষ ও স্বেচ্ছাচারিতার ফল। আজকাল অনেক গ্রন্থ-ই 'আত্মসম্মান' ধারণার প্রতি এতটাই উৎসর্গীকৃত যে সেখানে কোথাও 'চরিত্র' শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ লক্ষণীয় যে, ১৯০০, ১৯১০ এবং ১৯৮০-এর বছরগুলোতে The Ladies' Home Journal, Women's Home Companion and Good Housekeeping ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত শিশু প্রতিপালন বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর এক তৃতীয়াংশই ছিল চরিত্র উন্নয়নের ওপর আলোচিত।

চ. **বাবা-মায়ের কোনো অধিকার নেই তাদের মূল্যবোধ তাদের শিশুদের মনে গেঁথে দেয়ার:** কিছু লোক যুক্তি দেন যে, শিশুদেরই তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরি করে নিতে হবে। সমাজের অন্যান্যরা যখন তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ শিশুদের ওপর নানাভাবে চাপিয়ে দিতে থাকে তখন বাস্তবে শিশুদের খুব কমই

সেই সুযোগ থাকে। যখন অন্য সবাই (লেখক, ছবি নির্মাতা, বিনোদন কর্মী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং যৌন শিক্ষক) শিশুদের কাছে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ জোর করে বিতরণ করছে, তখন বাবা-মায়ের নীরব দর্শকের ভূমিকা কি কোনো অর্থ বহন করে? অতএব, মূল্যবোধ নির্ধারণের একটি উপায় হলো পাপ কোনগুলো সেটি নিয়ে চিন্তা করা।

ছ. সিঙ্গেল প্যারেন্ট তথা একক অভিভাবকের পরিবার, বাবা-মাসহ দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারের মতোই কার্যকর: চরিত্র গঠন একটি কঠিন কাজ। তালাক চরিত্র গঠনের কাজকে আরো দূরূহ করে তোলে। আমেরিকান পরিবারগুলোতে তালাকের হার অনেক বেশি। অর্ধেকেরও বেশি পরিবার এ সমস্যায় আক্রান্ত। সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের শিশুরা মাদক, অপরাধমূলক কাজকর্ম, আবেগজনিত সমস্যা এবং অযাচিত গর্ভাবস্থা ইত্যাদির শিকারে পরিণত হবার ঝুঁকিতে বেশি থাকে। তবে তার মানে এটি নয় যে, আমরা এটি বিশ্বাস করি না সব পরিবারের শিশুরাই সুস্থ মানসিক বিকাশে সক্ষম। ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ডি. ডব্লিউ উইনিকট একসময় প্রবাদ উদ্ভাবন করেন 'Good-Enough Mother' যার অর্থ শিশুকে সুস্থ সত্তা হিসেবে গড়ে তুলতে একজন 'Good-Enough Mother' দরকার, যিনি শিশুকে একেবারে শুরু থেকেই তার মাতৃত্বে পরিবেষ্টিত করে নেবেন। এটি বাবা-মা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবার হোক বা দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবার। সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের একজন যত্নবান প্যারেন্ট শিশু গঠনে বেশি সফল হতে পারেন দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারের অসতর্ক অভিভাবকত্বের তুলনায়। এমনকি হাতের কাছে বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা থাকলে এবং কাজের স্থলে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ থাকলে একজন সিঙ্গেল প্যারেন্ট চাকরি করেও দ্বৈত প্যারেন্ট পরিবারের অজ্ঞ প্যারেন্টদের তুলনায় সন্তান লালন-পালনে উত্তম ভূমিকা রাখতে পারেন (আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতেই সিঙ্গেল প্যারেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি)।

জ. খাঁটি 'ধর্মনিরপেক্ষ পরিবার' সর্বোত্তম অনুসরণীয় উদাহরণ: অতীতে হিব্রু, রোমান ও গ্রিক সভ্যতায় এমনকি আঠারো ও উনিশ শতকে আমেরিকায় পরিবারকে পবিত্র[৭] হিসেবে মনে করা ছিল সামাজিক নিয়ম। অনেক গৃহে ধর্মানুষ্ঠান পালন করা হতো ও ধর্মীয় গ্রন্থ পড়া হতো। পারিবারিক জীবনকে পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে বৃহৎ উদ্দেশ্য, এক বিস্তৃত দর্শন ও লক্ষ্যের সাথে যুক্ত করা হতো। এ পরিবারের এ দর্শন বাবা-মাকে বর্ধিত কর্তৃত্ব প্রদান করত ও পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করত।

[৭] Sanctity of the Home.

যেসব পরিবারের সন্তানদের মধ্যে আনুগত্য থাকে তাদের মধ্যে এ বোধ তৈরি করা সহজ যে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট: একটি বিশ্বাস, ধর্ম, ঐতিহ্য, দর্শন, নীতি অথবা একটি লক্ষ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া। দুঃখজনকভাবে অনেক পরিবার আজ কোনো কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না; না 'ছোটো উপাসনালয়ের'; না 'ক্ষুদ্র সরকারের'। তারা এখন অনেকটা ছোটো 'হোটেল বা রেস্তোরাঁর' মতো: একটি থাকা ও খাওয়ার জায়গা মাত্র। যেখানে একজন মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছাড়াই। মোদ্দাকথা পারিবারিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা এতটাই গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হয়েছে যে মনে করা হয় 'সবকিছুই সেখানে চলে' এবং 'কোনো কিছুই কোনো ব্যাপার না'।

এবার প্রশ্ন হলো-কোন জিনিসটি পরিবারকে একটি যৌথ দল কিংবা গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়[৮] থেকে কিছু ব্যক্তির একটি সমাবেশে[৯] পরিণত করেছে, যেখানে প্রত্যেকে তার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত? এজন্য অনেক আধুনিক আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীকে দায়ী করা যেতে পারে; তারা পরিবার বা বিয়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বরং

[৮] Community.

[৯] Collection of Individuals.

বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছিল। আলফ্রেড এ্যাডলার, যাকে মনোবিদ্যার জগতে আশাবাদী আমেরিকান ধারার জনক মনে করা হয়; তার তত্ত্বের নাম দিয়েছে- 'Individual Psychology' (পুরো জীবনব্যাপী একটি মানুষের চলন, অনুভূতি, অনুভব ও স্মৃতিচারণ- সবকিছু এখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে)। আবার, ড. সরদার তানভীর (প্রফেসর অব এডুকেশন, সিনসিন্যাটি বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন যে, শ্রেণিকক্ষগুলোতে 'আমি' ও 'আমার' (Myself) ধারণা দুটিকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে শিক্ষকগণ ছাত্রদের বলেন: 'তুমি সিদ্ধান্ত নেবে, তোমার বাবা-মা নয়; তুমি তাই করো যা তুমি পছন্দ করো'। এ পরিস্থিতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক মেয়ে তার নানিকে বলেছিল, "আপনি আমাকে হুকুম দিতে পারেন না, এমনকি আপনি আমার মাও নন"। জবাবে নানি বললেন, "কিন্তু আমি তোমার মায়ের মা"। (Seminar at ADAMS center, 1997)

ধর্মীয় পরিবারগুলোতে ধর্মগ্রন্থের চর্চা হয় বিধায় শিশুরা বুঝে যে তারা মূলত বাবা-মায়ের কাছ থেকে "আদেশ গ্রহণ" করে না, বরং পরিবারের সব সদস্যই স্রষ্টার কাছ থেকে আসা বিধানকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলে। যেহেতু ধর্মীয় বিধানে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ আচরণের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে, সেহেতু ধর্ম বাবা-মাকে সন্তানদের ওপর বাড়তি কর্তৃত্বের সুবিধা প্রদান করে, যেটি ধর্মহীন পরিবেশের বাবা-মায়ের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে ধার্মিক প্যারেন্ট বেশি দেখা যায় যেখানে পরিবার ও পরিবারিক আচার-এর ধারণা অনেক মজবুত। আমেরিকান পরিবারগুলোতে আর তেমন কোনো ঐতিহ্য বর্তমান নেই, সেখানে একটি অনুশীলনই নিয়মিত চর্চা করা হয় আর তা হলো টেলিভিশন দেখা। এটি অবশ্য একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'দ্যা সিম্পসনস'[১০]-এ ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছিল যদিও 'সিম্পসন' নিজেও একটি টিভি অনুষ্ঠান। তাই বলে এটি সর্বজনীনভাবে দাবি করা ভুল হবে যে, প্রাচ্যের সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনায় উত্তম।

যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক বন্ধন তখন থেকে দুর্বল হতে শুরু করেছে যখন পরিবারকে কেবল একটি 'সামাজিক চুক্তি'[১১] হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে, যেখানে শর্তহীন কর্তব্যের বদলে যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য

---

১০ The Simpsons.

১১ Emergence of "Social Contract" Model of Family.

পেয়েছে। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ বিবেচনা না করে, 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি'র মতো লাভের জন্য একত্রিত সদস্য হিসেবে বিবেচনা করলে পরিবারগুলো কখনোই কার্যকর হয় না। সন্তান প্রতিপালন অথবা সংসারকে আজীবন কার্যকর রাখার জন্য প্রয়োজন অনেক ব্যক্তিগত ত্যাগ-তিতিক্ষার, যাকে লাভ-ক্ষতির বিচারে যৌক্তিক মনে নাও হতে পারে।

> যখন এক ব্যক্তি হযরত উমার রা.-এর কাছে এসে বললেন- তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চান, যেহেতু তিনি স্ত্রীকে ভালোবাসেন না। হযরত উমার রা. বললেন, লানত তোমার ওপর! পরিবার কি শুধুই ভালোবাসার জন্য গঠিত? কোথায় তোমার কর্তব্য ও তত্ত্বাবধায়ন?
>
> Al-Hashmi, 1999

গভীর ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন আমেরিকান খ্রিস্টান পরিবার খাবারের আগে শুকরিয়া আদায় করে, রাত্রিকালীন প্রার্থনা করে এবং নিয়মিত স্তোত্রমালা পাঠ করে, যা গির্জার প্রচলিত বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ক্যালেন্ডার অনুসরণে করা হয়। এ ধর্মীয় প্রক্রিয়া জীবনের লক্ষ্য বা জীবনোদ্দেশ্যের চেতনা তৈরি করে। গৃহ তাদের ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্র, যা পরিগণিত হয় পবিত্র স্থান হিসেবে, যেখানে শিশুদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা প্রাধান্য পায়। বাবা-মা ও বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সম্মানকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়; যেমন: দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, খালা-ফুফু ইত্যাদি। আত্মীয়-স্বজনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং প্রধান ধর্মীয় ছুটিগুলো উদযাপন করা হয় পরিবারের আনন্দময় পুনর্মিলনী হিসেবে। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, অর্থডক্স জিউস পরিবারগুলো ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করলেও তাদের ছেলেমেয়েরা মাদক, সন্ত্রাস এবং দায়িত্বহীন যৌনক্রিয়ার মতো কাজ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে মুক্ত থাকে, যা সাধারণত অন্যান্য শহুরে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপক। একই কথা আমেরিকার মুসলিম পরিবারগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য।

কলাম্বিয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণহত্যা থেকে শিক্ষা

২০ এপ্রিল, ১৯৯৯ লিটলটোন কলোরাডোর কলাম্বিয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংঘটিত গণহত্যায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়, ২৬ জন আহত হয় এবং শত শত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে একাধিক সহিংস ঘটনা ঘটে জর্জিয়া, কেনটাকি, আরকানসাস এবং ভার্জিনিয়ার স্কুলগুলোতে। প্রাক্তন অধ্যাপক দিলনাওয়াজ সিদ্দিকী এসব কর্মকাণ্ডের জন্য মানুষের অসৎ চরিত্রকে দায়ী করেন।

কোনো কোনো গবেষক ভগ্ন পরিবার প্রথাকে দায়ী করেন, অন্যান্যরা প্রচার মাধ্যমগুলোয় অতিমাত্রায় সহিংস ঘটনার প্রচারের প্রভাবের কথা বলেন, অনেকে আবার দায়ী করেন ক্লাসটার বোমার মতো ক্ষেপণাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতাকে। তবে কারণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আড়ালে রয়ে গেছে, যেমন- ব্যক্তির দায়িত্বশীলতা এবং নিজ কৃত কর্মের জবাবদিহিতা। সেই সাথে ব্যক্তির বিশ্বাস, নিয়ত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও কথার পরিণতি রয়েছে।

আমরা অভিভাবকের কাছে সিদ্দিকীর বক্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরতে পারি এভাবে:

- যোগাযোগ, শিক্ষা এবং পারস্পরিক লেনদেনে অবশ্যই সঠিক মূল্যবোধের প্রকাশ থাকতে হবে।
- ছেলে-মেয়েদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড শেখাতে হবে।
- সত্য কী সে সম্পর্কে আপেক্ষিক ধারণা[১২] সমাজে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে। একটি আপেক্ষিকবাদী ধারণা হলো -কোনটি ঠিক, কোনটি বেঠিক তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকতার ওপর (শাশ্বত নীতির ওপর নয়)।
- একজন সুস্থ শিশুকে অবশ্যই মৌলিক বিশ্বজনীন মূল্যবোধের

[১২] Relativistic Interpretations

শিক্ষা দিতে হবে (যেমন: সত্য, সততা, ন্যায় এবং শান্তি)।

- ভালো ও মন্দ উভয়ের জন্য সমান সুযোগ লাভের পথ খোলা থাকা উচিত নয়। আমাদের ছেলে-মেয়েদের অবশ্যই ইতিবাচক শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের সাহায্য করতে হবে যতটা সম্ভব নেতিবাচকতাকে সমূলে উৎপাটন করতে।

অপরাধীদের সমাজের বলি বা পরিস্থিতির শিকার হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের রক্ষার বা তত্ত্বাবধানের পরিবর্তে আমাদের উচিত প্রত্যেকের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। আমাদের উচিত নিজেদের কার্যকলাপকে নৈতিকতার মানদণ্ডের সাথে তুলনা করা। আমাদের এ অজুহাত দেয়া ঠিক হবে না যে, পরিস্থিতির কারণে যে কেউ একই ধরনের কিংবা আরো খারাপ আচরণ করত। প্রকৃতপক্ষে, যথাযথ প্যারেন্টিং সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, এ ধরনের সহিংস অপরাধ ঘটতেই থাকবে, এমনকি বাড়বে।

শিশুদের মূল্যবোধ শিক্ষাদান: রক্ষণশীল বনাম উদারনীতি বিতর্ক

'Only Way to Teach Values: Help Kids Discover Them' (Chicago Tribune, 1998) শীর্ষক প্রবন্ধে এরিক জর্ন দাবি করেন যে, "মূল্যবোধ শিক্ষাদানের একমাত্র উপায় হলো ছেলে-মেয়েদের এসব আবিষ্কার করতে সাহায্য করা। সামাজিক রক্ষণশীলগণ নৈতিক উৎকর্ষ, নৈতিক চিন্তা এবং সচ্চরিত্রের ওপর জোর দেয়। তবে শিশুরা যেমন জাদুকরী ক্ষমতায় গণিত শিখে যায় না, তেমনি এসব গুণও তারা জাদুর মতো অর্জন করতে পারে না। যখন পরিবারগুলো ভঙ্গুর, অতি মাত্রায় ব্যস্ত আর সমাজে স্থূল মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতির জয় জয়কার তখন স্কুলে চরিত্র শিক্ষা না দিয়ে তার ভার পুরোপুরি পরিবার ও সমাজের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত খুব একটি ফলপ্রসূ হয়নি"।

এরিক জর্ন বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষাদানকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন বামপন্থীরা বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন, কারণ এর ফলে চিন্তাহীন অনুসরণ, সংকীর্ণমনতা এবং অসহিষ্ণুতা তৈরি হতে পারে। সে যাই হোক, যেসব শিশুরা ভালো নৈতিক শিক্ষা ছাড়া বেড়ে ওঠে, তারা ঠিক তেমনটাই

সুবিধা বঞ্চিত যতটা দরিদ্র, অসুস্থ, গৃহহীন এবং নির্যাতিত শিশুরা।

শিশু, গণিতশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র

এটি আশা করা যায় না যে, শিশুরা নিজে থেকেই ক্যালকুলাসের নিয়মগুলো আবিষ্কার করবে, শিখে ফেলবে। ঠিক তেমনিভাবে যখন প্রশ্ন আসে নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের; তখন বাবা-মাকেই সন্তানদের সেগুলো শেখাতে হবে।

ল্যারি নুচ্চি থেকে জর্ন উদ্ধৃত করেন: "এ বিতর্কে আপোসের জায়গাটি হলো, এটি একদিকে ঠিক যে শিশুদের মুখে তুলে খাইয়ে সত্যকে গিলিয়ে দেয়া যায় না। তাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং আবিষ্কার করতে দিতে হবে। আবার অন্যদিকে, যেহেতু তারা প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তাই তাদের পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকতে হবে। সমাজকে প্রাথমিক পর্যায়ে মূল্যবোধ স্থির করে নিতে হবে- সমাজ সবকিছুর জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না"। অ্যালফি কহন-এর মতে, এমতাবস্থায় প্রধান সমস্যা হলো কীভাবে চারিত্রিক শিক্ষাকে[১৩] কেবলমাত্র "একগুচ্ছ পরামর্শ এবং বাহ্যিক প্রলোভন দ্বারা শিশুদের কাজ করানো এবং যেটি বলা হবে সেটি করার মানসিকতা তৈরি" করা থেকে মুক্ত রাখা যায় সেটি নির্ধারণ করা। কহন বলেন, "লাঠির মাথায় গাজর" নীতিতে নৈতিক শিক্ষা দেয়ার মানে হলো শিশুদের সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে নীতি শিক্ষা দেয়া যেখানে শিশুরা কোনোরকম চিন্তা ও কারণ অনুসন্ধান ছাড়াই পূর্ব নির্ধারিত সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়।[১৪] এ ধরনের বোধ, সত্যিকার অর্থে ব্যক্তি চরিত্রের গভীরে প্রোথিত হয় না এবং এটি সহানুভূতিসহ অন্যান্য নৈতিক বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের দিকেও ধাবিত করে না। নৈতিক শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা যথার্থ ও জরুরি।

এটি নিদেনপক্ষে শিশুদের কোনো প্রকার নৈতিক শিক্ষা না দেয়ার থেকে উত্তম! এক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা হলো মূল্যবোধকে জোর-জবরদস্তি করে শিশুদের ওপর চাপিয়ে না দেয়া, আবার তাদেরকে সম্পূর্ণ নিজেদের ওপর ছেড়ে না দেয়া, কারণ তারা এখনো ছোটো এবং তাদের পথ প্রদর্শক প্রয়োজন। কাজেই বাবা-মায়ের দায়িত্ব হলো যখনই সম্ভব সন্তানদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা আবিষ্কার করতে সাহায্য করা ও সেদিকে পরিচালিত করা।

[১৩] Character Education.

[১৪] Uncritical Acceptance of Readymade Truths.

মুসলিম দেশগুলোর পরিবার বনাম যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার

মানুষের জ্ঞান অসীম বা পরিপূর্ণ নয় বরং সীমিত। যেখানেই বাস করুক না কেন, সব পরিবারকেই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে কিছু পরিবারকে অন্যান্য পরিবারের তুলনায় অধিক গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। শহরায়ন, শিল্পায়ন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার এক বিশাল প্রভাব রয়েছে শহরবাসী পরিবারগুলোর ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলোতে বসবাসরত পরিবারগুলোর কিছু সমস্যা নিচে তুলে ধরা হলো:

- এসব শহরে বিবাহপূর্ব যৌনতাকে আকর্ষণীয় এবং সহজলভ্য করে তোলা হয়। যার পরিণতিতে নির্বিচারে যৌনতা সংঘটিত হচ্ছে।
- নারী-পুরুষের একই সাথে নাচা, সাঁতার কাটা এবং যৌন উত্তেজক সঙ্গীত চর্চা এখানে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।
- ডেটিং-এর নামে শারীরিক সংস্পর্শ (চুমু, অন্তরঙ্গতা, গলাগলি)- এসবকে পুরুষ ও নারীদের জন্য একে অপরকে জানার মাধ্যম হিসেবে অনুমোদিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়- বরং গ্রহণযোগ্য প্রথা হিসেবে এটি বাবা-মায়েরাই ছেলে-মেয়েদের শেখায়।
- সরকারি লকার কক্ষ ও পাবলিক বাথরুমে নগ্নতা খুব সাধারণ বিষয়। কিছু বিদ্যালয়ের শৌচাগারে কোনো দরজা থাকে না। আর গোসলখানার গোপনীয়তা যেন হারিয়েই গেছে।
- বিবাহপূর্বে যৌনকাজ থেকে বিরত থাকার ওপর জোর না দেয়া। কিছু স্কুল এমনকি গির্জাগুলোতেও অবিবাহিত যুবক-যুবতিদের মাঝে কনডম বিতরণ করা হয়।
- কিছু শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের বলে- "তোমরা যা পছন্দ করো ও অনুভব করো তাই করো" নৈতিক বিধি-নিষেধের কোনো রকম তোয়াক্কা না করেই; কাম ও লালসাকে লাগামহীন ছেড়ে দাও। ছাত্র-ছাত্রীরা আরো শিক্ষা লাভ করে যে, স্রষ্টা নয় ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ন্তা।
- এ্যালকোহল পান করা স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। বরং একে উৎসাহিত করা হয়।
- মাদকের অপব্যবহার অবাধ। বন্দুক এবং সন্ত্রাস স্কুলে সাধারণ বিষয়। টেলিভিশন মিডিয়া সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে।

- ব্যাপকভাবে গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। পরিবারগুলোর আকার ছোটো হয়ে আসছে এবং নিউক্লিয়ার পরিবারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে বর্ধিত পরিবারের বিপরীতে।
- অনেক পুরুষ টাইট পোশাক পরে এবং মহিলারা মেকআপ করে ও সুগন্ধি ব্যবহার করে যৌন আকর্ষণীয় হবার জন্য। অনেকে তাদের দেহ অনাবৃত রাখে অধিক প্রলুব্ধ করার জন্য। তরুণ বয়সে বিবাহকে অনুৎসাহিত করা হয়, ফলশ্রুতিতে দায়িত্বহীন যৌন সম্পর্ক তৈরি হয়।
- তালাকের হার এবং সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাল্য বয়সে সন্তান জন্মদানের ঘটনা বেড়ে চলছে। টিনজ (Teens) ম্যারেজ নিরুৎসাহিত করার ফলে অবিবাহিত শিশু মায়ের (যাদের বয়স ১৮ এর নিচে) সংখ্যা বাড়ছে। অধ্যাপক ওলাস্কী বলেন যে, ১৯৫০-এর দশকে ৮৫ শতাংশ কিশোরী মাতারা বিবাহিত ছিল (Olasky, 1994)।
- সমকামিতা অনেক জায়গাতেই গ্রহণযোগ্য, স্বাভাবিক এবং আইন সিদ্ধ হচ্ছে। বেশ কিছু রাজ্যে সমলিঙ্গ বিবাহকে আইন সিদ্ধ করা হচ্ছে।
- বেশিরভাগ বয়স্ক নাগরিক তাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির সঙ্গে থাকার পরিবর্তে আশ্রয় পাচ্ছে নার্সিংহোমে।
- বিবাহপূর্ব কুমারিত্ব বিরল। কুড়ির পরে একজন নারী কুমারী থাকলে তাকে অনাকর্ষণীয় ও অবাঞ্ছিত ধরে নেয়া হয়। বেশিরভাগ লোক বিবাহপূর্ব যৌনাভ্যাস গড়ে তোলে, কৌমার্য এখানে বিরল।
- পরিবার ধীরে ধীরে খণ্ডিত হচ্ছে এবং পারিবারিক মূল্যবোধ (সিলাত আল-রহম) দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- সম্মতি প্রদানকারী যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ককে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা হয়।
- এইডসসহ যৌন বাহিত রোগ[১৫] স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে।
- পরিবারগুলো চাকরি ও বাসস্থান ঘন ঘন পরিবর্তন করে। তারা চরম গতিময় জীবন-যাপন করে।

[১৫] Sexually Transmitted Diseases (STDs).

- অনেক নারীকে নিজের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং কোনো আত্মীয় পুরুষ; অভিভাবক এবং রক্ষক হিসেবে তার (মহিলার) প্রতি দায়িত্ব পালনে নৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বাধ্য নয়।
- পুরুষ ও নারীরা স্বাধীন এবং ঝুঁকি নিতে আগ্রহী। অনেক পরিবারে বাবা-মা দুজনই কর্মজীবী।
- নারী ও পুরুষের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য খুবই সীমিত।

যুক্তরাষ্ট্রের শহুরে পরিবারগুলো বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা ভোগ করে থাকে:

- শহরে সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মানবোধ বেশি।
- তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত।
- শিক্ষার হার অনেক উঁচু।
- সামাজিক সেবা ও সরকারি কার্যক্রম অনেক বেশি। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নির্ভরশীলতা যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ব্যাপার।
- ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য রয়েছে স্বাধীনতা; উন্মুক্ত রয়েছে অনেক পথ ও বিকল্প ব্যবস্থা।

অপরদিকে মুসলিম বিশ্বের পরিবারগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

- আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশি ঘটে।
- সাধারণভাবেই পরিবারগুলো বেশি কর্তৃত্ব পরায়ণ ও সংরক্ষণশীল।[১৬] যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এসব পরিবারের শিশুদের আত্মবিশ্বাস, সাহস ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকে। তারা তাদের নেতা এবং ঊর্ধ্বতনের সাথে দ্বন্দ্বকে ভয় পায়।
- দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনই সমাজে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করে; সামাজিক কাজ এবং দলীয় উদ্যোগ খুবই কম।
- পরিবার হলো একক ব্যক্তি পরিচালিত প্রথা যেখানে আলোচনার সংস্কৃতি খুবই কম। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষ অসমতা বেশি মাত্রায় বিরাজমান।
- অনেক ধার্মিক মুসলিম পরিবার অগোছালো ও অকার্যকর। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো শুধু প্রথা হিসেবে পালিত হয়- আনন্দঘন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হিসেবে নয়।

---

[১৬] More Authoritarian and Protective.

যেহেতু বর্তমানে অনেক মুসলিম পরিবার শহরে বাস করে, তাই শহুরে সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি। এটিই সত্য যে- শহরে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন তুলনামূলক কঠিন।

ব্রিটেনে বসবাসরত মুসলিমদের কাহিনী

ইরাকের মসূল থেকে আগত জনাব বাকরী ইংল্যান্ডের স্যান্ডহারস্ট মিলিটারি কলেজে যোগ দেন। কলেজের গোসলখানায় তিনি ছাড়া প্রত্যেকে নগ্ন হয়ে গোসল করত। অথচ তিনি অন্তর্বাস পরে গোসল করতেন। তার অফিসার অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি তোমার অন্তর্বাস খুলছ না কেনো, তোমার কি যৌনাঙ্গ নেই?" জনাব বাকরী উত্তরে বললেন, মুসলিমরা তাদের লজ্জাস্থান (আওরাহ) অনাবৃত করে না, ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

জনাব মুহাম্মদ ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন। তার বাড়িওয়ালী তাকে প্রশ্ন করলেন; "তোমার কোনো মেয়ে বন্ধু নেই কেন? তুমি কি সমকামী?" তিনি বুঝিয়ে বললেন, ইসলামে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাইরে কোনো যৌন সম্পর্ক নেই।

ওপরের তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্য এটি নয় যে, কোন পরিবার প্রথা উত্তম সেটি দেখানো। বরং এগুলো উত্থাপন করা হয়েছে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য, যাতে উভয় পারিবারিক ব্যবস্থায় প্যারেন্টিং আরো কার্যকর করা যায়। বাস্তবে পশ্চিমা সংস্কৃতির জোরালো প্রভাব রয়েছে মুসলিম বিশ্বের পরিবারসমূহ ও প্যারেন্টিং-এর ওপর। এ প্রভাবের রয়েছে মিশ্র প্রতিফল: কিছু ইতিবাচক আবার কিছু নেতিবাচক।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থায় স্রষ্টার পরিবর্তে মানুষকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, আর বস্তুবাদকে[১৭] করা হয়েছে সর্বোচ্চ আদর্শ। বিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান নির্ভর করে কেবল কারণ ও ফলাফলের ওপর। যদিও বিজ্ঞান আমাদেরকে বস্তুগত বিশ্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা দিলেও আমরা যা দেখি এবং পিছনে যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়, তার মধ্যকার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাপক দর্শন বিজ্ঞান তুলে ধরে না। সেক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বদর্শন পরিচয় করিয়ে দেয় একত্ববাদ (তাওহিদ), মানুষোচিত বিশ্বাস (আমানাহ) এবং বিশ্ব উন্নয়নের দায়িত্ব (*ইমরান*- ইসতিখলাফ) ও পরকালে পূর্ণ জবাবদিহিতার যে ব্যবস্থা আছে তার সাথে।

[১৭] Materialism.

মুসলিম প্যারিন্টিং-এর ওপর পশ্চিমা প্রভাব

শক্তিশালী পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবার প্রথার এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে মুসলিম পরিবারগুলোর ওপর। আবু আল হাসান আল নদভী তাঁর গ্রন্থে (আরবি ভাষায় লিখিত, গ্রন্থটির নাম- Towards Free Islamic Education [tarbiyah] in Muslim Governments and Countries, শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পুনর্গঠনের আহ্বান জানান। তিনি পশ্চিমা পাঠ্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাবের কথা উদ্ধৃত করে বলেন যে, এ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিত্বকে করে অস্থিতিশীল এবং বিশ্বাসকে করে দুর্বল। এ শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি জেনারেশন গড়ে তুলছে যারা মূল্যবোধ শূন্য; এমন শাসক ও ব্যবস্থাপক তৈরি করছে যারা ধর্মকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়, বিশ্বাসীদের দমন করে এবং দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আধুনিক শিক্ষা যা মুসলিম সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, এমন যুব সমাজ তৈরি করে যারা বিভ্রান্ত ও দ্বিধান্বিত; যেকোনো নৈতিক যুক্তির সমর্থনে দাঁড়াতে এবং বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন গড়ে তুলতে অক্ষম।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অন্যান্য সংস্কৃতির জন্য যেটি ভালো সেটি মুসলিম শিশুদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। জাপানি বিদ্যালয়গুলোর সাফল্য নিয়ে আমেরিকার পণ্ডিতগণ-এর মন্তব্য হলো- জাপানের জন্য যেটা ভালো তার সবটুকুই যে আমেরিকার জন্য ভালো হবে এমনটি নয়; কেননা দুদেশের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। প্যারেন্টিং একটি নিখুঁত কৌশলী কাজ, যেটি জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে করতে হয়।

লক্ষণীয় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পশ্চিমাকরণ ও আধুনিকায়ন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা পোষণ করে। অধ্যাপক আলী মাজরুই (স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক) উল্লেখ করেন যে, আমরা কি সংস্কৃতিকে পশ্চিমাকরণ না করে অর্থনীতিকে আধুনিকায়ন করতে পারি? এ প্রশ্নটি যখন জাপান, তুরস্ক ও আফ্রিকার সামনে রাখা হয়েছিল তখন তিনটি ভিন্ন উত্তর পাওয়া গেছে। জাপানিরা উত্তর দেয়- হ্যাঁ, আমরা জাপানি নীতি বজায় রেখে পশ্চিমা কৌশল অবলম্বন করতে পারি। তুর্কীরা, যারা মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক-এর উত্তরাধিকারী জবাবে বলেছিল না, আধুনিকায়নের একমাত্র মূলমন্ত্রই হলো সাংস্কৃতিক পশ্চিমাকরণ। কামালিস্ট তুর্কীরা বিংশ শতকে জনগণের ওপর পশ্চিমাকরণকে চাপিয়ে দেয়ার জন্য যা প্রয়োজন তার সবই করেছে। আরবি বর্ণমালা লুপ্ত করে গ্রহণ করেছে ল্যাটিন বর্ণমালা, ফেজ টুপিকে আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছে, নারীদের পশ্চিমা পোশাক ধারণ করতে বাধ্য করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করেছে অন্ধ, গোঁড়া ধর্মনিরপেক্ষ[১৮] এক দেশ। ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ-পরবর্তী আফ্রিকা জবাব দেয়, অর্থনীতিকে আধুনিকায়ন না করে, সংস্কৃতিকে পশ্চিমাকরণ করা'; যা অন্য দুটি দেশ থেকে নিকৃষ্ট (The Association of Muslim Social Scientists Bulletin, 2002).

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যারেন্টিং

একটি ইউনিসেফ নিরীক্ষায় যেখানে ২১টি সম্পদশালী দেশকে ৬টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল (বস্তুগত সুবিধা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিক্ষা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, আচরণ ও ঝুঁকি এবং নিজেদের মঙ্গল সম্পর্কে তরুণ জনগণের সেই বিষয়ক চেতনা)। দেখা যায়- যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উভয়েই ৬টি বিভাগের মধ্যে পাঁচটিতে নিচের দিক থেকে দু-তৃতীয়াংশে রয়েছে (UNICEF

[১৮] Fanatically Secular State.

Report, 2007)। এ দেশ দুটি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সমাজে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পরিবারের প্রতি অপ্রতুল সামাজিক সহযোগিতা, সন্তানসহ পরিবারগুলোর প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ উন্নত সেবা ব্যবস্থার কারণে শিশুরা অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে- আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য শিশুদের ক্ষেত্রে ততটা বিনিয়োগ করে না যতটা ইউরোপীয় উপমহাদেশের দেশগুলো করে থাকে।

ইউনিসেফ নিরীক্ষার উপ-শ্রেণিসমূহ

যারা দিনের প্রধান খাবার প্রতি সপ্তাহে পরিবারের সাথে বেশ কয়েকবার খেয়েছিল তাদের শতকরা হার।	যে সব শিশুদের অন্যান্য শিশুদের সাথে সদয়/ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান তাদের অনুপাত
স্বাস্থ্য প্রতিবেদন	ডে-কেয়ার সেবাসমূহ
শিশুদের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা	স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা
সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারের ঘটনা প্রবাহ	এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু
শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ	শৈশবকালীন রোগের জন্য টিকাসমূহ
অ্যালকোহল/মদপান	আঘাত ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে ১৯ বছরের পূর্বে সংঘটিত মৃত্যুসমূহ
ঝুঁকিপূর্ণ যৌনাচরণ	পূর্ববর্তী বছরে সংগ্রামরত শিশু
সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারে/ বৈমাত্রেয় বাবা-মায়ের সাথে বসবাসরত শিশুদের শতকরা হার	পূর্ববর্তী দুমাসে নির্মমভাবে নিপীড়নের শিকার

স্বাধীনতা নাকি বাস্তবতা?

শিশুর লালন-পালনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলোতে স্বাধীনতা নিজেই একটি লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। অনেক বাবা-মা শিশুদের প্রায় সীমাহীন স্বাধীনতার অনুমোদন দেন, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে বাবা-মায়েদের জন্যই বিপর্যয় ঘটায় এবং শিশুদেরকে তাদের স্বার্থপর

আকাঙ্ক্ষা পূরণে উৎসাহ জোগায়। নিয়ন্ত্রণহীন আকাঙ্ক্ষা বিপজ্জনক, কেননা তা স্রষ্টার নৈতিক নির্দেশনাকে অবমাননা করতে ও সীমালঙ্ঘন করতে উদ্বুদ্ধ করে; মানুষকে বস্তুগত প্রাচুর্যের ক্রীতদাসে পরিণত করে। এর ফলে শিশুদের কাছে বিনোদন আর ফূর্তি আসক্তির রূপ নেয় এবং এটিই তাদের জীবনের পরম চাওয়া হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ইসলামে জোর দেয়া হয়েছে ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার উপর যা 'ক্ষণিকের জন্য বাঁচো, কাল আমরা থাকবো না' এ জাতীয় অসার দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন মানুষের সত্তাকে এভাবে বর্ণনা করেছে:

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হিদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করো না? এরা বলে:

"জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এ জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।" প্রকৃতপক্ষে, এ ব্যাপারে এদের কোনো জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে। (সুরা জাছিয়া, ৪৫: ২৩-২৪)

ইচ্ছার দাসত্ব থেকে মুক্তি বয়ে আনে আত্মিক প্রশান্তি।

Lau-Tzu, the Founder of Taoism
6th Century BC

প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বিজয় হলো নিজের ওপর বিজয় অর্জন করা (Plato, Greek Philosopher)।

স্বাধীনতা এক মহামূল্যবান উপহার। সত্য ও অসত্যকে অগ্রাহ্য করে কেবল আনন্দ লাভের লক্ষ্যে একে দায়িত্বহীনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। স্বাধীনতা এক মহান আদর্শ। এর মাধ্যমে আমরা সত্য সন্ধানে ব্রতী হতে পারি, সত্যকে অনুসন্ধান এবং অর্জন করতে পারি। মানব জাতির চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো সত্যের অনুসন্ধান, যেটি সুউচ্চ ও মূল্যবান এক লক্ষ্য। যখন স্বাধীনতাকে বিচক্ষণতার সাথে সঠিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করা হয় তখন তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক মহামূল্যবান উপহারে পরিণত হয়। যার ফলে মানুষ নিজ থেকে যা সত্য ও সঠিক তা গ্রহণ করে এবং স্বেচ্ছায় যা কিছু অশুভ ও ধ্বংসাত্মক তাকে পরিহার করে। শিশুদের ভালো অভ্যাস তৈরিতে সহযোগিতা করা প্রয়োজন, যাতে তারা সঠিক পথ বেছে নিতে এবং সত্যকে তাদের চেতনায় সর্বোচ্চ মূল্যমানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সত্য স্বাধীনতার চেয়ে উচ্চে। বিশ্ব জগতের প্রতিটি ব্যবস্থার একটি সীমানা রয়েছে। মানব জাতির স্বাধীনতায়ও থাকতে হবে নৈতিক পথনির্দেশ নির্ধারিত সীমানা; একে হতে হবে সুবিন্যস্ত ও গঠনমূলক। এটি বিশৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক হবে না। সুতরাং বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো বিশুদ্ধ পবিত্র আসমানি কিতাব এবং সকল নবি ও রসুল সা.-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করা।

আমাদের স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ঐশী জ্ঞানের সাথে সাথে মানব প্রকৃতির জ্ঞান[১৯] অর্জনও জরুরি। এ দুটি জ্ঞানের সমন্বয়ই আমাদেরকে ও আমাদের পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী এবং কেবল তিনিই সর্বতোভাবে আমাদের সঠিক পথে পরিচালনার জ্ঞান রাখেন। আর গবেষণা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলার বাণী বুঝতে এবং আমাদের প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব খুঁজে পেতে পারি।

অনেক আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী মত ব্যক্ত করেছেন যে, পরিবার অতীব প্রয়োজনীয় এবং এটি ছাড়া সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি মানব জাতি সভ্যতার সূচনালগ্নে পরিবারের গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে না পারত, তবে

[১৯] Knowledge of Human Nature.

বর্তমানে হয়তো সমাজের অস্তিত্বই টিকে থাকত না। বিভিন্ন মৌলিক মূল্যবোধ যেমন: সততা, বিশ্বাস, জীবন ও সম্পদের প্রতি সম্মান, যৌন নিয়ন্ত্রণ, সমতা এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তি ইত্যাদি হলো মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য মৌলিক অবশ্য পূরণীয় শর্ত। এসব যোগ্যতা ব্যতীত সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর পরিবারেই এ গুণগুলো বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়। মানব জাতির জন্য এ গুণগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আবিষ্কারের জন্য তা মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে না দিয়ে এগুলোকে আমাদের সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাহ) হিসেবে আত্মার গভীরে প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে। মানব জাতিকে দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানব জাতির অস্তিত্বের শুরু থেকেই তাদেরকে আবশ্যিক এ গুণগুলো প্রদান করা হয়েছে।

আর এ কারণেই মানব জাতির পিতা হযরত আদম আ. ও মাতা হাওয়া আ. দুজনকেই এ পবিত্র গুণগুলো শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, যাতে তারা এগুলো তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারেন (এবং পর্যায়ক্রমে সকল মানব সম্প্রদায়কে)। হাবিল ও কাবিলের কাহিনীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জীবনের পবিত্রতা[২০] শিক্ষা দিয়েছেন। ভেবে দেখুন, যদি নবি হযরত আদম আ., হাওয়া আ. এবং তাদের সন্তানগণ হতেন মদ্যপ, মাদকাসক্ত অথবা যৌন আসক্ত, এর ফলে কী হতে পারতো? ওহি হলো জ্ঞানসম্পন্ন পথ প্রদর্শক সদৃশ যা আমাদের ধূ-ধূ মরুভূমিতেও পথ দেখায়; যা ছাড়া মানব জাতি লুপ্ত হয়ে যেত। সঠিকভাবে পরিচালিত স্বাধীনতা জন্ম দেয় সভ্য শিশু এবং সভ্য সমাজ; যারা স্থায়িত্ব পায়, কারণ তাদের থাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, সু-অভ্যাস এবং যথার্থ আচরণ।

বিশ্ব জাহান এক নিখুঁত ব্যবস্থা: কোষ, পরমাণু এবং ছায়াপথ এসবই উচ্চতর ব্যবস্থার উদাহরণ। এসব নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ কাজ করে একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও সীমার মধ্যে। এ সীমার অবজ্ঞা পুরো পদ্ধতিটিকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের দিকে। সৃষ্টিকর্তা এ বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন নির্ভুল ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে। ভারসাম্যের এ ধারণা নিচে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তিনবার এসেছে:

> চন্দ্র ও সূর্য একটি হিসেবের অনুসরণ করছে এবং তারকারাজি ও গাছপালা সব সিজদাবনত। আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং ভারসাম্য কায়েম করেছেন। যাতে করে তোমরা ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করো। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিও না।
>
> (সুরা আর রহমান, ৫৫: ৫-৯)

[২০] Sanctity of Life.

অতএব এই মৌলিক মূল্যবোধকে যেকোনো মূল্যে সংরক্ষণ করতে হবে। মানুষের উচিত নয় জীবনের অপব্যবহার করা; যখন তাদের সামনে সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায় তখন আত্ম হননের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হলেও মৌলিক মূল্যবোধ "জীবনের পবিত্রতা" সংরক্ষণ করতে হয়। মানুষের উচিত নয় অনাচারে লিপ্ত হওয়া যদিও তাই কাঙ্ক্ষিত হয়। জনগণের উচিত নয় মদ্যপ বা মাদকাসক্ত হওয়া; নিজেকে, তাদের পরিবারকে এবং তাদের সমাজকে ধ্বংস করা। প্রাচীনকাল থেকেই ওহির মাধ্যমে মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানব জাতির জ্ঞান সীমিত; ফলে বেশির ভাগ মানুষ পরিবারের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে এবং বৈষম্যমূলক আচরণ, আত্মহত্যা, মদ সেবন, মাদকের অপব্যবহার এবং ব্যভিচারের ফলে সৃষ্ট সমস্যা উপলব্ধি করতে যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ করতে পারে। কাজেই পৃথিবীতে মানব জীবনের শুরু থেকেই ওহির মাধ্যমে সাবধান করা হয়েছে এ সমস্ত অশুভ অনুশীলনের বিরুদ্ধে, যাতে করে মানবতা তার উচ্চতর নৈতিক উৎকর্ষ অনুধাবন করতে পারে।

ধর্মকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে বের করার উদ্দীপনায় তারা নৈতিকতাটাকেই জানালার বাইরে ছুড়ে ফেলেছে

শ্রদ্ধাভাজন লেখক ড. জেরাল্ড এফ ডির্ক্স ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চের প্রাক্তন যাজক, যিনি ১৯৯৩ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, IIIT-এর সেমিনারে যখন জিজ্ঞাসিত হন- "চার্চের শিক্ষাক্রমে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনটির কথা আপনি সবার আগে চিন্তা করবেন"? তিনি জবাব দেন, "মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় বিরাজমান অপেক্ষবাদের রোগ[২১] দূর করতে চাই যা বল্গাহীন বিপজ্জনক হারে পরিবর্তিত হচ্ছে"। মৌলিক ব্যাপারগুলো সর্বদাই অপরিবর্তনীয় ও অক্ষুণ্ন থাকে; তা যুব সমাজের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যায় না। সর্বোপরি, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোও অপরিবর্তনীয়। তাই পরিবারের মতো মৌলিক প্রথাকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও অক্ষুণ্ন রাখতে হবে শহরের আধুনিক ও শিল্পোন্নত পারিবারের বিভাজনকে রোধ করার জন্য। স্বাধীনতার ব্যাপারে পশ্চিমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলিমদের অনেক কিছু শেখার আছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে দমনমূলক ও কর্তৃত্বপূর্ণ ধারণা থেকে মুক্ত হতে

[২১] Disease of Relativism in Values and Morality.

সাহায্য করবে যা তাদের মানসিক ক্রীতদাসে পরিণত করে রেখেছে এবং পশ্চিমা উন্নয়ন ও অগ্রসরতার থেকে অনেক পশ্চাদগামী করে রেখেছে। সভ্যতার নির্মাতা মুসলিমরা হারিয়েছে তাদের বিশ্বদর্শন। যে আদল ও শুরা প্রথা (বিচার ও পরামর্শকের প্রথা) দ্বারা মুসলিম পরিবার ও প্যারেন্টিংসহ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সংহতির মতো প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবার কথা ছিল সেই আদল ও শুরার বদলে সর্বত্র স্থান করে নিয়েছে অত্যাচারী দমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রথাকে সুশৃঙ্খল করতে পশ্চিমাদের প্রয়োজন একটি দর্শন, যেখানে মুসলিম সমাজের প্রয়োজন কঠোর ও দমনমূলক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়- "পশ্চিমা স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করো আর মুসলিমদের ভ্রান্তির শেকল থেকে স্বাধীন করো"। কাজেই উভয় সমাজকেই তাদের চিন্তা ও কাজে ভারসাম্য আনতে হলে একে অন্যের থেকে শিক্ষা নেবার আছে।

রোনাল্ড কেলারের গল্প

সুখের জন্য আমাদের দরকার দৃঢ় ও নির্দিষ্ট মানদণ্ড সম্বলিত স্থিতিশীল একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যবস্থা।

"১৯৫৪ সালে উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের এক গ্রামে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আমি রোমান ক্যাথলিক হিসেবে বেড়ে উঠি। ছেলেবেলায় গির্জা আমাকে দেয় এক আধ্যাত্মিক জগত যা ছিলো সব প্রশ্নের উর্ধ্বে, আমার চারপাশের বাস্তব জগতের চেয়েও বাস্তব। কিন্তু যখন আমি বড় হতে লাগলাম, বিশেষ করে যখন ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম এবং আরো পড়াশুনা করতে লাগলাম, ধর্মের সাথে আমার সম্পর্ক (বিশ্বাস ও কর্মের) ক্রমবর্ধমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

এর একটি কারণ হলো ১৯৬৩ সালের দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলের পর ক্যাথলিক প্রার্থনা বিধি ও রীতিতে আসা বার বার পরিবর্তন-এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, গির্জার কোনো অটল মানদণ্ড নেই। খ্রিস্টিয় যাজকগণ পরস্পরের কাছে এ পুন:পুন: পরিবর্তনকে নমনীয়তা ও ধর্মীয় প্রার্থনা রীতির প্রাসঙ্গিকীকরণ[২২] বলে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু সাধারণ ক্যাথলিকদের কাছে মনে হয় তারা যেন অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। স্রষ্টা পরিবর্তিত হননি, মানবাত্মার মৌলিক প্রয়োজনও অপরিবর্তনীয় এবং নতুন কোনো ওহিও নাযিল হয়নি; তবুও আমরা পরিবর্তনের বার্তা বয়ে আনছি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর সংযোজন করছি, বিয়োজন করছি, ইংরেজি থেকে ল্যাটিনে ভাষান্তর করছি, শেষ পর্যায়ে এনেছি গীটার ও লোকোসঙ্গীত। যাজকরা বুঝিয়েই যাচ্ছেন আর সাধারণ লোক মাথা ঝাঁকাচ্ছে। এ প্রাসঙ্গিকতার খোঁজ[২২] বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে যে, প্রকৃত কথা হচ্ছে সত্য বাণীর তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই"।

Nuh Ha Mim Keller, 2001

[২২] Search for Revelance

কোথায় সন্তানদের বড় করবেন?

একটি কেস স্টাডি: পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তরের কারণে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংঘাত[২৩]

যখন কোনো পরিবার পূর্ব থেকে পশ্চিম অথবা পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তরিত হয়, তখন তারা এক সাংস্কৃতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ এক ভুক্তভোগী পরিবারের কাহিনী তুলে ধরা হলো: তারা যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন শেষে দুটি শিশু সন্তান নিয়ে ফিরে আসে তাদের মুসলিম দেশে।

আমেরিকায় কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিবারটি মধ্যপ্রাচ্যে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তাদের সন্তানরা আরবি ও কুরআন শিখতে পারে। অবতরণের সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরা একটি নতুন দেশের ভিন্ন সভ্যতার অভিঘাতে মুখোমুখি হয় এবং মন্তব্য করে: "ছি! এটি একটি নোংরা জায়গা"!। অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশের পর তারা যাই স্পর্শ করে তাই নোংরা মনে হয়।

বাবা-মা তাদের নিশ্চিত করে যে, অ্যাপার্টমেন্ট পুরোপুরি পরিষ্কার করা হয়েছিল; কিন্তু তারপরও কার্পেট, দেয়াল, সিঁড়ি, বারান্দা কোনো কিছুই আসলে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল না। বড় এক সমস্যা ছিল- আবর্জনা উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকাটা। সুতরাং একমাত্র সমাধান ছিল অ্যাপার্টমেন্টটি নিজেরা পরিষ্কার করে নেয়া।

দ্বিতীয় আঘাতটি হলো, এখানে নির্মাণ সামগ্রী দামী আর কারিগরি দক্ষতা সাধারণ মানের। গোসলখানার দরজা

[২৩] Culture Shock.

পরোপুরি বন্ধ হয় না, টাইলসগুলো অসম এবং পিচ্ছিল, পাইপগুলো চকচকে কিন্তু ছিদ্রযুক্ত, পানির অভাব এবং পানি সরবরাহে অনিয়মের কারণে পানির ট্যাপগুলো থেকে সবসময় ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে। তৃতীয় তলায় পানির চাপ কম, ফলে কোনো একজনকে বালতিতে পানি জমা করে সারারাতের জন্য পানি ধরে রাখতে হয়।

আরেকটি আঘাত ছিল বিদ্যালয়ে শিক্ষাসংক্রান্ত। বেসরকারি স্কুলগুলো ব্যয়বহুল এবং সরকারি স্কুলগুলোর ছিলো বেহাল দশা। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আর শিশুদের রয়েছে আদব-কায়দা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব। বাবা-মা দুজন আদৌ বুঝতে পারছিল না ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে কী লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে!!!

প্রচণ্ড ভিড় এবং রাস্তাঘাট মেরামতের অভাবে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিলো অত্যন্ত ধীর গতির। জনাকীর্ণ স্কুলবাসে যাতায়াত করতে শিশুদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় হয়। অনেকক্ষেত্রে গাড়ি চালানোর চেয়ে হাঁটাই দ্রুততর হয়। কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাওয়া মানে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের ঝুঁকি নেয়ার মতো বড়(!) পরিকল্পনা করতে হয়। গাড়ি চালনার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ দক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় (যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের মতো এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ কৌশলের সম্মুখীন হবার মতো অবস্থা)।

বায়ু দূষণের সাথে যুক্ত হয় শব্দ দূষণ। ছেলে-মেয়েরা হারিয়েছে তাদের একান্তে কিংবা নির্জনে বসবাসের আনন্দ; এমনকি জোরালো শব্দ সারাক্ষণ ঘিরে রাখার ফলে এমনকি বাড়ির ভিতরেও তারা হারিয়েছে মানসিক প্রশান্তি। স্কুলে, রাস্তায় এমনকি তাদের শোবার ঘরেও প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কোলাহল এসে হানা দেয়। নীরবে সময় কাটানোর একমাত্র উপায় হলো পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে যাওয়া।

যেসব পরিবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে (বা পশ্চিম থেকে পূর্বে) স্থানান্তরিত হয় তারা যেসব সাংস্কৃতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয় এটি তার একটি উদাহরণ মাত্র। তবে সবার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমনই হবে- সেটি নয়, প্রত্যেকে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীনও হয় না। এটি যুক্তিযুক্ত নয় যে, পরিবারগুলোকে নিজ নিজ জায়গা তথা পূর্ব বা পশ্চিমেই অবস্থান করা উচিত। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব কিছু আকর্ষণ ও কিছু সমস্যা রয়েছে এবং

প্রত্যেক পরিবারই নিজস্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অনন্য। শিশুদের বসবাসের সর্বোত্তম পরিবেশ কোনটি, এর কোনো সাধারণ নির্দেশক নেই। যেসব পরিবার স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় তাদের অনুধাবন করতে হবে যে, সে স্থানটিকে তাদের সামগ্রিকভাবে নিতে হবে, এর ইতিবাচক দিক যেমন আছে তেমনি এর নেতিবাচক দিকটিও মাথায় রাখতে হবে এবং সেভাবেই পরিবারের জন্য এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। জীবনটা আসলে এক পরীক্ষা!

পশ্চিমা চিন্তার হারিয়ে যাওয়া দুটি ধারণা

লেখক, ড. ত্বাহা আল-আলওয়ানি, ভার্জিনিয়ার IIIT-এর তত্ত্বাবধায়ক, একাধিক আলোচনায় পশ্চিমে কীভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস লুপ্ত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বাস দুটি হচ্ছে- ১) আল্লাহ মহান (*আল্লাহু আক্‌বার*) এবং ২) আল্লাহ সর্বজ্ঞানী (*আল্লাহু আ'লাম*)। প্রথম বিশ্বাস অনুযায়ী, মানবজাতি যখন তাদের কাজকর্মে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে, তখন তারা এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার স্থলে নিজেদেরকে 'প্রভু'[২৪] হিসেবে ঘোষণা করে। মানুষ যখন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিপথগামী হয়ে পড়ে এবং নিজেদেরকে ভুলের উর্ধ্বে ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী মনে করে, তখন তারা নিজ অভিলাষ পূরণের জন্য পরিবার, সমাজ, বিশ্ব ও পরিবেশের প্রতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠতে পারে। জেনে বুঝে অথবা অজান্তে তারা ধ্বংস করে প্রাণি ও উদ্ভিদ জগৎ; দূষিত করে জমিন, সাগর ও বাতাস।

এ ঔদ্ধত্য প্রকৃতি, আকাশ ও মহাশূন্যে বিরাজমান ভারসাম্য ও সুসামঞ্জস্যকে (উদাহরণস্বরূপ ওজন স্তর) ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানব জাতি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে অবমূল্যায়ন করে বলে বাস্তুসংস্থান[২৫] ও পরিবেশের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে- বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, রাসায়নিক দ্রব্য মুক্ত গোশ্‌ত ও শাকসবজি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। এভাবেই সৃষ্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখন মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, এখনো আমরা স্রষ্টার অসীম বিশ্বে এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বিনয়ের সাথে আমাদের স্বীকৃতি দিতেই হবে যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ (আল্লাহু আ'লাম)। একুশ শতকে

[২৪] Gods

[২৫] Ecosystem

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মানুষের বিশাল আবিষ্কার মানব জাতির অনেককে জ্ঞানের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য ও অহংকারী করে তুলেছে। যাহোক, বাস্তবতা হলো- আমরা যত বেশি জানি ততই আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারি; আমরা যতই জানি না কেন তার তুলনায় অনেক বেশিই আমরা জানি না। অন্যের প্রতি বিনয় এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি নম্রতা সম্মানজনক পাণ্ডিত্যের পূর্ব শর্ত। সত্যিকার বা মহান পণ্ডিতগণ তা জানেন। মানুষের উচিত অবিরাম ধারায় জ্ঞানের নতুন দুয়ার উন্মোচন করতে থাকা। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জ্ঞান অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকর্তার এক মহান দান। তিনি আমাদের সমুন্নত করেছেন জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এবং দিয়েছেন এ পৃথিবী ও বিশ্ব।

বিনয়ী হতে হলে সত্যিকার অর্থে মহান হতে হয় আর বিনয় মানুষকে সত্যিকার অর্থেই মহান করে তোলে।

কুরআন জ্ঞানের ব্যাপারে ব্যাপক আলোকপাত করেছে:

> ...তোমরা খুব সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছ।
> (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৮৫)

> তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। (সুরা বাকারা, ২: ২৫৫)

> "বলো, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয়, তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না"। (সুরা আল কাহাফ, ১৮: ১০৯)

ধর্মীয় মূল্যবোধ বনাম কর্তব্যমূলক মূল্যবোধ

পরিবারই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সুতিকাগার (যেমন- সত্য, ন্যায়, ভালোবাসা, দয়া, সততা এবং দায়িত্বশীলতা)। এসব মূল্যবোধের ভিত্তি হলো বিশ্বাস (আকিদাহ), যেখানে মৌলিক মূল্যবোধকে কর্তব্যমূলক নীতির[২৬] ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এ দুটি সবসময়ই যে সুসঙ্গত তা নয়। কোনো কোনো সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দুনিয়ার জীবনের আনন্দ। মুসলমানদের জন্য এ দুনিয়ায় সৎ জীবন-যাপনের মাধ্যমে পরকালীন অনন্ত জীবনে সফলতা লাভই হলো ভারসাম্যপূর্ণ চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পরকালীন

[২৬] Fundamental (Creed) Values Overs Functional Values.

সাফল্য অর্জনের বিষয়টি এ দুনিয়ায় সুন্দর জীবন-যাপনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং দুনিয়াকে অগ্রাহ্য না করেই পরকালীন সাফল্য অর্জন করা যায় এবং করা উচিত। এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকা চিরন্তন জীবন লাভের একটি উপায় মাত্র। রসুল সা. একজন বেদুইনকে উপদেশ দেন যে, তাকে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা রাখতে হবে এবং একই সাথে তাকে অনুসরণ করতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের আইনসমূহ। "তোমার উটগুলো বেঁধে রাখো (যেন তা হারিয়ে না যায়) এবং আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা রাখো (আল্লাহর দয়া প্রার্থনা করো যখন তুমি দূরে থাকো)"। দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন যা হবে নিম্নরূপ:

> **এ পৃথিবীতে নিজের জন্য কাজ করো এমনভাবে যেন তুমি এখানে চিরদিন থাকবে, এবং পরকালের জন্য কাজ করো এমনভাবে যেন তুমি আগামীকালই মৃত্যুবরণ করবে।**
>
> (Abu-Talib, 1996)

ইহুদি ধর্মশাস্ত্র তালমুদ-এর পণ্ডিতগণ বলেন, প্রতিদিন এমনভাবে বাঁচ যেন এটিই তোমার শেষ দিন, কেননা কে জানে এটিই শেষ কি না।

উদাহরণ হিসেবে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বসবাসরত জনগণের অবস্থার তুলনা করা যায়। পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবীদের অধিক সুবিধা পাবার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি করুণ। যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্তব্য নীতিতে (Functional Value) জনগণের কল্যাণকে জোর দেয়া হয়েছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত গভীর মূল্যবোধ ছিল শ্রেণি সংঘর্ষ এবং অন্য শ্রেণির ধ্বংস ও বিনাশ।

পুঁজিবাদী মুনাফাভোগী পশ্চিমা দেশগুলো এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনায় ভালো করেছে। কারণ পশ্চিমা দেশগুলোতে খ্রিস্ট বিশ্বাসের দরুন ভালোবাসা, দান ও দয়ার মতো মৌলিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা ছিল। এ কারণেই এসব দেশগুলোতে দরিদ্র ও অভাবী জনগণ বেশি সেবা লাভ করেছে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের অধীনে সাধারণ জনগণ অধিক পীড়িত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের পতনের একটি বড় কারণ হলো এর দমনমূলক নীতি ও বিশ্বদর্শন। এর আদর্শ গড়ে উঠেছিল সংঘাত, যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও সম্পত্তির অধিকার হরণের ভিত্তিতে। যদিও এসব সরকারের অভিপ্রায় ছিল শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবে মার্কসীয় আদর্শে ঘোষিত

উদ্দেশ্যের বিপরীতে বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণিই সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

সমাজতান্ত্রিক দর্শন ছিল ভাসা ভাসা, অস্বাভাবিক এবং কাল্পনিক। অন্যদিকে, পশ্চিমাদের অবস্থা ছিল এর তুলনায় ভালো। পুঁজিবাদ পৃথিবীতে কোনো স্বপ্নরাজ্যের কাঠামো তুলে ধরেনি। ব্যক্তিগত মালিকানার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এবং স্বার্থপর মুনাফাকারী দর্শনের কারণে এটি শ্রমিক সাধারণের জন্য কিছু কষ্টকর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমের সুদৃঢ় ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং খ্রিস্টিয় দানশীলতা দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির ওপর পুঁজিবাদের সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব দূর করতে কিছুটা সাহায্য করেছে, আর এভাবে শিল্পায়নের কিছু ক্ষতি কমে এসেছে। এর বিপরীতে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দলের উচ্চপদস্থ এলিট শ্রেণি, যারা এক বিশাল আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব লাভের জন্য। আর এ ব্যবস্থায় মূল ভুক্তভোগী ছিল শ্রমিক শ্রেণি। কাজেই একথা অনস্বীকার্য যে, গভীরভাবে প্রোথিত দাতব্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজ ও জনগণের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও পাশ্চাত্যে প্যারেন্টিং-এর ওপর বিপুল গবেষণা ও বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে তারপরও সত্যিকার অর্থে আমাদের এ জ্ঞান খুবই সীমিত। মানুষ কোনো পণ্য নয় যে পণ্যের উৎপাদক এ সম্পর্কে অঢেল জ্ঞান রাখবে। আমরা বিশ্বমণ্ডলের স্রষ্টার সৃষ্টি। কেবলমাত্র আমাদের স্রষ্টা ও পরিকল্পনাকারী আমাদের সম্পর্কে সবকিছু জনেন। মনোবিজ্ঞানী, জেন র‍্যাঙ্কিন, তার 'Parenting Experts:

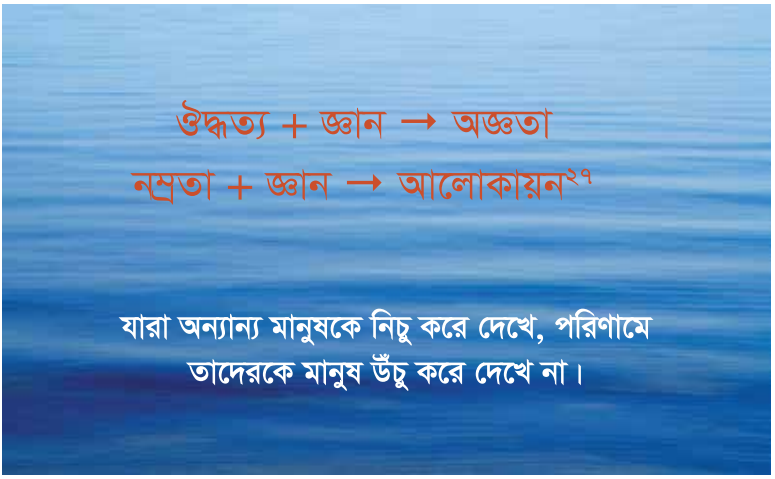

Their Advice, the Research and Getting it Right' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, প্যারেন্টিং বিষয়ক গুরুগণ যা বলছেন আর বিগত ৩০ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যা এসেছে তার মধ্যে এক ফাঁক রয়ে গেছে। শতাব্দির জনপ্রিয় প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞগণ- যেমন: বেঞ্জামিন স্পোক, টি. বেরি ব্রাজেলটন, জেমস ডবসন, পেনেলোপ লিচ, জন রোজম এবং অন্যান্যরা প্যারেন্টিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়- যেমন: প্রহার করা, সীমা নির্ধারণ, কর্মজীবী মা, ডে-কেয়ার সেন্টার, ছোটো-খাটো প্রশিক্ষণ, টেলিভিশন ইত্যাদি বিষয়গুলোতে ভিন্নমত পোষণ করেন। যদিও আমাদের সামাজিক, প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় বিজ্ঞানের সম্ভাব্য সব উপায় উপাদান ব্যবহার করে প্যারেন্টিং-এর ওপর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণাকে উৎসাহিত করা উচিত, আবার মনুষ্য গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমাদের বাস্তববাদী ও বিনয়ী হতে হবে। আমাদের জ্ঞানের বাইরে ওহির জ্ঞান থেকে আমাদের পথ-নির্দেশনা ও বিচক্ষণতা অনুসন্ধান করতে হবে।

[২৭] Arrogance + Knowledge ⟶ Ignorance.
Humbleness+ Knowledge ⟶ Enlightenment.

পরিবারের কৃষি মডেল

পরিবার যখন শস্যক্ষেত: সন্তানরা চারা আর বাবা-মা সেখানে মালী

'Culture' (সংস্কৃতি) শব্দটি 'Cultivation' (চাষ/উন্নতি সাধন) থেকে এসেছে। অনেক দিক দিয়েই শিশুরা ও মানব জাতি বৃক্ষের সমতুল্য। উভয়েরই প্রয়োজন যত্ন, পরিচর্যা এবং সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি ভালো পরিবেশ। উচ্চমাত্রার দূষণযুক্ত এলাকায় কচি নতুন চারার জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ হলো গ্রিন হাউস, যেখানে তারা বাইরের পরিবেশে রোপণের জন্য উপযুক্তভাবে শক্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। রোপণের পরে এসব চারা অন্যদের তুলনায় বড় ও মজবুত হয়ে বেড়ে ওঠে এবং রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে; কারণ তারা গ্রিন হাউসের নিরাপদ পরিবেশে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছে। একইভাবে শিশুদের সুস্থ নৈতিক বিকাশে প্রয়োজন যত্ন ও নিরাপত্তা। "অতঃপর, আমাদের সন্তানরা তাদের যৌবনে সযত্নে পরিচর্যাকৃত চারার মতো বেড়ে ওঠবে" (Psalms, 144: 12)। তেমনি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা একটি শিশু শক্তিমান, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং অধিক অনৈতিকতা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে বৃহত্তর সভ্যতায় বিস্তৃতি লাভ করবে। তবে শিশুরা অবশ্যই চারাগাছের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। গাছপালা অক্রিয় বা অসার, যেখানে শিশুরা ইচ্ছা ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ আর সক্রিয়। আত্ম-উন্নয়নে তাদের নিজেদেরকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে; তাদেরকে জানাতে হবে কীভাবে আচরণকে সংযত করতে হয়। এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের প্রচুর সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। বাবা-মায়েদের জন্য এ সহযোগিতা প্রদানের সর্বোত্তম উপায় হলো ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভালো অভ্যাস তৈরি ও উন্নয়নে সহযোগিতা করা যা ভবিষ্যতে সদাচরণ ও উন্নত গুণাবলিতে পরিণত হবে।

করণীয়

করণীয়- ৮: একুশ শতকের তিনটি প্রধান উদ্বেগ

পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করুন: এ তিনটি প্রধান উদ্বেগের কারণগুলো কী কী এবং কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়?

১৯৯৭ সালে সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেপ গিরারড্যোর স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে উইলিয়াম বাকলে (রক্ষণশীল কলাম লেখক) এবং সিনেটর জর্জ ম্যাক গভার্ন (উদার গণতন্ত্রবাদী) তিনটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়কে চিহ্নিত করেন:

প্রথমত আমেরিকান পরিবারগুলোর অকার্যকারিতা ও বিপর্যয়-যার ফলশ্রুতিতে বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। **দ্বিতীয়ত** পরিবেশের ধ্বংস সাধন-ফলে বিপুল পরিমাণ দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে ভূমিতে, বাতাসে, পানিতে এবং বন-জঙ্গলে। **তৃতীয়ত** মাদকাসক্তি-যা ধ্বংস করছে জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবারগুলোকে।

করণীয়- ৯: ছেলে মেয়েদের ওপর ভালো গুণাবলির প্রয়োগ (বর্ণনানুক্রমে):

ছেলে-মেয়েদের সাথে বসে নিম্নোক্ত প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং প্রত্যেককে একটি ব্যবহারিক পন্থা বলে দিন যাতে সে এ বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ করতে পারে।

শিশুরা হলো ...

বিস্ময়কর, তাদের স্বীকৃতি দিন
বিশ্বাসযোগ্য, তাদের বিশ্বাস করুন
কর্মচঞ্চল, তাদের পরিচালনা করুন
নিরপরাধ, তাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করুন
আনন্দপূর্ণ, তাদের মূল্যায়ন করুন
দয়ালু, তাদের থেকে শিখুন
মনোরম, তাদের সযত্নে লালন করুন
উন্নত চরিত্রের, তাদের শ্রদ্ধা করুন
খোলা মনের, তাদের শিক্ষা দিন
মূল্যবান, তাদের মূল্য দিন
উৎসুক, তাদের উৎসাহ দিন
উদ্ভাবক, তাদের সমর্থন দিন
স্বতঃস্ফূর্ত, তাদের উপভোগ করুন
কর্মদক্ষতা সম্পন্ন, তাদের উন্নয়নে এগিয়ে নিন
অনন্য, তাদের সত্যতা সমর্থন করুন
আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন, তাদের প্রতি মনোযোগী হোন
হাস্যোজ্জ্বল, তাদের সাথে হাসি-তামাশা করুন

(Meiji, 1999)

করণীয়- ১০: ছেলে-মেয়েদের সহিংসতার প্রকৃত কারণ কী তা নিয়ে আলোচনা করা

সন্তানদের সাথে ভয়ংকর ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের তীব্র বেদনাদায়ক গণহত্যার ঘটনা। ১৭/১৮ বছর বয়সী দুজন ছেলে বন্দুক ও বোমা ব্যবহার করে ১৫ জনকে হত্যা করে এবং ২৬ জন আহত হয়। তারা গুলি করতে করতে হাসছিল ঠিক টিভি, সিনেমা ও ভিডিও গেমসের মতো, আর শেষে তারা নিজেদেরও গুলি করে আত্মহত্যা করে। উল্লেখ্য, তারা নিজ বাড়িতে ১৯টি বোমা তৈরি করেছিল। এ ধরনের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে বিরল নয়: পরবর্তী মাসগুলোতে এ ধরনের আরো ২২টি ঘটনা সেখানে ঘটে। আলোচনা করুন- কেন তারা এমনটি করেছিল? এজন্য কে বা করা দায়ী? কীভাবে এর প্রতিকার করা যেতে পারে? ভবিষ্যতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কী করা উচিত? এ থেকে কী শিক্ষা নেয়া যায়? কীভাবে আমরা সহিংসতার প্রকৃত কারণ নির্মূল করতে পারি?

করণীয়- ১১: সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করা

পরিবারের সদস্যদের সাথে ধূমপান, মাদকগ্রহণ, অবৈধ সন্তানগ্রহণ, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা এবং তালাকের কারণ ও প্রভাব জাতীয়-সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন। সমাজ উন্নয়নের বাস্তব পন্থা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করুন।

করণীয়- ১২: আমেরিকায় ড. স্পোক (১৯০৩ - ১৯৯৮) এর প্যারেন্টিং মডেল: কিছু শিক্ষা

"আমি যা বলি তা করো, আমি যা করি তা নয়"!

পরিবারের সঙ্গে একত্রে বসে নিচে বর্ণিত ড. স্পোকের জীবনীর (Maier, Newsweek, 1998) আলোকে প্যারেন্টিং বিষয়ে আপনার নিজ অভিজ্ঞতা আলোচনা করুন।

ইউনাইটেড স্টেটস-এ (US) শিশু প্রতিপালনের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমরা আধুনিক প্যারেন্টিং-এর ওপর ড. বেনজামিন স্পোকের প্রভাবের বিষয়টি আলোচনায় না আনি, যিনি বিশ শতকের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তার মা তাকে ভালোবাসা, অনুশাসন এবং উচ্চাশা দিয়ে বড় করেন। বিয়ের ৫১ বছর পর তিনি তার মাদকাসক্ত স্ত্রীকে তালাক দেন। তিনি

বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, বেশিরভাগ শিশুর সমস্যাই আচরণগত, চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়: খামখেয়ালীপনা, আঙ্গুল চোষা, খাদ্য গ্রহণে আপত্তি, ঘুমে অনীহা এবং নিয়মিত মল-মূত্রত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলায় অক্ষমতা।

মনোবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বাবা-মাকে সন্তানদের জোর-জবরদস্তি না করে বরং তাদের স্নেহে আগলে রাখার পরামর্শ দিতেন। সন্তানদের উৎসাহ দেবার কথা বলতেন, "নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। তোমার যোগ্যতা তোমার ধারণার থেকে অনেক বেশি"। তিনি শিক্ষা দিতেন, বাবা-মায়ের কাছ থেকে শিশুদের যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো 'ভালোবাসা'। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজের সন্তানদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন না, যতটা মনোযোগ দিতেন রোগীদের কথায়।

ড. স্পোকের পরিবার ছিল অকার্যকর। "নিজ সন্তানের সাথে সবসময় সঠিক ব্যবহার করা অনেক কঠিন, শিশু লালন-পালন বিষয়ে কিছু লেখার চেয়ে"। তার স্ত্রী মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন, মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয় এবং পরবর্তী সময়ে হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হয়। বাবা হিসেবে তিনি এতটাই শীতল ছিলেন যে, তার দুছেলে তার কাছে নিজেদেরকে খুব অনাহুত, পরিত্যক্ত মনে করত।

তিনি স্বীকার করেন যে- তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি লেখেন, "অল্প বয়স্ক থাকা অবস্থায় আমি কখনোই আমার দুছেলেকে চুমু খাইনি"। অতীতের সেই ভুল পুষিয়ে নেবার জন্য পরবর্তী সময়ে পরিবারের সবাই একে অন্যকে কোলাকুলি করার প্রথা চালু করেন।

তিনি তার ছেলেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বাবা-মাকে নাম ধরে ডাকতে- যা ছিল বিরল ও আপাতঃদৃষ্টিতে কুসংস্কারমুক্ত বা আলোকিত পদক্ষেপ। বাবা হিসেবে তিনি চাইতেন তার দর্শনের প্রতিফলন এভাবে দেখাতে ও গোটা দুনিয়ার সামনে জাহির করতে যে, "এই আমার ছেলে, যে আমাকে নাম ধরে ডাকে"। তাদেরকে নিজের সমকক্ষ (পূর্ণবয়স্কদের মতো) ভেবে নেয়াটা ছিল অবাস্তব। ড. স্পোক যখন তার ছেলেদের সাথে কথা বলতেন, প্রায়ই তা একটি তথ্যানুসন্ধানের মতো শোনাতো। বাসায় তিনি নিরস বইয়ের মতো কাঠখোট্টা ও রুক্ষস্বরে কথা বলতেন। বাবা হিসেবে এমন আচরণের তিক্ত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তার কোনো ধারণা ছিল না।

তিনি এ ব্যাপারে খুবই দৃঢ় ছিলেন যে, তার ছেলেরা কখনো যেন জন সমক্ষে পরিবারের জন্য মর্যাদাহানিকর ও নিজেদের জন্য বিব্রতকর কোনো কিছু না

করে। বাবা হিসেবে বাইরের কারো মতামত ছিল তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বহিরাগত এবং আগন্তুক সাংবাদিকদের মতামত তার কাছে খুব বড় বিষয় ছিল। তার ছেলেরা ফিটফাট পোশাকে সজ্জিত থাকত এবং তাদেরকে আদেশ করা হতো যাতে সবসময় ভদ্রোচিত আচরণ করতে। জন-এর হাসি যখন ক্ষীণ হয়ে আসত অথবা তাকে বিষণ্ন দেখাতো, বেন ততক্ষণাৎ তাকে তাড়া দিত, "লোকজনের সামনে এভাবে গোমড়ামুখো থেকো না, মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখো"।

ড. স্পোক তার পারিবারিক সমস্যাকে অবহেলা ও অস্বীকার করে যেত। তার দুছেলে পরস্পর থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলতো। তাদের বাবার সাথে মাইক ও জনের যে মতবিরোধ হতো তা ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকত। ছবি তোলার সময় চিত্রগ্রাহক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তারা দক্ষ অভিনয় করত। টিভি ও ম্যাগাজিনের রিপোর্টাররা তাদের বাবার আচরণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে তারা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট জবাব দিতো।

তিনি তার ছেলেদের সামনে কখনোই ভালোবাসা বা সত্যিকার আবেগ প্রকাশ করতেন না। ছেলেরা উল্লেখ করেছে যে: "আমরা কখনোই আমাদের বাবাকে চুমু খাইনি"। ড. স্পোক আসলে একজন মানুষের চেয়ে ব্যক্তিত্ব এবং পিতৃত্বের চেয়ে কর্তৃত্ব আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি ছিলেন উষ্ণতাহীন একজন রূঢ় পিতা; যিনি সন্তানদের মানসিক প্রয়োজনকে এড়িয়ে চলতেন।

ড. স্পোক নিজের বেড়ে ওঠাকেও এর জন্য দায়ী করেন, "আমি কখনোই আমার বাবার কাছ থেকে আবেগ অনুভূতির প্রকাশ দেখিনি (বাবা ও ছেলের মধ্যকার সরাসরি আবেগ)। আমার বাবা আমাকে ভালোবাসতেন, আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু আমার এমন কোনো বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে না যে আমার বাবা আমাকে বা অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের চুমু খেয়েছেন"।

শিক্ষা: বিশেষজ্ঞের তত্ত্বগুলোর অন্ধ অনুসরণ করো না। কারণ এ ধরনের জ্ঞান বিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার সঙ্গে যদি তা সঙ্গতিশীল না হয় তবে তা আমাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি করে।

করণীয়- ১৩: সাংস্কৃতিক সংঘাত বিষয়ক আলোচনা

বাবা-মাকে সন্তানদের সাথে সাংস্কৃতিক সংঘাতের[২৮] নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইতে হবে তাদের অন্য

[২৮] Culture Shock

দেশে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা অথবা অন্য দেশ, ধর্ম (বা বিশ্বাস) বা জাতি থেকে আগত তার স্কুলের বন্ধুদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের মতামত।

যদি শিশুরা কখনো দেশের বাইরে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বেড়াতে না যেয়ে থাকে, তবে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা থাকলে এ ব্যাপারে সুবিধামতো সময়ে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করুন।

করণীয়- ১৪: প্রকৃত নেতাদের মানসিকতা

পরিবারের সদস্যদের সাথে নিচের উদ্ধৃতিগুলো আলোচনা করুন।

"আমি লক্ষ করেছি যে, সবচেয়ে স্বার্থক নেতারা খুব কমই সরকারি অফিসের নায়ক। এরা উচ্চপদস্থ নয়।[২৯] তারা ধৈর্য, সাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পদক্ষেপ নেয় ও যা করা দরকার সেটি করে"। (Badaracco, 2002)

"নেতারা হয়তোবা তাদের অনুকরণকারীদের মধ্যে অন্ধ অনুকরণ মানসিকতার[৩০] বিকাশ ঘটাতে চান, কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য এরকম মানসিকতা মানানসই না"। (Steven B. Sample in *The Contrarian's Guide to Leadership*)

উপসংহার: যেটি ঠিক, সেটি করাই উচিত। যেটি জনপ্রিয় বা সর্বাধিক প্রচলিত সেটি নয়। আলোচনা করুন কে নির্ধারণ করতে পারে কোনটি সঠিক, কেন এবং কীভাবে? এটি কি আমি, তুমি, সে, নাকি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা?

করণীয়- ১৫: পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা

আপনার সন্তানদের সাথে বসুন এবং পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে যা জানেন তা তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

আজকের বেশিরভাগ পরিবার সন্তানদের সাথে পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করে না। শিশুদের তাদের পর দাদা-পর দাদির জীবন, সাফল্য-অসাফল্য, চাকরি, অভিজ্ঞতা, কর্মতৎপরতা এবং শক্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নীনা আব্দুল্লাহ, একজন প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ, তার মক্কেলদের শেখান কীভাবে একটি পরিবার নিয়ে বৃক্ষ ও জেনোগ্রাম আঁকতে হয়। জেনোগ্রাম হলো এক ধরনের

---

[২৯] High-profile Champions of Causes.

[৩০] Herd Mentality (একসাথে পালের মতো নেতাকে অনুসরণ করার মানসিকতা)।

নকশা যা পরিবারের সদস্যদের (যেমন: চাচা, মামা, চাচাতো/মামাতো ভাই-বোন, দাদা-দাদি/নানা-নানিসহ বাবা ও মা উভয়দিকের সদস্যদের) বিবাহ বন্ধন, তালাক, অসুস্থতাসহ তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরে। রসুল সা. পূর্বপুরুষদের গল্প বলা আর যতদূর সম্ভব ব্যক্তির পারিবারিক সূত্রকে মনে রাখার আরব ঐতিহ্যকে উৎসাহিত করতেন (Campo, 2009)। অনেক সোমালিয়ান তাদের বিগত ২০ প্রজন্ম পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের নাম মুখস্থ রাখে এবং তারা প্রায়ই নিজেদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তথ্য অন্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্য গোত্রীয় উৎসবের আয়োজন করে।

তৃতীয় অধ্যায়

সন্তান লালন-পালনের সর্বোত্তম পন্থা: জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ

- সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ: সফল প্যারেন্টিং-এর প্রথম ধাপ **১৩৮**
- মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণ **১৪১**
  কুরআনের আলোকে জীবনের লক্ষ্যসমূহ: ইমানদারদের প্রার্থনা **১৪১**
  হাদিসের আলোকে মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য **১৪৫**
- কফি এবং জীবনের অগ্রাধিকার **১৪৯**
- উপসংহার **১৫০**
- করণীয়: ১৬-২০ **১৫২**

লক্ষ্য মোদের সবল আর উত্তম সন্তান গঠন,
যারা করবে সুস্থ ও সুখী পরিবার স্থাপন,
যারা করবে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠন,
আর বিকাশ ঘটাবে সুস্থ সবল জাতির,
কারিগর এক শান্তিময় পৃথিবীর।

সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ: সফল প্যারেন্টিং-এর প্রথম ধাপ

অভিভাবকদের উচিত খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে প্যারেন্টিং বিষয়টি পরিচালনা করা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা নিজেদের বাৎসরিক ছুটি কাটানোর মতো ব্যাপারেও খুব সতর্কতার সাথে খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করেন; কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবার, তার সফল পরিচালনার জন্য একসাথে বসে পরিকল্পনা করতে ভুলে যান। অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী পরিবারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিবারের চাহিদা কিংবা পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে একমত হতে পারেন না। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য নির্ধারণ না করতে পারলে কোনো সফলতাই অর্জন করা সম্ভব নয়।

পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ছাড়া জীবনকে কাজ, ঘর, বাজার, রান্না, খাওয়া, বেড়ানো, ঘুম, সমস্যার মোকাবেলা, রোগভোগ ইত্যাদি থেকে বিরত রেখে এসব নিয়তির স্রোতে ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ আশা করে যে সন্তানের ভবিষ্যৎ আপনা আপনি ভালো হয়ে যাবে তবে তার উদাহরণ সেই নাবিকের মতো যে জানেই না কোথায় তার গন্তব্য, কোন পথে সেখানে যেতে হবে; শুধু দিনের পর দিন উদ্দেশ্যহীন জাহাজ চালিয়ে যায় আর আশা করতে থাকে যে সে তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এরূপ গন্তব্যহীন যাত্রায় বাবা-মায়েরা সন্তানদের জীবন গড়ে দেবার গুরুত্বপূর্ণ সময়টি নিজেদের অজান্তেই হারিয়ে ফেলেন। বাবা-মাকে মনে রাখতে হবে সন্তান লালন-পালনে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি থাকা আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে, সন্তান লালন-পালনের বিষয়টি অনুধাবন করতে হলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে একে অপরের পরিপূরক এবং একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সৎ, সুদৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া একটি শক্তিশালী সমাজের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। আবার এ ধরনের ব্যক্তিত্ব এমনি এমনি নিজে থেকেই তৈরি হয় না। এরূপ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য সংহতি ও সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা প্রয়োজন। বাবা-মায়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে পারে; যারা হবে উচ্চ নৈতিক মনোবলসম্পন্ন, বিশ্বাসযোগ্য এবং সভ্য নাগরিক; যাদের জীবনের লক্ষ্য হবে গোটা মানবতার উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন। এ ধরনের লক্ষ্য ছাড়া মানব জীবন উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন। ইহকাল-পরকাল, দৈহিক-আত্মিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রকে ঘিরেই মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আবর্তিত হওয়া উচিৎ। আর সন্তান লালন-পালনে বাবা-মা কিংবা অভিভাবকের এটিই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আদর্শ সন্তান পালনে লক্ষ্যমাত্রা টেবিল: লক্ষ্য, মূল্যবোধ, উপায়

প্রথম লক্ষ্য: সুখি পরিবার	দ্বিতীয় ইচ্ছা: সত্যপন্থী নেতৃত্ব তৈরি			
যোগাযোগ দক্ষতা	**শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য ও ফিটনেস**	**ব্যক্তিত্ব, চরিত্র**	**জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস**	**দক্ষতা: পেশাদারিত্ব**
প্রশংসা/সমালোচনা	সঙ্গী নির্বাচন (বিয়ে)	সাহসিকতা	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা	পড়ন
দৃষ্টিভঙ্গি	শিশুর লালন-পালন	ভালোবাসা	বাড়ির অনুশীলন[১]	লিখন
বোধ, অনুভূতি	শিশুকে বুকের দুগ্ধপান করানো	সততা	শিশুদের মানোন্নয়ন	কম্পিউটার দক্ষতা
ধৈর্য /ক্রোধ	ব্রেনের অসাধারণ ক্ষমতা	স্বাধীনতা	উৎসাহদান ও ক্ষমতায়ন	গাড়ি চালনা
আদর-সোহাগ-ভালোবাসা	স্বাস্থ্য	দায়িত্ববোধ	নিয়মানুবর্তিতা বনাম শাস্তিদান	গৃহস্থালি কার্যক্রম
আনন্দ-খুশি, রসিকতা	পুষ্টি	স্বনির্ভরতা	বিশ্বাস	সময় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা
পারস্পরিক সমঝোতা	ব্যায়াম	সৃজনশীলতা	আত্ম-পরিচয়	প্রার্থনা (দোয়া)
পারিবারিক সময়দান	ঘুম	আত্ম-সম্মানবোধ	যৌথ পরিবার[২]	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা
টিভির বিকল্প বিনোদন মাধ্যম	উপভোগ্য যৌনতা	বিশ্বস্ততা		
পারিবারিক সভা	নেশাদ্রব্য বর্জন	সম্মান		
পারিবারিক ভোজ		ধৈর্য		
স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট		বিনম্রতা ও ভদ্রতা		
খেলাধুলা				
সন্তানদের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ				

আসুন, আমরা উপরোক্ত তালিকাটি থেকে শুরু করি। আমরা এ চার্টকে আদর্শ সন্তান পালনে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণী চার্ট বলি। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তার শৈশবকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমরা কী কী লক্ষ্যকে আমাদের সামনে নিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলতে পারি- এটি তার একটি নমুনামাত্র।

মূলত এ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলো কুরআনের (২৫: ৭৪) বিভিন্ন আয়াত যেখানে বাবা-মায়ের গভীর আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এবং মহানবি রসুল সা.-এর হাদিসমালা থেকে নেয়া হয়েছে।

> এবং যারা বলেন, হে আমাদের প্রভু, আমাদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তানদেরকে আমাদের জন্য শান্তির প্রতীক বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো।
>
> (সুরা আল ফুরকান, ২৫: ৭৪)
>
> মানুষ হচ্ছে খনিজ পদার্থ (অথবা ধাতব পদার্থের) ন্যায় (যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে)। জাহেলি যুগে (ইসলামে আগমনের পূর্বে) যেসব লোক সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হতো, তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারলে ইসলামি যুগেও সর্বোত্তম বলে গণ্য হবে"। (বুখারি ও মুসলিম)

[১] Home Work.

[২] Extented Family.

উল্লিখিত তালিকায় মানব জীবনের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটিকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাবা-মা বা অভিভাবকের উচিত হবে এ তালিকা দেখে এর লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের মাঝে সমন্বয় করা, মাঝে মাঝে এগুলো পাঠ-পুন:পাঠ করা, মানসিকভাবে এর সাথে একাত্ম হওয়া, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এগুলো অর্জনের জন্য কলা-কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা। এতে বাবা-মায়েরা ভুলভাবে আত্ম-তুষ্টিতে আক্রান্ত হবেন না; কিংবা তাদের প্রাত্যহিক দৈনন্দিন কাজের চাপে বাবা-মা হিসেবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন থাকবেন না।

মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণ

১.কুরআনের আলোকে জীবনের লক্ষ্যসমূহ: ইমানদারদের প্রার্থনা:

এবং যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী এবং আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (২৫: ৭৪)

অত্র আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মু'মিনদের শিখিয়ে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য চক্ষু শীতলকারী (কুররাতা আ'ইউন) সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে। এ শব্দটি কুরআনে ছয় বার এসেছে। যার অর্থ হলো "চক্ষু শীতলকারী, আমাদের চোখের স্বস্তি, এমন চোখ যা আনন্দময় কিছু দেখে প্রশান্তি লাভ করেছে"। কাজেই বোঝা যায় যে, মু'মিনদের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো একটি সুখীঘর ও পরিবার গঠন। এখানে পরিবার বলতে শুধু মূল পরিবারের কথা বোঝানো হয়নি বরং সম্প্রসারিত পরিবারকেও বোঝানো হয়েছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদির সঙ্গে দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, খালা-খালু,

ফুফা-ফুফু, ফুফাতো- মামাত-খালাত -চাচাতো ভাইবোনেরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটি সুখী পরিবার গঠনের কয়েকটি মূল শর্ত হলো সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের ভালো বুঝা-পড়া, পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা, প্রশংসার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় গঠনতান্ত্রিক সমালোচনা করা। এছাড়া আরো কিছু শর্ত বা উপাদান রয়েছে, যেমন- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, পরস্পরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা, পারস্পরিক যেকোনো বিষয় সুবিবেচনা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা; সন্তানের সাথে আনন্দপূর্ণ সময় কাটানো, তাদের আদর-সোহাগ করা, তাদের চুমু দেয়া, জড়িয়ে ধরা, একসাথে মজা করে খাবার খাওয়া ও আড্ডা দেয়া, টুকটাক দুষ্টুমি-রসিকতা করা, একসাথে ঘরের কাজ করা এবং পরস্পরকে স্বাগত জানানো।

ইমানদাররা স্রষ্টার নিকট তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দ্বিতীয় যে জিনিসটি চায় তা হলো, "আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের নেতা (ইমাম) বানিয়ে দাও"। 'ইমাম' শব্দটির বহুবচন "আ' ইম্মাহ'। 'ইমাম' এবং এর বহুবচন 'আইম্মাহ' শব্দটি পবিত্র কুরআনে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক তাফসিরকারক "আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের নেতা (ইমাম) বানিয়ে দাও" -এ বাক্যটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "আমাদের অন্যদের জন্য নমুনা বানিয়ে দাও, অন্যদের জন্য অনুসরণীয় করে দাও, সত্য ও সঠিক পথের দা'ঈ হিসেবে তৈরি করো, অন্যদের জন্য পথ-প্রদর্শক বানিয়ে দাও, মানবজাতির নেতা বানিয়ে দাও, তাকওয়াবানদের মধ্যে অগ্রগামী বানিয়ে দাও, মানুষের জন্য আদর্শ বানিয়ে দাও, যারা সঠিক পথের অনুসারী তাদের অগ্রদূত বানিয়ে দাও এবং সকলের জন্য অনুসরণীয় এবং নমুনা স্থাপনকারী বানিয়ে দাও"। সুতরাং পরিবারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হবে সন্তানকে সমগ্র মানবজাতির জন্য ধর্মপ্রাণ যোগ্য নেতা ও পথ-প্রদর্শক হিসেবে তৈরি করা।

এখানে নেতৃত্ব বা লিডারশিপ বলতে ক্ষমতালোভী নেতা বোঝানো হয়নি, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শারীরিক শক্তি, মানসিক দৃঢ়তা, নৈতিক উচ্চমান, মূল্যবোধ, তীক্ষ্ণ মেধা ও অন্যান্য নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন করে গড়ে তোলার কথা বুঝানো হয়েছে। 'নেতা' শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা থেকে সাবধান থাকতে হবে, এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে হবে। নেতৃত্ব বলতে যদি ক্ষমতার একটি উচ্চপদকে ধরে নেয়া হয় তাহলে আমাদের সমাজে নেতৃত্ব অর্জনের জন্য যে পারস্পরিক লড়াই এবং একে অপরের সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ

হওয়ার যে নেতিবাচক চর্চা রয়েছে তার সাথে সঠিক নেতৃত্বের বিষয়টি গুলিয়ে যেতে পারে।

সমাজের সবাই যদি নেতৃত্ব পদের জন্য লালায়িত হয়, তাহলে অনুসারি কে হবে? তাই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে- শিশুদের ভিতর আদর্শ নেতৃত্বের গুণাবলি ধারণের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা। আদর্শ নেতা হচ্ছে তারাই যারা সমাজের যেকোনো কাজে অংশগ্রহণ করে এবং সমাজের বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। আর এভাবেই সকলের অংশগ্রহণে একটি সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হয়।

নেতা কারা? তোমরাই নেতা

- আমরাই সেই নেতা যার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করছে।
- নেতৃত্ব মানে নিজে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া নয় বরং গুরুত্বসহকারে দায়িত্ব পালন করা।
- নেতৃত্ব কোনো পদ নেয়া নয় বরং সর্বাবস্থায় অন্যকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা।
- নেতৃত্ব হলো সর্বদা সঠিক কাজটি করা এমনকি যখন স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ দেখছে না।
- সকলেই কারো না কারো নেতা। কেউ তার অধস্তন কর্মচারিদের, কেউ স্বামী-স্ত্রীর, কেউ সন্তানের, অথবা নিজের। আপনিও একজন নেতা!

নেতৃত্বের ধারণাটি আরো স্পষ্ট করা জরুরি। 'নেতৃত্ব' আর 'নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি অর্জন' এক কথা নয়। 'নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলি অর্জন' মানে ক্ষমতা, মর্যাদা, অবস্থান কিংবা অর্থের প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা বোঝায় না। এমনকি কর্তৃত্বপরায়ণ কিংবা নিয়ন্ত্রণের মানসিকতাও বোঝায় না। বরং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। আমরা নেতৃত্ব বলতে যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো- শিশুরা বড় হবে উদারতা, আত্ম-সম্মানবোধ, সংকীর্ণতামুক্ত মন ও বড় লক্ষ্য নিয়ে। তারা সমাজে সক্রিয় ও একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠবে। তারা এমনভাবে গড়ে ওঠবে যাতে অন্য মতের মানুষের সঙ্গে তারা সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে; প্রচণ্ড রকম আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে; এবং কোনোরকম স্বার্থপরতায় সংকীর্ণ হয়ে না পড়ে। যেসব শিশু নিজেদের বিশ্বাস ও পরিচয় নিয়ে সংকোচ বোধ করে তারা সমাজের খুব একটি কাজে আসে না। আমরা যে যুগে ও সমাজে বসবাস

করছি তাতে আমাদের শিশুদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা দরকার। যদি শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হতে না শেখে তবে তারা খুব সহজেই প্রভাবিত ও ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে।

মুসলিম ইতিহাসে নেতা (ক্বা'ঈদ) শব্দটি আসলে ব্যবহার হয়নি বরং নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে:
রা'ই অর্থাৎ মেষপালক, ধর্মযাজক, তত্ত্বাবধায়ক
মুরাব্বি অর্থাৎ প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক
ইমাম অর্থাৎ সর্ব আগের ব্যক্তি, নমুনা স্থাপনকারী
মু'আদ্দিব অর্থাৎ শৃঙ্খলা তৈরিকারক, চরিত্র গঠনকারী
মু'আল্লিম অর্থাৎ শিক্ষক
মুরশিদ অর্থাৎ পরামর্শদাতা বা পথপ্রদর্শক
মুদাররিব অর্থাৎ প্রশিক্ষণদাতা

ইংরেজি পরিভাষায় লিডার, বাংলা পরিভাষায় নেতা এবং আরবি ভাষায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া দরকার। বাংলা পরিভাষায় 'নেতা' বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য-অর্জনে অন্যদের পরিচালিত করেন, তাদের পরামর্শ দেন। কিন্তু আরবি ভাষা 'মুরাব্বি' (শিক্ষক, প্রশিক্ষক) বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিকে যিনি অন্যদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য-অর্জনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষিত করে তোলেন। রসুল সা. উদাহরণ স্বরূপ আমর ইবনুল 'আস ও উবায়দা ইবন আল জাররাহকে সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। অন্যদিকে মুসা ইবন উমাইরকে মদিনায় এবং মুয়াজ ইবন জাবেরকে ইয়েমেন প্রদেশে পাঠিয়েছিলেন রা'ই, মুয়াল্লিম ও মুরাব্বি (মেষপালক হিসেবে, প্রশিক্ষক-শিক্ষক) হিসেবে সেখানে বিচক্ষণ, স্বশিক্ষিত ও আলোকিত মানুষ তৈরি করার জন্য।

হযরত শুয়ায়েব আ., মুসা আ., ইসা আ. এমনকি মহানবি সা. সহ বহু নবি-রসুলই জীবনের শুরুতে মেষপালক ছিলেন। এটি কোনো কার্যকারণ ব্যতিরেকে এমনিতেই ঘটে যাওয়া অকস্মাৎ কোনো ব্যাপার নয়। মেষপালন সংশ্লিষ্ট মেষপালকদের মাঝে এক ধরনের দয়া-মায়া, যত্নশীলতা এবং গভীর মমত্ববোধ তৈরি করে। এ গুণসমূহ সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রেও মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়। একজন মেষপালক আর একজন সন্তান লালন-পালনকারী

বাবা-মায়ের কাজে কি অপূর্ব মিল! কাজেই একজন নেতা আসলে একজন মেষপালক, একজন পথ-প্রদর্শক এবং একজন আদর্শ শিক্ষক।

একজন নেতা, না একজন মেষপালক!

বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে লিডার (আরবিতে ক্বা'ঈদ) শব্দটি ব্যবহৃত হলেও কুরআন-হাদিসে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বরং একটি হাদিসে মেষপালক (ইংরেজিতে শেফার্ড) শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

তোমাদের প্রত্যেকেই মেষপালক এবং তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। একজন শাসক (ইমাম) তার অধীনস্থ প্রজাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল, একজন বিবাহিত নারী তার স্বামীর সংসারে সকল বিষয়ের প্রতি দায়িত্বশীল, একজন ভৃত্য তার মালিকের যে জিনিসপত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত সেসবের প্রতি দায়িত্বশীল, একজন ব্যক্তি তার বাবা-মায়ের সম্পদের প্রতি দায়িত্বশীল। আর এভাবে তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের অধীনস্থ ব্যক্তি ও সম্পদের প্রতি দায়িত্বশীল।[৩] (বুখারি)

২. হাদিসের আলোকে মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

> "মানুষ হচ্ছে খনিজ অথবা ধাতব পদার্থের ন্যায়। ইসলাম আগমন-পূর্ব যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ও মেনে নিয়েছে তারা ইসলাম আগমন পরবর্তী যুগেও শ্রেষ্ঠ"। (বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিসে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত শৈশবকালেই একজনের চরিত্র গঠনের কাজটি সম্পন্ন হওয়া দরকার। এটি মুসলিম, অমুসলিম সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। সাহসিকতা, সৃষ্টিশীলতা, সততা, ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা এসব চারিত্রিক গুণাবলি

[৩] এখানে Shepherds শব্দের অর্থ করা হয়েছে মেষপালক ও দায়িত্বশীল।

ইসলাম-আগমন পূর্ববর্তী যুগেও মানুষের মাঝে বিদ্যমান ছিল এবং এর যথেষ্ট কদরও ছিল। আর মানুষের মাঝে তারাই উত্তম হিসেবে বিবেচিত ছিল যারা এসকল চারিত্রিক গুণাবলিতে গুণান্বিত ছিল। ইসলাম এসব বিদ্যমান গুণাবলির সাথে সমন্বয় ঘটিয়েছে বিশ্বাস, বিচক্ষণতা, জ্ঞান এবং সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশনা। মহানবি সা. আসলে আমাদের বলেছেন যে, সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান পৌত্তলিকও উত্তম চরিত্রবান মুসলিমে পরিণত হতে পারে যদি সে ইসলামকে জানে, হৃদয়ঙ্গম করে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলে।

অনেক মুসলমান ভাবেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ-এর মতো শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের সাহসিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততা তৈরি হয়েছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই তারা সাহসী, সৎ এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। ইসলামে আগমনের পর শুধুমাত্র তাদের পূর্ব থেকে বিদ্যমান উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির সাথে বিচক্ষণতা, জ্ঞান এবং সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশনার সমন্বয় হয়েছে।

এ হাদিসটি কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করে। কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ইমানদার ব্যক্তিদের মাঝে প্রতিফলিত হতে হবে, যেমন: দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্য (বিশেষ করে নারীদের গর্ভাবস্থায় ও দুধ পান করানোর সময়)। মদ, ক্ষতিকর ওষুধ, ধূমপান এবং অনৈতিক (বিবাহ বহির্ভূত) দৈহিক মিলন যা মা এবং সন্তান উভয়ের জন্য ক্ষতিকর তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সন্তানসম্ভবা মায়েদের উচিত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে থেকে ওষুধ গ্রহণ না করা। এছাড়াও তাদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার ও ঘুমের দরকার রয়েছে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি অণুজীবের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আমরা মূলত সাহসিকতা, সততা, সৃজনশীলতা, যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি গুণাবলি বা চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য শিশুদের মাঝে গড়ে তুলতে চাই। এসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তৈরির সময় ও সুযোগটা খুব সীমিত। তাই একটি শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচ বছর সময়কে কাজে লাগানো জরুরি। এসব গুণের পাশাপাশি সন্তানদেরকে ধাপে ধাপে পড়তে,

লিখতে, কথা বলতে, নিজের কাজ করতে, সাঁতার কাটতে, কম্পিউটার চালানো ও গাড়ি চালানো শেখাতে হবে। ছোটো বয়সেই তাকে ধৈর্য, অন্যের প্রতি সম্মানবোধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা দিতে হবে। যত কম বয়সের মধ্যে শিশুকে এসব গুণাবলির শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে পরবর্তী জীবনে এর বিকাশ তত সুন্দর হবে। এসব গুণ শিশুর ভবিষ্যতের নানামুখী সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা. শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের নিকটই এক বাক্যে একজন বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও এগুলো তার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। কুরআনে এসব গুণাবলির ওপর বেশ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআনে হযরত নুহ আ., ইউনুস আ., ইবরাহিম আ., ইসমাইল আ., মুসা আ., ইসা আ., ইয়াকুব আ., ইউসুফ আ., আইয়ুব আ.-সহ সকল নবি-রসুলের মধ্যে এসব গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- মুসা আ.-কে সম্বোধন করা হয়েছে "শক্তিশালী ও বিশ্বাসী" হিসেবে। ইউনুস আ. নিজেকে বলতেন,"যোগ্য, দক্ষ ও বিশ্বস্ত" হিসেবে। এসব বর্ণনাই নেতৃত্বের গুণাবলি নির্দেশ করে- যেমন, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, পেশাদারিত্ব (উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা), এবং বিশ্বস্ততা। এক কথায়, যে ২৫ জন নবি রসুলের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সৎ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, মানবতাবাদী, শক্তিশালী, বিশ্বস্ত, ধৈর্যশীল এবং ওয়াদা পালনকারী। আমাদেরকে সন্তান লালন-পালনের সময় এসব মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুব গুরুত্বের সাথে সন্তানের মাঝে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো এ বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক

> স্মরণ করো, এ কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে ইসমাইল আ.-এর কথা, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সে ছিল রসুল, নবি।
>
> (সুরা মারিয়াম, ১৯: ৫৪)

> ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও জ্ঞানবান। (সুরা ইউসুফ, ১২: ৫৫)

যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাকে হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও জ্ঞান দান করলাম; এভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(সুরা আল কাসাস, ২৮: ১৪)

তাদের একজন বলল, হে পিতা, আপনি একে চাকরিতে নিযুক্ত করুন, কর্মচারী হিসেবে সেই উত্তম হবে যে শক্তিশালী ও আমানতদার।

(সুরা আল কাসাস, ২৮: ২৬)

আর তাদের নবি তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তালুতকে তোমাদের রাজা সাব্যস্ত করেছেন। একথা শুনে তারা বলল, সে কেমন করে আমাদের ওপর শাসন করার ক্ষমতা পেল? রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার অধিকারতো তার চেয়ে আমাদের বেশি। আমাদের ওপর তার রাজত্ব কীরূপে হবে, যখন আমরা সে অপেক্ষা রাজত্বের অধিকতর হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি, সে সম্পদশালী ব্যক্তি নয়"। নবি জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং তাকে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় যোগ্যতা ব্যাপক হারে দান করেছেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে রাজ্য দান করার ইখতিয়ার রাখেন। তিনি অনুগ্রহ দানকারী এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞানসীমার মধ্যে রয়েছে। (সুরা বাকারা, ২: ২৪৭)

অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের কাছে একজন রসুল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আত তওবা, ৯: ১২৮)

কফি এবং জীবনের অগ্রাধিকার

এক অভিভাবক তার সন্তানদের সামনে একটি বড় খালি পাত্র নিলেন এবং বড় বড় গলফ বল দিয়ে পূরণ করলেন। এবার তিনি তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, "পাত্রটি কি পূর্ণ?" তারা বলল, "হ্যাঁ পূর্ণ।"

এবারে তিনি পাত্রটিতে কিছু ছোটো নুড়ি পাথর ঢাললেন, এবং হালকা ঝাঁকুনি দিলেন। এতে নুড়িগুলো বলের ফাঁকফোঁকর দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। তিনি সন্তানদের কাছে আবার জানতে চাইলেন যে, "পাত্রটি কি পূর্ণ"? সন্তানরা বলল, "হ্যাঁ পূর্ণ"। তিনি এবার এক বাটি বালি নিয়ে পাত্রের ভিতরে ঢেলে দিলেন এবং তাও পাত্রের ভিতরে ঢুকে পাত্র পূর্ণ করে দিল। আবার তিনি সন্তানদের কাছে জানতে চাইলেন যে, "পাত্রটি এবার পূর্ণ হয়েছে কিনা"? সন্তানরা বলল, "হ্যাঁ এবার এটি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে"। এ পর্যায়ে তিনি দুকাপ কফি এর মধ্যে ঢেলে দিলেন এবং এ কফিও পাত্রের বালুকণার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে জায়গা করে নিলো। এ দৃশ্য দেখে শিশুরা হাসতে শুরু করলো।

এবার বাবা বললেন, "এ পাত্রটিকে তোমরা তোমাদের জীবন মনে করো। গলফ বলগুলো হলো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ- ইবাদত, ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী, সন্তান, স্বাস্থ্য, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয় শখ ইত্যাদি। এগুলো জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সবকিছু হারিয়ে গেলেও যদি শুধু এগুলো থাকে তবে এগুলোই তোমার জীবনকে পূর্ণ রাখবে। নুড়ি পাথর কণাগুলো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য উপাদান- যেমন: চাকরি-বাকরি, ঘরবাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি। আর বালুকণাগুলো হলো জীবনের অন্যান্য ছোটোখাটো বিষয়সমূহ।

যদি তুমি তোমার পাত্রটি বালুকণা দিয়ে আগে ভরে ফেলো তবে পাত্রের মাঝে গলফ বল কিংবা নুড়ি পাথর কণার জায়গা হবে না। জীবনের জন্যও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। ছোটোখাটো বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যদি জীবনের সময়গুলো পূর্ণ করো, তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য জীবন থেকে সময় বের করতে পারবে না। কাজেই সেসব জিনিস বা কাজের প্রতি গুরুত্ব দাও যা তোমাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সুখে রাখবে। বেশি বেশি ইবাদত

করো, বেশি বেশি দান করো। সন্তান ও পরিবারে সময় দিয়ে আনন্দ করো। নিজের শরীরের যত্ন নাও। তোমার সঙ্গীকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে খেতে যাও, আনন্দময় সময় কাটাও। পড়াশোনার জন্য সময় বের করো। এসব কাজ অগ্রধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার পর অন্যান্য কাজের সময় বের করা যাবে।

"প্রথমে জীবনের গলফ বলগুলোর যত্ন নাও, কেননা জীবনের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো আগে সাজিয়ে নাও। বাকিগুলো তো সবই বালুকণা"।

সন্তানদের একজন জানতে চাইলো, "সবশেষে কফি দিয়ে কী বুঝানো হলো, বাবা?" বাবা হেসে বললেন, "আমি খুশি হলাম যে তুমি জানতে চেয়েছো। এর অর্থ হলো, তোমার জীবন যতই পরিপূর্ণই হোক না কেন সর্বদাই সেখানে বন্ধুর সাথে বসে এক কাপ চা খাবার সময় থেকে যাবে"।

উপসংহার

মূল উদ্দেশ্যের প্রতি নজর দেয়া

যদিও এ অধ্যায়ে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, কেবল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেই সব কাজ শেষ। লক্ষ্য নির্ধারণ মূল উদ্দেশ্য অর্জনের পথে হাতিয়ার মাত্র। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমাদের সন্তানদের সততা ও দক্ষতাসহ গড়ে তোলা। আমরা যদি এ বোধটুকু মনে রেখে চলি তবে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে সন্তান লালন-পালনের ওপর এবং তাদের চরিত্রের ওপর যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হবে।

শিশুদের জন্য জীবনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পূর্বে অভিভাবকদের নিজস্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের প্রয়োজন হবে:

১. উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ক্ষমতায়নের সাথে শিশুদের জন্য যথাযথ ভারসাম্যপূর্ণ শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে।

২. যে উপদেশ আমরা অন্যকে দেই তা আমাদের জীবনে আমলের চেষ্টা করতে হবে। অজুহাত না দেখিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে;

৩. এর সাথে সাথে গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাইতে হবে। সৃষ্টিকর্তা মানুষের একান্ত চাওয়ার প্রতি সাড়া দেন তাঁর নিজস্ব নিয়মানুযায়ী এবং নিজস্ব সময়ানুসারে।

শিশুপালন বিষয়ে বাইবেলের ভাষ্য

> যে পথের পথিক বানাতে চাও একজন শিশুকে সেভাবেই প্রশিক্ষণ দাও, যাতে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সেই পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। (Proverbs, 22: 6)

এ বিশ্বের ভবিষ্যৎ এবং তার নিরাপত্তা নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। পরবর্তী প্রজন্ম বিনির্মাণে প্যারেন্টিং-এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানবতা ইতোমধ্যেই নানা হুমকির সম্মুখীন। কাজেই প্যারেন্টিং-এ দক্ষতা অর্জন এবং তা বাস্তবায়নের ওপর আমাদের জোর দেয়া আবশ্যক। আজ যদি শিশুদের সঠিক শিক্ষা দেয়া হয়, তারা তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের সেই মূল্যবোধের শিক্ষা দেবে। এভাবে আবহমানকাল ধরে চলমান একটি শুভচক্রের শুরু হবে। এ চক্রই কেবল আনতে পারে বিশ্বের শান্তি, ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতা। বছরের হিসেবে জীবনের পরিমাপ হয় না, বরং সেই বছরগুলোকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারলাম সেটিই আমাদের আসল জীবন!

করণীয়

করণীয়- ১৬: বাড়ির পরিবেশ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা

পরিবারের সদস্যদের বলুন যেন তারা একে অপরকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে।

যখন আপনি বাড়িতে প্রবেশ করেন তখন কি আপনি আনন্দ অনুভব করেন?

বাড়ি থেকে বের হতে পারলে কি আপনি স্বস্তি পান?

বাড়ির পরিবেশকে আরো আনন্দঘন করার জন্য আপনি কী ভূমিকা পালন করতে পারেন?

বাড়ির পরিবেশকে সুন্দর করার জন্য কী দরকার সে সম্পর্কে সকল সদস্যের কাছ থেকে একটি করে পরামর্শ জানতে চান।

করণীয়- ১৭: আপনার সন্তানদের শিক্ষা দিন

নিচের বিষয়গুলো লক্ষ করুন, এগুলো কীভাবে আপনার সন্তানদের শেখানো যায় তা আলোচনা করুন। যে বিষয়গুলো আপনার সন্তানের মধ্যে অনুপস্থিত আছে তা শেখানোর ব্যবস্থা করুন।

- তাদের পছন্দের ফুলগাছ লাগাতে শেখান (শিশুরা মাটি, পানি নিয়ে খেলতে ও মাটি খুরাখুরি পছন্দ করে);
- আবর্জনা কীভাবে কোথায় ফেলতে হয় শেখান;
- প্রয়োজনে আপনাকে কীভাবে ফোন করতে হবে শেখান;
- বিপদে কীভাবে সাহায্য পেতে হবে শেখান;
- ধার নেয়া জিনিস কীভাবে ফেরত দিতে হয় শেখান;
- অন্যকে ধন্যবাদ জানানো শেখান;
- অন্যকে কষ্ট না দেয়া শেখান;
- পশু-পাখি বা অন্য প্রাণীকে ভয় না পাওয়া, বরং তাদেরকে ভালোবাসতে শেখান;

- নিজস্ব জিনিসপত্রের যত্ন নিতে ও পরিষ্কার করতে শেখান;
- সঠিকভাবে কথা বলতে শেখান;
- শেয়ার ও কেয়ার (Share and Care) শেখান: শেয়ার করতে শিখলে যেকোনো আনন্দ দ্বিগুণ হয় এবং যেকোনো কষ্ট অর্ধেক কমে যায়;
- কর্তৃপক্ষকে বা বড়দের শ্রদ্ধা করা শেখান; ভয় করতে নয়।
- সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের ও স্তরের শিশুদের সাথে মিশতে শেখান;
- নতুন জিনিসকে ভয় না পেতে শেখান, সতর্কতা অবলম্বন করতে শেখান;
- কীভাবে হেরে গেলেও সাহস না হারাতে হয় শেখান;
- কীভাবে জয়ী হতে হয়, জয়কে আলিঙ্গন করতে হয় শেখান;
- কোনো কিছুতে শ্রেষ্ঠ না হলেও সেটি কীভাবে উপভোগ করতে হবে শেখান;
- কোনো কঠিন বিপদে পড়লে সেটি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং স্রষ্টার সাহায্য কামনা করতে হবে শেখান;
- কোনো কিছু কেনার পূর্বে তার মূল্য যাচাই করতে শেখান, সংযমী হতে শেখান;
- নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই পরিষ্কার করতে ও ভাজ করতে শেখান;
- বইয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখান;
- সময়মত কোথাও যেতে শেখান, দেরি হলে ফোন অথবা মেসেজ করে তা জানিয়ে দিতে শেখান;
- পোশাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন ও দুরস্ত থাকতে শেখান।

বাবা-মায়ের জন্য আবশ্যকভাবে অনুসরণীয়

- কখনো শিশুদেরকে এভাবে বলবেন না যে, "এই কাঁদবে না"; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করুন কেন সে কাঁদছে।
- আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে থাকলেও, শিশুদের সকল চাওয়া পূরণ করা যাবে না; যা চায় তাই কিনে দেয়া যাবে না।
- শিশুদের ভুল সমালোচনা করা যাবে না, বরং তাদেরকে বার বার চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে; তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন চেষ্টায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে।

- শিশুদের ওপর বিশ্বাস রাখুন।
- শিশুদের সামনে স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো দুর্নাম বা মারামারি কিংবা ঝগড়া করবেন না।
- শিশুদের নিজস্ব রুমে টেলিভিশন বা কম্পিউটার রাখা উচিত হবে না।
- শিশুকে শান্ত রাখার দায়িত্ব টেলিভিশনের ওপর দেয়া যাবে না।

করণীয়- ১৮: প্রবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

সমাজে যে প্রবাদ বাক্যগুলো প্রচলিত তা নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করুন। যেগুলো কোনো বার্তা বহন করে না বা যেগুলো নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাদেরকে দিতে হবে; কারণ এতে তাদের ভিতর সুবিবেচনাবোধ, বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতা ও পরিশীলিত বোধ জন্মলাভ করবে। যেমন: কয়েকটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে-

- 'কর অথবা মর', 'এসপার ওসপার' জাতীয় প্রবাদ তাদেরকে যুক্তিসহ খণ্ডন করা শেখাতে হবে। কারণ এসবের মাধ্যমে এক ধরনের আক্রমণাত্মক ও মারমুখী আচরণ তাদের ভিতর গড়ে ওঠতে পারে।
- ভালোবাসো অথবা ঘৃণা করো- এটি বকধার্মিকতা শেখায়।
- চাচা আপন প্রাণ বাঁচা- এটি স্বার্থপর করে তোলে।
- নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা- এটি অবিবেচক করে তোলে।
- যেমন কুকুর তেমন মুগুর - এটি মারমুখী ভাবের জন্ম দেয়।

করণীয়- ১৯: বন্ধুত্বের প্রকৃত দর্শন

নিচের হাদিসটি শিশুদের শেখান। তারপর কিছু গল্প বা ঘটনা বলুন যেখানে বন্ধু নির্বাচনের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করা হয়নি এবং পরবর্তী সময়ে সেই বন্ধুত্ব ভুল বা অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। এসব বিষয় থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় তাদের সামনে তুলে ধরুন।

রসুল সা. বলেন, "এমন কিছু মানুষ রয়েছে যাদের আমলের কারণে স্বয়ং রসুল সা. এবং শহিদেরাও ঈর্ষা করবেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রসুল সা., কারা সেই ব্যক্তি? রসুল সা. বললেন, এমন ব্যক্তি যারা একে অপরকে ভালোবাসত নিজেদের আত্মীয়তা কিংবা অর্থ-সম্পদের লোভে নয় বরং শুধুমাত্র

আল্লাহ তা'আলার জন্য। তারা কিয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল থাকবে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং কোনো কষ্টও থাকবে না, যখন অন্যরা ভীত থাকবে এবং কষ্ট পাবে। এরপর তিনি এ হাদিসটি পাঠ করলেন- "যারা আল্লাহ তা'আলার খুবই নিকটবর্তী, তাদের কোনো ভয় থাকবে না, না তারা চিন্তান্বিত হবে" (আবু দাউদ)।

করণীয়- ২০: শান্তিপূর্ণভাবে পরিবারে যে বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচিত হওয়া উচিত

- প্রতিমাসে একবার হলেও পরিবারের সকলে মিলে বসে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।
- এ ধরনের আলোচনা করার সময় রাগারাগি কিংবা উত্তেজিত হওয়া যাবে না। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে আলোচনা উত্তপ্ত না হয়ে যায় এবং কেউই বাড়তি চাপ বা শঙ্কায় না পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য: শিশুদেরকে এরূপে গড়ে তোলা, যেন তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে

- ভূমিকা **১৫৮**
- বর্তমান যুগে শিশুদের মনে বিশ্বাস স্থাপনের কিছু উপায় **১৫৯**
- আত্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি-সামাজিক-অংশীদারমূলক কাজের প্রতি অনীহা **১৬০**
- নিজ দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা **১৬৬**
- বিকৃত সংস্কৃতি: পশ্চাদমুখিতা ও কুসংস্কার **১৬৮**
- ভারসাম্যপূর্ণ পথ: বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ **১৭১**
- শিশুদের মনে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি **১৭৩**
- দোয়ার শিক্ষা প্রদান: সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার স্মরণ **১৭৭**
- তাওবার (অনুশোচনা) শিক্ষাদান **১৭৮**
- রসুল সা. ও অন্যান্য নবিদের সম্পর্কে শিক্ষাদান **১৭৯**
- শিশুদের আদব শিক্ষা **১৮০**
- কোনটা আগে শেখাবেন- তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে নাকি আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসেন? **১৮১**
- করণীয়: ২১-২৫ **১৮৫**

ভূমিকা

আগের অধ্যায়ে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব লক্ষ্যের পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস। যেসব শিশু আল্লাহ সম্পর্কে কেবল বাহ্যিক ধারণা রাখে তাদের থেকে যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর ব্যাপারে সচেতন তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি সচেতনতা বা তাকওয়াই মূলত সকল উত্তম গুণ ও জীবনে সফলতার উৎস।

আমাদের মনে রাখতে হবে আপনা আপনি আমাদের সন্তানদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার শিক্ষা প্রবেশ করবে না। তাছাড়া আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে অবিরত 'ভারসাম্যহীন যৌক্তিকতা' (Unbalanced Rationalism) প্রমোট করা হচ্ছে; জীবনের সকল অধ্যায় থেকে আল্লাহ তা'আলার বিধানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও স্রষ্টা ও ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি বিরূপও)। এসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং শিশুদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিশ্বাস ও ভালোবাসা তৈরির কাজে নিজেদেরই ভূমিকা রাখতে হবে। সময় সীমিত; তাই আমাদের উচিত নিজেদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করা ও কাজের শিডিউল সেই অনুযায়ী সাজানো। ভবিষ্যতে করব বা কেউ আমাদের হয়ে কাজগুলো করে দেবে এমনটি আশা করে বসে থাকা ঠিক নয়।

বর্তমান যুগে শিশুদের মনে বিশ্বাস স্থাপনের কিছু উপায়

আমাদের কী করা উচিত সেটি নিরীক্ষা করার আগে
দেখা যাক আমাদের পরিবারগুলোতে কী ঘটছে

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কেবল আনুষ্ঠানিকতা ও কিছু শরিআতের বিধি-বিধানকে ইসলাম মনে করার যে ভুল সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তার প্রতিফলন মুসলিম শিশু প্রতিপালনের ওপর পড়ছে। বর্তমানে যে প্রধান ধর্মীয় সংস্কৃতি বিরাজ করছে তাতে জীবনটাকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা ইবাদত এবং পারস্পরিক লেনদেন বা মুআ'মালাত। ইবাদতকে শুধু কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ করার বাবা-মায়েদের এ খর্বিত ধারণার প্রতিফলন তাদের প্যারেন্টিং-এর ওপর বর্তায়। তারা ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে সন্তানদের শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদত যেমন: ওযু-গোসল, দিনে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, রমাদানের সাওম এবং গরিবদের যাকাত দেয়া- এসবের শিক্ষা দেন। এ আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধারণা সামাজিক সম্পর্ক ও কার্যাবলি (অর্থাৎ মু'আমালাতকে) যেমন: বিবাহ বন্ধন (যাওয়াজ), ব্যবসায়িক বন্ধন (উক্কুদ), ব্যক্তিগত নৈতিকতা (আদব) এবং কালিমার মুখস্থকরণ ইত্যাদিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আর এভাবেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা পালনকেই ইমান চর্চার সঠিক উপায় মনে করা হয়।

বেশিরভাগ পরিবারগুলো শিশুদেরকে এসব বাঁধা-ধরা আনুষ্ঠানিকতা ও নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্বের বাইরে সাধারণ মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ শেখায় না। শিশুদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের দিকে তাদের নজর এতটাই নিবদ্ধ হয়ে যায় যে সমাজের প্রতি, মুসলিম উম্মাহর প্রতি শিশুদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেখানোর বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। শিশুরা শুধু সালাত আর কুরআন পড়তে পারলেই

বাবা-মা সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এতেই তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে মনে করে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। এর ফলে শিশুদের চিন্তা-চেতনা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং শিশুরা এ ভুল ধারণা নিয়ে বড় হতে থাকে যে, শুধু ব্যক্তিগত আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো পালন করাই হচ্ছে ধর্মীয় জীবনের মূল কাজ- এসব ইবাদত ঠিকভাবে করলেই আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়-দায়িত্ব সব পালন হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে একধরনের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গির তৈরি হয় এবং সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তাদের এ অনীহা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ক্ষতিকর ফল বয়ে আনে- তাদের সামাজিক জীবন ও সমাজ দুটোই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। পরিণতিতে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হই।

প্রকৃতপক্ষে, ইবাদত বলতে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করাকেই বোঝায় না বরং ইসলামি মত অনুযায়ী শরিআহ নির্ধারিত সকল দায়-দায়িত্ব পালনও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যেমন: ন্যায় ও সত্যের প্রচার, অন্যায় ও অকল্যাণ পরিহার, জনকল্যাণে অংশগ্রহণ, পরোপকার- এসবও ইবাদতের অন্তর্গত। আর এ গুণাবলি যদি শিশুদের মনের তন্ত্রীতে (উইজদান) গেঁথে দেয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যতে এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সন্তানদের মধ্যেও প্রবেশ করবে এবং চক্রাকারে তা চলতেই থাকবে। ধর্মীয় শিক্ষার এটি একটি বড় ভারসাম্যহীনতা ও খুঁত রয়েই যাচ্ছে যাতে ইবাদত হিসেবে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, এগুলোকেই ধর্মীয় লক্ষ্য মনে করে পালন করার ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকে পড়া হচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতার বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করা হচ্ছে। ইবাদত শব্দটি মূলত 'জিকির' কে নির্দেশ করে। যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সমাজে সত্যবাদিতা, নৈতিকতা ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করা।

আত্মকেন্দ্রিকতার সংস্কৃতি: সামাজিক দায়িত্বের প্রতি অনীহা

দুর্ভাগ্যজনক যে, মুসলিম স্কলার-চিন্তাবিদ ও দুর্নীতিপরায়ণ-অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব, মেরুকরণ, বিরোধ ও বিভক্তি ছিল। এর ফলস্বরূপ মুসলিম চিন্তাবিদ ও আইনবিদগণ বাধ্য হন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়গুলো থেকে নিজেদের গবেষণা গুটিয়ে নিতে। ফলে তাদের গবেষণা ও আইন বা ফিকহ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়াবলীর মধ্যে। যার ফলে

সামাজিক কাজ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, পরামর্শ, নাগরিক দায়িত্ব, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা ন্যায়বিচার- ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। এভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি রূপান্তরিত ও সংকুচিত হয়ে যায়। আর সামাজিক বিষয়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তা পুরো মুসলিম জাতির টিম স্পিরিট বা দলবদ্ধ মানসিকতার ওপর প্রভাব ফেলছে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিকে করেছে দুর্বল। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার মানসিকতা বা আত্মমুক্তি সুলভ সংকীর্ণ মানসিকতা দিয়ে কোনো জাতি বা সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না; বরং সমাজ ও জনমানুষ সম্পর্কিত সচেতনতা জাতি এবং সভ্যতা উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি। আমাদের প্রতি প্রদত্ত 'ইসতিখলাফ' বা খিলাফতের দায়িত্ব পালনের প্রধান উপায় হলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি করার মিশনকে জারি রাখা ও এমন সভ্যতা (ইমরান) তৈরি করা যার লক্ষ্য হলো সর্বজনীন কল্যাণ। যদিও ইসলামিক আইন বিজ্ঞানে (ফিকাহশাস্ত্র) ব্যক্তি ও পারিবারিক বিধি-বিধানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধুমাত্র এগুলোর বাস্তবায়ন জাতি ও সভ্যতা তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়।

এসবের চর্চা ব্যক্তি পর্যায়ে ভালো কিছু মানসিকতার সৃষ্টি করলেও পরিণতিতে নিষ্ক্রিয় ও দাস-সুলভ মানসিকতা সম্পন্ন (Passive and Submissive) মানুষ ও জাতি তৈরি করে। এরূপ সনাতন আনুষ্ঠানিকতা, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান সর্বস্ব (Traditional, Formalistic and Legalistic) সমাজের মানুষরা অযু, সালাত, সাওম, হজ- এসব খুব সুন্দরভাবে পালন করে ঠিকই কিন্তু একজন ভালো নাগরিক হিসেবে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া ও সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসাকে অবহেলা করে; সরকারকে জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকে আবার আশা করে বসে থাকে যে, সরকার তাদের জন্য সবকিছু করে দেবে; চিন্তা করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে [তারা এতটাই নিষ্ক্রিয়তায় আক্রান্ত যে নিজেদের চিন্তা নিজেরা না করে আশা করে বসে থাকে যে অন্যরা তাদের জন্য চিন্তা করবে]; নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে; নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি, এমনকি নিজেদের সুরক্ষা ও কল্যাণ করতেও তারা অক্ষম হয়ে যায়। সক্রিয় অংশগ্রহণের মানসিকতার পরিবর্তে কর্মে অনীহা ও উদাসীনতা এ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। ফলে এসব সমাজে এ

ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে বেড়ে ওঠা শিশুরা উন্মুক্ত চিন্তার ধারক, চিন্তাশীল, নীতিবান, টিম কর্মী ও সামাজিক উন্নয়নের পথ-প্রদর্শক হতে পারে না। সমাজের উন্নয়নের অগ্রদূত হওয়ার পরিবর্তে তারা স্বার্থপর ও ভীরু মানুষে পরিণত হয়।

যেসব সমাজ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা নিপীড়িত সেই সমাজের মানুষদের যেখানে কল্যাণমূলক সমাজ গঠনে উদ্যোগী হওয়া দরকার ছিল; দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেখানে উল্টো তারাই নিজেদের ধ্বংসাত্মক আচরণ দ্বারা একটি অসুস্থ সমাজ তৈরি করে যেটি তাদের নিজেদেরই অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বড় অদ্ভূত বিষয় যে, তারা একদিকে খুব সচেতনতার সঙ্গে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম পরিহার করে, কিন্তু অন্যদিকে ধোঁকা দিয়ে মিথ্যাচার করে শরিআতের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারের ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়; যাকাত দেয়ার সময় টালবাহানা খোঁজে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে আইনের চোখ ফাঁকি দিতে পারলে এবং কাস্টম অফিসারদের প্রতারিত করতে পারলে তারা গর্ব অনুভব করে।

সন্তান জন্মের পর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অনেক বাবা-মাই সন্তানদেরকে কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখান। শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তারা যতটা নজর দেন, তাদের মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, গরিবের প্রতি দয়া করা, পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়ার প্রতি ততটা গুরুত্ব দেন না। আমাদের মধ্যে অনেক বাবা-মাই তাদের সন্তানের জন্য দামি খেলনা কিনে দেন (যার স্থায়িত্ব বেশি দিন নয়) কিন্তু পাশাপাশি পথের পাশের গরিব শিশুদের সামান্য

খাবার বা কাপড় কিনে দেয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এভাবে তারা শিশুদের আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজের অন্যদের প্রতি উদাসীন হবার শিক্ষা দেন।

লক্ষণীয় যে, জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজ ও জনজীবনকে কষ্টদায়ক করে তুলেছে। আমাদের ভাবতে হবে-যেখানে ইউরোপের দেশগুলো, যারা একটি সময় একে অপরের শত্রু ছিল, তারা তাদের প্রয়োজনের তাগিদে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, পারস্পরিক সহযোগিতা করছে, সেখানে কেন মুসলিম দেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে গর্ব বোধ করছে। ব্রাজিলে, কানাডাতে যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি, গোত্র, ধর্ম, ভাষা ও জাতির মানুষ একত্রে বসবাস করছে, সেখানে আরব দেশগুলোর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবনব্যবস্থা এক হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরার মতো বিচ্ছিন্ন। নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত মধ্য প্রাচ্যের অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী মুসলিম দেশ কিংবা হতদরিদ্র গরিব মুসলিম দেশ কেউই তাদের জনসাধারণের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারছে না। বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়লেও বিশ্বে তাদের সার্বিক অবস্থা ভালো হচ্ছে না। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কি তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এসব বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা, সংকীর্ণতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য ধর্ম দায়ী? এরকম দুরাবস্থা নিয়ে কি একটি জাতি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে? ধর্ম কি আসলেই এসব বৈশিষ্ট্য শেখায়? নাকি মুসলমানদের ধর্ম শিক্ষায় ভুল আছে? আসলে মুসলিম উম্মাহর মানসিকতায় ছেদ পড়েছে; তাদের চিন্তায় একটি বড় ফাঁক আছে; তাদের ধর্ম বোঝার ক্ষেত্রে এক বড় গলদ রয়ে গেছে। মুসলমানরা ধর্ম চর্চা করছে কেবল নিজের কথা চিন্তা করে। তারা কেবল নিজের নগদ পাওনা ও পরিবারের স্বার্থের চিন্তায় মগ্ন; এর বাইরে পুরো জাতি, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি প্রতিবেশীর স্বার্থকে তারা উপেক্ষা করছে। সুতরাং, মুসলমানদের জাতীয় সংস্কৃতি সংকীর্ণ ও বিকৃত হয়ে পড়েছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করা এবং প্রতিবেশীদের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার স্থানে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে-যেগুলো হওয়া উচিত ছিল মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সময় এসেছে মুসলমানদের বালুর ভিতর মাথা গুজে না রেখে বের হয়ে আসার।

এবার আসুন, বর্তমান পরিস্থিতিকে হযরত আবু বকর রা.-এর আচরণের সাথে তুলনা করে দেখি। তিনি যখন তার সব সম্পদ মুসলিম জাতির জন্য দান করতে নিয়ে এসেছিলেন তখন রসুল সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন - তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল সা. রয়েছেন। হযরত আবু বকর রা.-এর এ কথাটি যে কেবল তার আল্লাহ তা'আলার প্রতি মজবুত ইমানের বহিঃপ্রকাশ তাই নয়, বরং এটি তার সেই দৃঢ় বিশ্বাসেরও প্রতিফলন যে নবিজি সা. এবং এ মুসলিম সমাজ প্রয়োজনে তার ও তার পরিবারের খেয়াল রাখবে। হযরত আবু বকর রা. যদি মনে করতেন যে, হয়তো তার পরিবার আর্থিক কষ্টে ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে, রাস্তায় নেমে পড়বে- তাহলে হয়তো তিনি সম্পদের অধিকাংশ সঞ্চিত রাখতেন এবং ক্ষুদ্র অংশ দান করতেন।

মুসলিম দেশগুলোর এ ধরনের পারস্পরিক বিরোধের জন্য ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থার জন্য মুসলমানদের গোত্র কিংবা ভাষার বিভিন্নতাকে দায়ী করা যায় না; কিংবা এটি বলা যায় না যে, অত্যাচারি শাসকদের কারণে এটি হয়েছে কিংবা ঔপনিবেশিকতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলা যায় না ঔপনিবেশিকতাই এর জন্য দায়ী। ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সামাজিক ঐক্য ও সমন্বয়কে উৎসাহিত করে। যেহেতু ইসলাম মূলত একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি ও পারস্পরিক সহানুভূতির শিক্ষা দেয় তাই মুসলমানদের এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার জন্য ইসলামকে দায়ী করা যাবে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থাকেও এর জন্য দায়ী করা যাবে না, কারণ মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মূলত সমস্যার লক্ষণ, এগুলো সমস্যার কারণ নয়। তাহলে প্রশ্ন হলো- এর জন্য দায়ী কে?

আমরা বিশ্বাস করি এর উত্তর কুরআনে আছে:

> নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে।
>
> (সুরা আর রাদ, ১৩: ১১)

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ তাদের দুরবস্থার জন্য নিজেরাই দায়ী। অতএব, কুরআনের এই আয়াতকে হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পারলেই আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সুষ্ঠুভাবে তৈরির মাধ্যমে আমরা সেটি করতে পারি।

শিক্ষার্জন হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী কর্মসূচি-সেটি দোলনা থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত চলতেই থাকে। শিশুর মনে মানবতা (যেমন: দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ, অন্যকে নিয়ে চিন্তা করা

ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু প্যারেন্টিং জরুরি। শিশুর সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য এসব গুণাবলি শৈশব থেকেই শিশুমনে একটু একটু করে প্রবেশ করানো প্রয়োজন। প্রাপ্ত বয়সে পদার্পণের আগেই শৈশবে এসব শিক্ষা দেয়াটা অনেক বেশি সহজ ও কার্যকর।

ফিকাহশাস্ত্রে মুসলিম মানস গঠনের যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে তা মুসলিমদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং ফিকাহশাস্ত্রতে আরেক দফা চোখ বুলানো দরকার যাতে করে এতে সামাজিক, মানবতা ও জনগণের প্রতি সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্বের বিষয়গুলো যুক্ত করা যায়, যা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এ দিকটি সম্পর্কে কুরআন এবং হাদিসে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

> আবার সেসব লোকদের জন্যও যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ইমান এনে দারুল হিজরাতে (মদিনায়) বসবাস করছিল। তারা ভালোবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে। মূলত যেসব লোককে তার মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।
>
> (সুরা হাশর, ৫৯: ৯)

এদিকে রসুল সা. বলেন, সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে মুসলমানদের বিষয়ে সচেতন নয় (চিন্তা করে না) (Ibn Mas'ud)।

আমরা কখনোই উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ, গরিব, এতিম ও প্রতিবেশীদের প্রয়োজনের ব্যাপারে সচেতন হবো। সুরা মাউনের ১-৭ আয়াতে এ বিষয়টি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই।

> তুমি কি তাকে দেখেছো যে আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা বলছে? সে-ই তো এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না। তারপর সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে গাফিলতি করে; যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (মানুষকে) দিতে বিরত থাকে।
>
> (সুরা মাউন, ১০৭: ১-৭)

আসলে ইবাদতের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় এতিমদের সাহায্য, গরিবদের খাওয়ানো ও প্রতিবেশীকে সাহায্য করা এসব কাজ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হলো ইবাদতকারীকে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত করা। আজকে মুসলিম বিশ্বে ভিক্ষুকের বাড়তি সংখ্যাই বলে দেয় যে মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার অভাব রয়েছে- আর দিন দিন সেটি তাদের চরিত্রে আরো বেশি করে বদ্ধমূল হচ্ছে।

নিজ দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা

অনেকেই নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি কিংবা নিজেদের ভবিষ্যতের প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করেন না বা করলেও খুব সামান্যই করেন। যে সমাজে কঠোর পরিশ্রম ও সততার কদর কমে যায় সেখানে মানুষের মধ্যে এ দুগুণের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়; তারা ভুলে যায় যে, তার নিজের প্রতি ও তার পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব রয়েছে। তারা সেই দায়িত্ব পালন না করে অন্যের সাহায্যের আশায় হাত পেতে বসে থাকে; আশা করে যে অন্যরা তার জন্য সব করে দেবে। এ মানসিকতার কারণ হচ্ছে- নিজের প্রতি দায়িত্বের ধারণাটি সমসাময়িক মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত। এটির অন্যতম কারণ হলো মুসলিম সমাজে বিদ্যমান সংহতিবাদের (Collectivism) ধারণা। অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন, অন্যের সেবা করা আর সংহতিবাদ এক জিনিস নয়; যদিও অনেকেই এ দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন। সংহতিবাদ হলো ব্যক্তির ওপরে সমষ্টিকে গুরুত্ব প্রদান করা বা অন্যকথায় সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিকে বিলীন করে দেয়া। গোষ্ঠী, বংশ বা গোত্র প্রথা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের সংহতিবাদের আদি রূপ। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সেটি সরকার বা রাজবংশের অন্ধ দাসত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায় সংহতিবাদ "সামষ্টিক

চিন্তা" (Group Think) বা দলীয় মানসিকতার (Herd Mentality) জন্ম দেয়; যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বতন্ত্র চিন্তার বিকাশকে রহিত করে। এটি মানুষের মৌলিক স্বতন্ত্র চিন্তার (ইজতিহাদ) অন্তরায় যা মূলত সভ্যতা উন্নয়নের চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন মতবাদ একজন ব্যক্তির উৎপাদনশীলতার প্রেরণা কমিয়ে দেয় এবং তাকে অনুৎপাদনশীল ভোগকারীতে (Unproductive Consumer) পরিণত করে। দার্শনিকভাবে এটি মানুষের নিজেকে আল্লাহ তা'আলার খলিফা হিসেবে ভাববার দৃষ্টিভঙ্গির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

সংহতিবাদ একধরনের পরনির্ভরশীলতার সংস্কৃতি তৈরি করে এবং আত্মসম্মান বোধকে ব্যাহত করে। নীতিগতভাবে এটি মানুষকে দুর্বল নৈতিকতা সম্পন্ন করে। আর রাজনৈতিকভাবে এটি মানুষকে 'শক্তির' প্রয়োগে বিশ্বাসী করে তোলে। ফলে তারা হয় শক্তি প্রয়োগে নিজের ইচ্ছা বা মত অন্যের ওপরে চাপাতে চায় বা শক্তিশালী কারো ইচ্ছার অধীনে আত্মসমর্পণ করে। এর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘাত বাড়ে; মানুষ তার নিজের ইচ্ছার প্রভাব খাটাতে চায়। তাছাড়া এ মতবাদের ফলে 'প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী' নিজেদের ইচ্ছা সমাজে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়। অথচ এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন মানুষকে খলিফা (আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি) হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহবান করে, তাদের আল্লাহ তা'আলার প্রতি আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয় এবং নিজের, সমাজের ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রতি উৎসাহিত করে।

অনেক মুসলিম দেশের সংস্কৃতি শিশুদেরকে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট ও চিন্তাহীন (Uncritical) হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদেরকে কেবলমাত্র কিছু বিধিবদ্ধ আইনি আদেশ-নিষেধ শেখানোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। যাকাতকে কেবলমাত্র সম্পদের ওপরে শতকরা হিসাবে বসানো সংখ্যা হিসাবে শেখানো হয় (এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবতে শেখানো হয় না)।

গরিবদের সাহায্য বলতে তাদের শেখানো হয় নিজেদের জন্য অনুপযোগী খাবার ও নিম্নমানের বস্ত্র দান করা। সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, দয়া, উদারতা ও গরিব ও মিসকিনদের সাথে সম্পদ ও সুবিধা ভাগাভাগি করে নেয়ার মতো বিরাট ব্যাপারগুলো তাদের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যায়। ফলে অন্যের প্রয়োজনের প্রতি সমবেদনা ও উদ্বেগ সৃষ্টির মূল্যবান গুণ হারিয়ে যাচ্ছে। আর সমবেদনার পথে

এ ঘাটতি পুরো মুসলিম উম্মাহ'র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্রে একটি ছিদ্র তৈরি করছে।

অথচ যাকাতে বস্তুগত দিকটির থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষের মনে দয়া-মায়া, বঞ্চিতদের কষ্ট বোঝা, অন্যের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির সৃষ্টির ব্যাপারটি। উট, খেজুর কিংবা যবের শতকরা হিসাবের থেকে শিশুরা যাতে সামাজিক সংহতি, দয়া, ত্যাগ, উদারতা বুঝতে পারে এবং সেই সাথে একে অপরের প্রয়োজন ও দুঃখ ভাগাভাগি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে- সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। অল্প বয়সেই তাদের কচি মনে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ত্যাগের ভিতরে মানসিক প্রশান্তি ও আনন্দ লাভের মাধ্যম হিসেবে যাকাত ও দানকে শিশুদের কাছে পরিচিত করে তুলতে হবে, গণিতের জটিল বিরক্তিকর হিসাব আকারে নয়।

বিকৃত সংস্কৃতি: পশ্চাদমুখিতা ও কুসংস্কার

বর্তমানে অনেক মুসলিমই সম্মুখবর্তীর চেয়ে পশ্চাদমুখী। তারা আগাম সচেতন হওয়ার চেয়ে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাচ্ছে।[১] কোনো সমস্যা সৃষ্টির পরে তারা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে থাকে (এবং খুব কমই সফল হয়), সমস্যা সৃষ্টির পূর্বে তারা সমস্যা যাতে না হয় সেভাবে পূর্ব পরিকল্পনা করে না। প্রতিরোধ না গড়ে তারা সমস্যা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের পথ হাতড়ে বেড়ায়। তারা অনেকটা সেই গাড়ির চালকের মতো যে গাড়ির সম্মুখ গ্লাসের দিকে নজর দেয়ার পরিবর্তে পিছনের আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এদিকে আরেকটি সমস্যা যেটি মুসলমানদের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে; তাহলো- কুসংস্কার, যাদুটোনা এবং জ্বিনজগতের প্রতি বদ্ধ-সংস্কার। অথচ ইসলামিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্দেশ্য, যুক্তি বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তববাদিতার ওপর নির্ভর করে। মুসলিম বিশেষজ্ঞরা একদিকে যেমন নবিদের অলৌকিক মু'জিজায় বিশ্বাস করেন তেমনি একই সাথে তারা বাস্তব মু'জিজা কুরআনে বিশ্বাস করেন যেটি সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সা. মানবতার জন্য রেখে গেছেন। কুরআন মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তাকে উৎসাহিত করে। এটি গবেষণা, অনুসন্ধান এবং গভীর চিন্তার আহ্বান জানায়। সুতরাং সন্তানদের মানসিকতাকে এভাবে তৈরি করে

[১] Reactive Rather then Proactive.

দিতে হবে যাতে তারা যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পায় এবং একইসাথে তাদের মধ্যে আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস গভীরভাবে গেঁথে যায়।

তাছাড়া সভ্যতা কখনো কুসংস্কার-যাদুটোনা এসবের ওপর গড়ে উঠে না। অথচ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, অনেকেই পারিবারিক সমস্যার সমাধানে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার বা পরামর্শের বদলে যাদুটোনা, তাবিজ প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে; মানসিক চিকিৎসার বদলে জ্বিন, পাথর, গ্রহ-নক্ষত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে এবং এসবকে আরোগ্য দানকারী মনে করে ছুটে যায়। এসব কর্মকাণ্ড ইসলামিক নীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি এবং শিশুমনের জন্য ক্ষতিকর। বাবা-মা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারণা ও মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা, যে ব্যাপারটি কুরআনে বার বার গুরুত্ব সহকারে এসেছে। কুরআন আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ, পথ (আল সুনান আল-ইলাহিয়া), প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর জোর দিয়েছে যা মানবজীবনকে পরিচালিত করে। নবি রসুলগণও এ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ছিলেন। কুরআনে এ ব্যাপারে উল্লিখিত আছে:

> আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধু একজন ভীতি প্রদর্শক এবং ইমানদারদের জন্য সুসংবাদদাতা।
>
> (সুরা আল আরাফ, ৭: ১৮৮)

> বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।
>
> (সুরা আল কাহাফ, ১৮: ১১০)

এ বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবতা সম্পন্ন আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এমন একটি সভ্যতা গড়ে দিয়েছিল যা পৃথিবীতে ছিল অভূতপূর্ব। মুসলমানদের স্বর্ণযুগে তারা ইউরোপকে অন্ধকার যুগ থেকে বের হয়ে (যে অবস্থায় তারা শতক অবধি ডুবেছিল) আলোর দিকে আসতে সহায়তা করে (Al-Hassani, 2011)।

ফ্রান্সের দার্শনিক রজার গ্যারাউডি (Roger Garaudy) পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এর নান্দনিকতা ও আইনব্যবস্থা, নৈতিকতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জন্য যথাক্রমে রোমান ও গ্রিক সভ্যতা, খ্রিস্টবাদ এবং স্পেনের মুসলিমদের কাছে ঋণী।

(Al Hewar Magazine, 2002)

প্রথমত এটি বাবা-মা ও দ্বিতীয়ত এটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব যে তারা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলবে যারা হবে ধীশক্তির অধিকারী, বুদ্ধিমান, বোধশক্তি সম্পন্ন, চরিত্রবান ও মেধাবী। যাদের থাকবে ধর্মীয় ও প্রকৃতির জ্ঞান, যারা মহাবিশ্ব, সৃষ্টিজগত, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সম্পর্কে থাকবে জ্ঞাত।

ভুল দৃষ্টিভঙ্গি: দুর্বলতা এবং ভয়

এ ব্যাপারে রসুল সা. বলেছেন:

একটি সময় আসবে যখন অন্য সম্প্রদায়গুলো তোমাদের উপর হামলা করবে, যেমন করে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার গ্রাস করে। একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহ তা'আলার রসুল! এটি কি আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে ঘটবে? তিনি বলেন: না, তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক হবে, সমুদ্রের ফেনার মতো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুর মন থেকে তোমাদের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা উঠিয়ে ফেলবেন এবং তোমাদের মনে দুর্বলতা (ওয়াহান) সৃষ্টি হবে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন-"হে আল্লাহর রসুল সা.! 'ওয়াহান' কী? তিনি বললেন: 'ওয়াহান' হচ্ছে পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা আর মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা।

(আবু দাউদ)

ভারসাম্যপূর্ণ পথ: বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ

আমরা বাবা-মায়েদের অনুরোধ করব নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিটা সততার সাথে একবার যাচাই করে নিতে। কারণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞোচিত মানসিকতা প্যারেন্টিং-এর উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এ ব্যাপারটি অভিভাবকদের খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া দরকার কারণ এ জ্ঞানই তাদেরকে সাহায্য করবে ভয়, গুটিয়ে নেয়ার মানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, পশ্চাদমুখিতা এবং বলপ্রয়োগের সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকতে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের স্কলাররা (আলিম, ফুকাহাগণ) ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও ইবাদত- উভয়ের উপরই জোর দিয়েছেন। আমরা জানি, কুরআনে জিকির বলতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার স্মরণকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ উভয় ধরনের জ্ঞানই দান করা প্রয়োজন। বাবা-মায়েদের ইসলামের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে এবং সন্তানদেরকে তাদের বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে এ দৃষ্টিভঙ্গি শেখাতে হবে। শিশুদের এটি বলা উচিত যে- আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধান ও মূল্যবোধ অনুযায়ী পৃথিবীতে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করা। তাদেরকে এটি বুঝাতে হবে যে, ইবাদত হলো এ চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম।[২] এ

[২] Worship is a Means to Acieve Those Ends.

বোধই তাদেরকে জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে এবং সঠিক ও ন্যায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করবে। দেখা যায়, বাবা-মা হিসেবে আমাদের চরিত্রই শিশুরা আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করে এবং এ আচরণই তাদের জীবনে ফিরে আসে। তাই আমাদের উচিত সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। এ স্মরণ আমাদের প্রতিনিয়ত নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে; ফলে আমরা সেই কাজগুলো করব যা আমাদের নিজেদের জীবনকে আরো উন্নত করবে ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে। বিশেষত একটি সৎ জীবন-যাপন করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত; সেই সাথে আশেপাশের পরিবেশের দেখভাল, জ্ঞানার্জন এবং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত। শিশুরা ইবাদতের প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য তখনই ভালোভাবে বুঝতে পারে যখন তারা নিজের বাবা-মাকে এসব কাজের অনুশীলন করতে দেখে এবং তাদের শেখানো হয় যে- জীবনটি হচ্ছে একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র যেখানে মানুষের গুণাবলির এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাদের কার্যকলাপের ও প্রচেষ্টার পরীক্ষা নেয়া হয়।

নিচের আয়াতগুলো শিশুদের মনে বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি গড়ে তোলে-

আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম এর প্রতি আনুগত্যশীল।

(সুরা আনআম, ৬: ১৬২-১৬৩)

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলার স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমরা যা করো। (সুরা আনকাবূত, ২৯: ৪৫)

তারা আল্লাহ তা'আলার প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে। তারা বলে, কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।

(সুরা আদ দাহর, ৭৬: ৮-৯)

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি

শাসন-কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।

(সুরা আন নূর, ২৪: ৫৫)

শিশুদের মনে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি

শিশুদের মনে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা গড়তে হলে অভিভাবকদের উচিত শিশুদের সামনে কুরআনকে শুধুমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থের চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা। কারণ শুধু পবিত্র গ্রন্থ বললে মনে হয় যে, এটি কয়েকটি গৎবাঁধা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিলাওয়াত করলেই চলে; বছরের বাকি সময়ের জন্য আলমারিতে উঠিয়ে রাখতে হয়। আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমাদের শিশুদেরকে ধর্মীয় তথ্য দেয়ার প্রতি জোর দেয়া উচিত, নাকি ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিশুর মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের প্রতি বেশি জোর দেয়া উচিত? জ্ঞানার্জন এবং তথ্য সংগ্রহ মানুষের সারাজীবন ধরে চলতেই থাকে, তবে সুষ্ঠু মানসিক ও দার্শনিক উন্নয়ন শিশুর প্রাথমিক জীবনে বিশেষ করে পরিপূর্ণ বয়সের (১৩ বছর এর) আগেই ঘটতে থাকে।

সচরাচর মুসলমানরা তাদের শিশুদের ছোটোবেলা থেকেই শুধু জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখান, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, দয়া এবং সমবেদনা অথবা জান্নাতের সৌন্দর্যের কথা সেভাবে তুলে ধরেন না। আমরা শিশুদেরকে ভয় যতটা জোর দিয়ে দেখাই যে তারা যদি আল্লাহ তা'আলার (আদেশ-নিষেধ) অমান্য করে, বাবা-মায়ের কথা না শুনে বা পাপ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের দোজখের আগুনে জ্বালানো হবে; ততটা তাদেরকে আশাবাদ দেই না যে তারা যদি সৎকাজ করে, আল্লাহ তা'আলা ও বাবা-মাকে মান্য করে এবং কোনো ভালো কাজ করে তবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। আমরা সবসময় তাদেরকে ভয় দেখাই, জাহান্নামের হুমকি দেই অথচ খুব কমই তাদেরকে সাহস জোগাই অথবা ভালো আচরণের জন্য আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার কথা, পুরস্কারের কথা উল্লেখ করি। এমন পরিবেশে, শিশুরা আতঙ্কগ্রস্ত ও ভীরু হিসেবে বেড়ে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতা জন্মায় এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়

এবং তদপেক্ষাও খারাপ যে তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষকরা সাধারণত কুরআনের শেষ অধ্যায় থেকে (ত্রিশ পারা) শিশুদের পড়ানো শুরু করে। এ অধ্যায় ছোটো ছোটো সুরা সম্বলিত যেগুলো অহি আসার প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় নাযিল হয়। মূলত কুরাইশ গোত্রের বিপথগামী, অহংকারী এবং অত্যাচারী পৌত্তলিক নেতাদের (আবু জাহল, আবু লাহাব) উদ্দেশ্যে এ সুরাগুলো নাযিল হয়েছিল। তাছাড়া যারা মুসলমানদের অত্যাচার করছিল, মুসলমানদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে হত্যা করেছিল, নবিজি সা.-কে হত্যার পরিকল্পনা করছিল এবং বিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে যুদ্ধ বাধিয়েছিলো- কুরআন নাযিলের সূচনার অধ্যায়গুলো মূলত তাদের উদ্দেশ্যেই। এ সুরাগুলো এসব অত্যাচারীদের তাদের হুশ/জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য ছিল। এদিকে আয়াতের দৃঢ় কথাগুলো তাদের কানে বজ্রধ্বনি হিসেবে কাজ করত, কারণ আয়াতগুলো ভয়ানক সতর্ক বার্তা সম্বলিত ছিল। যেমন নিচের আয়াতগুলো-

> আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। (সুরা আল লাহাব, ১১১:১)

> প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ। (সুরা আল হুমাযা, ১০৪: ১)

> আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। বিষকন্টক ব্যতিরেকে তাদের জন্য কোনো খাদ্য নেই। (সুরা গাশিয়া, ৮৮: ১-৬)

> যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ। (সুরা মুতাফফিফীন, ৮৩: ১)

> বলুন, হে কাফিরকূল। (সুরা কাফিরুন, ১০৯: ১)

> যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। (সুরা যিলযাল, ৯৯: ১)

এটি খুবই দুঃখজনক যে এসব কঠিন বার্তা কোমলমতি শিশুদের লক্ষ্য করে নাযিল না হলেও এগুলোই শিশুদের সর্বপ্রথম শেখানো হয়। হ্যাঁ, প্রথমেই এ সুরাগুলো শেখানোর একটি কারণ হচ্ছে এগুলো ছোটো এবং সহজে মুখস্থ করা যায়। তবুও শিশুদের এ বয়সে জাহান্নাম ও শাস্তির ভয় দেখানোর বদলে আমাদের উচিত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার

ভালোবাসা, বাবা-মায়ের দয়া এবং জান্নাতের সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ে বোঝানো। এর ফলে শিশুকাল থেকে তাদের মনে নিরাপত্তার অনুভূতি, ভালোবাসা, দয়া, কোমলতা, মহত্ত্ববোধ, উদারতা এবং সহানুভূতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, দয়া, মমতা, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্যশীলতা এবং উদারতা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার সুন্দর গুণসমূহ শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশুদের প্রথম পাঠ শুরু করা উচিত। প্রথমে তাদের মনে এ বিশ্বাস দিতে হবে যে, তারা ভালো এবং আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। এরপর তাদেরকে শেখাতে হবে যে, তাদেরও উচিত আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা। শিক্ষার ক্রমটি এমন হতে হবে যে, প্রথমত তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সম্পর্কে তাদের অবগত করা, তারপরে তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে সেই বাধ্যবাধকতা শেখানো।

এরপর যখন সন্তান কিছুটা বড় হবে এবং বুঝতে শিখবে, তখন বাবা-মা ধীরে ধীরে তাদেরকে খারাপ কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা বলতে শুরু করবেন। যেসব সুরাগুলো বড় বড় গুনাহের জন্য শাস্তির আগাম সতর্ক বার্তা দেয়- সেসব সুরাগুলো এসময় শুরু করা উচিত, যাতে তারা এসব থেকে ভয়ে সন্ত্রস্ত না হয়ে বরং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এটি তাদের শৈশবের শেষ পর্যায় কিংবা টিনেজ (১৩-১৯) বয়সের দিকে হতে পারে যখন তারা কিছুটা বড় হয়েছে এবং কিছুটা জটিল বিষয়গুলো ও কর্মের ফলাফল বুঝতে সক্ষম।

কুরআনের শিক্ষা দেয়ার সময় আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, আমরা শিশুর দর্শন ও মানসিকতাকে কীভাবে তৈরি করছি। এটি আবশ্যক যে, শিশুদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বাবা-মায়েরা সচেতনতার সাথে তাদের বয়সের বিষয় মাথায় রেখে সুরা বা আয়াত নির্ধারণ করবেন। রসুল সা. এর বেশির ভাগ সাহাবা তাদের প্রাপ্ত বয়সে (শিশু বয়সে নয়) কুরআনের সাথে পরিচিত হন। সেই বয়সে কুরআন তাদের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল। কুরআন তাদের চরিত্রকে আরো বেশি মজবুত ও সাহসী করেছিল এবং তাদেরকে উচ্চতর নৈতিকতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। শিশুদের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী ও কুরআন বিশেষজ্ঞরা মিলে কুরআন শিক্ষার একটি ক্রম ঠিক করা জরুরি, যাতে অভিভাবকরা কীভাবে সন্তানদের বয়স অনুযায়ী তাদেরকে আয়াত বা

সুরা শিক্ষা দেবেন সেটি জানতে পারেন। এটি অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তি জীবনে কুরআনের সবগুলো আয়াতেরই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। তবে প্রশ্ন হলো কোন ক্রম বা ধারায় এটি শেখা বেশি কার্যকর? কোন আয়াত বা সুরাগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন বয়সে কোন আয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন? ৩৭টি ছোটো সুরা আছে বলেই প্রথমেই সম্পূর্ণ ৩০ পারা দিয়ে শুরু করা নিঃসন্দেহে উপযুক্ত নয়। তাছাড়া কেবলমাত্র মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সহজতর ভিত্তিতে সুরা নির্বাচন কিংবা বিবেচনা করা সঠিক পন্থা নয়।

অপরদিকে, অন্য ভাষা-ভাষী বাবা-মায়েদের কর্তব্য হলো তাদের নিজ ভাষায় কুরআনের অর্থ তাদের সন্তানদের কাছে ব্যাখ্যা করা। অনেকক্ষেত্রেই অর্থ না বুঝে শুধু কুরআন দেখে দেখে তিলাওয়াত করা কিংবা কিছু আয়াত মুখস্থ করাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। বাবা-মায়েদের প্রতি সুপারিশ, তারা যেন কুরআন তিলাওয়াত করার সময় এর অর্থ ও তাফসির (ব্যাখ্যা) সহ পড়েন যাতে সন্তানরা কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এভাবেই তারা কুরআনের সর্বজনীন শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং কুরআনের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। অভিভাবকরা নিজেরা যদি এভাবে কুরআন পাঠে অপারগ হন, সেক্ষেত্রে তারা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করতে পারেন এবং তাদের শিশুদের কীভাবে শেখানো হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। অপরদিকে, কুরআনের রেকর্ড বাসায় প্রত্যহ বাজানো যেতে পারে যাতে কুরআনের শব্দের ও সুরের সাথে তারা পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া কুরআন তিলাওয়াতের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সংগঠিত প্যাটার্ন ও রুটিন ঠিক করে নেয়া খুবই জরুরি, যাতে শিশুরা নিয়মিত কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। তাছাড়া আরবি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিশুদের শেখালে এটি তাদের কুরআন শিখতে এবং এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে। আজকাল কুরআনে বর্ণিত নবিদের গল্প সম্বলিত শিক্ষণীয় বই প্রকাশিত হচ্ছে। বাবা-মায়েরা কুরআন পড়ার পাশাপাশি শিশুদেরকে এসব বই কিনে দিলে বা যোগাড় করে দিলে শিশুরা কুরআনের সাথে অধিক পরিচিত ও সাবলীল হতে পারে।

দোয়ার শিক্ষা প্রদান: সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার স্মরণ

এমন অনেক ছোটো ছোটো দোয়া রয়েছে যেগুলো শিশুদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে- আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেখছেন, তত্ত্বাবধান করছেন এবং তিনি আমাদের সাথেই আছেন। এ দোয়াগুলোর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা, তাঁর সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এর ফলে, সর্বাবস্থায় সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়, আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাবা-মায়েরা খাবারের আগে ও পরে শব্দ করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবেন এবং শিশুদেরকে তাদের সাথে সাথে এ দোয়া করতে বলবেন। আবার ঘরে প্রবেশ করতে, ঘর থেকে বের হতে, ঘুমাতে যাওয়ার সময় এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠতে- এ সকল সময়ে নিয়মিত দোয়া পড়ার রেওয়াজ তৈরি করবেন। কারণ, এ ছোটো ছোটো দোয়াগুলো মূলত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসিকতা গড়ে দেয়। তাছাড়া কাজ শুরুর আগে সহজ একটি কথা

'বিসমিল্লাহ' (শুরু করছি আল্লাহ তা'আলার নামে) বলার নিয়ম যদি পরিবারে চালু হয় তবে দেখা যাবে শিশুরাও তা অনুসরণ ও অনুকরণ করছে। এটি খুব ছোটো বা তুচ্ছ মনে হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এ রীতি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে অভ্যস্ত করবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করাটা প্রাকৃতিকভাবেই তাদের জীবনের অংশ হয়ে যাবে। একসময় তারা সব কিছুর পিছনে আল্লাহ তা'আলার মহানুভব উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সম্মত হবে।

এদিকে বাবা-মায়েদের উচিত সালাতকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাভাবিক অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অভিভাবকদেরই এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য উত্তম উদাহরণ হতে হবে। শিশুদের সামনেই আযান দিয়ে তাদেরকে সালাতের প্রতি আহ্বান জানান, সালাতের সময়কে বিশেষ গুরুত্ব দান করুন। টেলিভিশনের সুইচ বন্ধ করে দিন, পরিবারের সবাই মিলে সালাতের প্রস্তুতি নিন, যাতে সালাতের জন্য বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাবা-মায়ের উচিত শিশুদের সামনে প্রশান্তি ও ধীরতার সাথে সালাত আদায় করা। প্রায়ই এমনটি হয় যে, অভিভাবকরা তাড়াহুড়া করে শেষ সময়ে সালাত আদায় করেন। শিশুরা এটি লক্ষ করে এবং সন্দেহাতীতভাবে তারাও এর অনুকরণ করে, নিজেদের সালাতে মনোযোগ দেয় না। এক্ষেত্রে একটি ভালো অভ্যাস হলো, সালাতের আগে ও পরে বসে কিছু দোয়া পড়া, যাতে শিশুরাও এমনটি করতে শেখে। এটি যে নির্দিষ্ট কোনো দোয়া হতে হবে এমনটি নয়; এটি নিজেদের কোনো সাধারণ প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদনও হতে পারে।

তাওবার (অনুশোচনা) শিক্ষা দান

সন্তানদের এটি অনুধাবন করা খুব জরুরি যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফল রয়েছে; খারাপ আচরণ একটি লজ্জাজনক বিষয় এবং আল্লাহ তাআলা সবকিছুই দেখছেন। কাজেই কখনো যদি তাদের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ হয়ে যায় তবে তাদের উচিত আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, তাওবা করা। শুধু 'সরি' (Sorry) শব্দটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং এটি তাদের বোধে থাকতে হবে যে খারাপ আচরণের জন্য আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে।

আর এ অনুশোচনাই তাদের মনে তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি সচেতনতার জন্ম দেবে। এর মাধ্যমেই বাবা-মায়েরা শিশুদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়া শেখানোর সুযোগ পাবেন। এভাবে শিশুরা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

শিশুদের এ শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা তাদের দ্বারা সহজে সাদরে গৃহীত হবে এমনটি আশা করা ঠিক নয় (নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়া একটি কঠিন কাজ)। বরং বিপরীতক্রমে তারা শিশুদের ক্রোধ এবং বাধার সম্মুখীন হবেন। তবে এ পরিস্থিতিতে বাবা-মায়ের উচিত দৃঢ় কণ্ঠে শিশুদের বুঝানো (রাগ না করে) এবং যতক্ষণ না শিশু তাওবা করে ততক্ষণ দৃঢ় থাকা এবং যখন তারা তাওবা করবে তখন তাদের দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসা। এভাবে শিশুদের চরিত্রে ভুলের জন্য অনুশোচনা ও খারাপ কাজ থেকে সংযত হবার শক্তি তৈরি হবে। পরবর্তীতে সন্তানরা যখন বড় হবে তখন তাদের আচরণ দ্বারা যদি কাউকে কষ্ট দেয় কিংবা কারো সাথে খারাপ কিছু করে তবে তাদের জানা থাকবে কীভাবে তা সংশোধন করতে হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়।

রসুল সা. ও অন্যান্য নবিদের সম্পর্কে শিক্ষাদান

বাবা-মায়েদের প্রতি একটি উপদেশ হলো তারা যাতে ঘরে ছোটো একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলেন এবং প্রতিদিন সন্তানদের সঙ্গে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলেন। তারা নবি সা. (জীবন, বাল্যকাল, তাঁর চরিত্র এবং উপদেশ), তাঁর নাতি (হাসান, হুসাইন রা.) এবং তাঁর সাহাবিদের গল্পগুলো শিশুদের পড়ে শোনাতে পারেন বা গল্প করতে পারেন। নবিদের গল্প শুনে শিশুরা তাঁদের ভুবনে চলে যায়, তাঁদের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে, ফলে তাঁদের সঙ্গে মজবুত সংযোগ স্থাপিত হয় এবং তাঁদেরকে মডেল হিসেবে নিজেদের চরিত্রে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, গল্পগুলো শিশুদের বয়স ও সেই বয়সের প্রয়োজন-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাছাই ও শব্দচয়ন করতে হবে যাতে শিশুরা গল্পের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এসবের পাশাপাশি বাবা-মায়েরা শিশুদেরকে ইতিহাসের বীর, সম্মানিত নারী এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের গল্প পড়ে শোনাতে পারেন। শিশুদেরকে ইসলামিক সভ্যতার কৃতিত্বের ইতিহাস জানাতে হবে। ইসলামিক শিল্প, ইতিহাস ও স্থাপত্যকর্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে

তাদেরকে নিয়ে জাদুঘর বা প্রদর্শনীতে যাওয়া উচিত। জাদুঘর মূলত শিশুদেরকে ইতিহাসের ব্যাপারে উৎসাহিত করার একটি চমৎকার জায়গা। এছাড়া জাদুঘরগুলো প্রায়ই শিশুদের জন্য কিছু কর্মসূচির আয়োজন করে যেগুলো থেকে শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারে। তাছাড়া এসব বিষয়ে ইন্টারনেটে এ কিছু চমৎকার সাইট রয়েছে- যেমন: '1001 Inventions,' http://www.1001inventions.com.- যেখানে বিগত হাজার বছরের মুসলমানদের কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এটি বাবা-মায়ের প্রতি একটি সুপারিশ যে- তারা যাতে '1001 Inventions: Muslim Heritage in Our World' (বিশ্বব্যাপি মুসলিম ঐতিহ্যের ১০০১টি আবিষ্কার)- গ্রন্থটি শিশুদের কিনে দিতে পারেন। গ্রন্থটি পড়তে যেমন সহজ, তেমনি চমৎকারভাবে বাঁধানো- যা পাঠককে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সেই হাজার বছর আগের মধ্যযুগীয় সেসব অগ্রদূতদের জীবনে নিয়ে যাবে- যাদের প্রতিভাসুলভ আবিষ্কার- কৌশল আজকের বিশ্ব গড়তে সাহায্য করেছে। অপরদিকে, বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র সম্বলিত বই বা সচিত্র ডিভিডিগুলোও একটি উৎস। বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ছায়াছবি বিশেষ করে সৃষ্টির বিস্ময়কর বিষয়গুলো (যেমন: মৌমাছির অলৌকিক জীবনপদ্ধতি) শিশুদের দেখা উচিত।

শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেক্যুলার সমাজ তার চিন্তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং বাবা-মাকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যেমন: বিবর্তন তত্ত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন। শিশুরা বড় হয়ে যে মুহূর্তে বাহ্যিক বিশ্বের বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করবে সে মুহূর্তেই তারা সংকটের সম্মুখীন হবে যদি বাবা-মায়েরা সরল বিশ্বাসে ভেবে নেন যে ইসলাম ও ইমান নিজে থেকেই তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। সেজন্য আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির জ্ঞান শিশু বয়সে তাদের মনে গেথে দিলে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সূক্ষ্ম তর্কের বিপরীতে তারা খুব সহজেই নিজের বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাবে। পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ শিশুদের শক্ত ও আত্মবিশ্বাসী এক ভিত্তি গড়ে দিতে হবে যাতে তারা বিশ্বাস ধ্বংসকারী যেকোনো তত্ত্বকে চিনে নিতে পারে, একে বদলে দিতে বা উপেক্ষা করে চলতে পারে।

শিশুদের আদব শিক্ষা

ইসলামি আচরণ মূলত ইসলামি নৈতিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই আচরণের অংশ হিসেবে শিশুদেরকে

'প্লিজ', 'তোমাকে ধন্যবাদ' (Thank You)- এগুলো বলার পাশাপাশি *আলহামদুলিল্লাহ* (সকল প্রশংসা আল্লাহ'র), ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) এবং *আসসালামু 'আলাইকুম* (তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা শেখানো উচিত। যাতে 'হাই', 'হ্যালো', 'বাই'-এর জায়গায় এসব সুন্দর অভিবাদনগুলো বের হয়। তাছাড়া কীভাবে খাবার খেতে হবে, পান করতে হবে, শালীন পোশাক পরতে হবে, কীভাবে অন্যদের সম্মান করতে হবে, সমাজিক অনুষ্ঠানে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে ইত্যাদির আদবও শিশুদেরকে শেখানো উচিত।

শিশুদেরকে এবং ঘরের পরিবেশকে পরিষ্কার, পরিপাটি ও সাজানো-গোছানো রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। এতে শিশুরাও এসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভ্যাস আয়ত্ত করে। অপরদিকে শিশুরা যাতে বিগড়ে না যায়, তাই সবসময় মজাদার সব খাবার প্রস্তুত না করে মাঝে মাঝেই সাধারণ কিছু রান্না করে তাদের সামনে পরিবেশন করা উচিত। এতে সুস্বাদু খাবারকে তারা মূল্য দিতে শিখবে। সন্তানদের সামনে বিনা কারণে তাদের অতিরিক্ত প্রশংসা-স্তুতি তাদের মধ্যে গর্ব ও অহংকারের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে। তাছাড়া জরুরি নয় যে, তারা যখন যে খেলনা চাইবে তখনই তাদেরকে তা দিতে হবে। বরং তারা কখনো যদি কিছু চায় তখন তাদেরকে ঘরের কাজের কিছু দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে এবং এ কাজের বিনিময়ে তাদেরকে সেটি কিনে দেয়া যেতে পারে। এতে তাদের ভিতর কাজ করে কিছু অর্জনের অভ্যাস তৈরি হবে। এ সময়ে তাদের এটি বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদের জন্য এর থেকে উত্তম কিছু দান করবেন। তাছাড়া তারা যা চাচ্ছে সেটির বিপরীতে বিকল্প কোনো কিছু পেলে তারা বাস্তবতা বুঝতে শিখবে, জীবনে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং কোনো জিনিসের জন্য অপেক্ষা করতে শিখবে। এ শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের শিক্ষা সারাজীবন তাদের কাজে আসবে।

কোনটি আগে শেখাবেন- তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে না কি আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালোবাসেন?

আচ্ছা, আমরা কি ভেবে দেখেছি? একটি শিশুকে যদি এটি শেখানো হয়

যে - "আমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসি, তিনি আমাকে এবং সেই সাথে এ পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন", তখন তাদের নিকটে কী ধরনের বার্তা পৌঁছাবে? প্রথমত শিশুদের মনে আল্লাহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে না, তাই এ ব্যাপারটি বোঝা তাদের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে যায়। সে জন্য আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারটা তাদের সামনে ঘোলাটে হয়ে দাঁড়ায়। যাকে তারা ঠিকভাবে জানেই না তাকে ভালোবাসা আর না বাসায় পার্থক্য কী? শিশুদের জন্য তাদের নিজের অস্তিত্ব ও তার চারপাশের সবকিছু তেমন বিশেষ কিছু নয় বরং এসব তার কাছে জানা পরিচিত জিনিস। এসব কারণে যদি তাদের সামনে আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করা যায় যে- "আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার আনন্দের জন্য এই বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন"- তখন তারা জানতে আগ্রহী হবে- কে তিনি, যিনি আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের যত্ন করেন এবং আমাদের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করেছেন? ফলে তারা এই যত্নবান, মমতাবান সত্তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইবে এবং তাঁর ব্যাপারে আরো অধিক জানতে আগ্রহী হবে।

শিশুকে শেখান যে -

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার আনন্দের জন্য এ বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে তারা জানতে আগ্রহী হবে যে- কে তিনি, যিনি আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের যত্ন করেন এবং আমাদের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করেছেন? ফলে তারা এ যত্নবান, মমতাবান সত্তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইবে এবং তাঁর ব্যাপারে আরো অধিক জানতে আগ্রহী হবে।

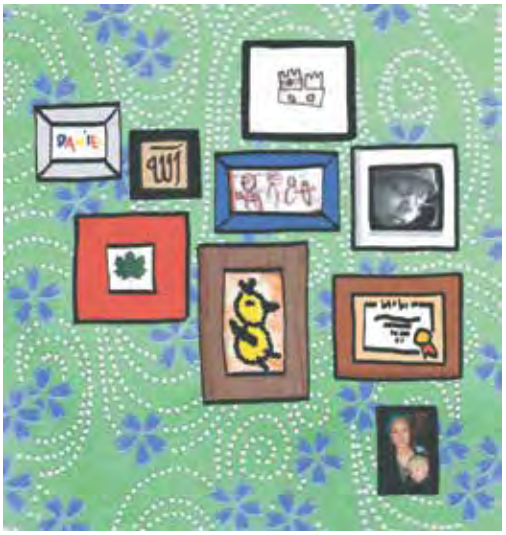

ইবাদত, জীবন ও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ওপর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ- এসবের মধ্যে একটি মজবুত সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সব ভালো কাজের লক্ষ্য সেই সত্তাকে সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত, যিনি সব কল্যাণের ও সত্যের উৎস। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায় হলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী আমাদের নিজেদের ও আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনে কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করা। আমরা পরিশ্রম, ভালো কর্ম, সততা, অন্যের প্রতি সাহায্যকারী মনোভাবের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিকতা মজবুত করি এবং এভাবেই আমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। তাছাড়া অন্যকে সাহায্য করার মাধ্যমে, অন্যের জীবন, সম্পদ, সম্মানের অধিকারকে শ্রদ্ধা করার মাধ্যমে মূলত আমাদের নিজেদেরকেই সাহায্য করি। আর এসব কাজ করার জন্য আমাদের সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর নির্দেশের প্রতি সচেতনতার পাশাপাশি তাঁর সুন্দর গুণাবলির চর্চার প্রয়োজন। আর এভাবেই আমরা আল্লাহ তা'আলার রহমতে সচেতন বান্দা হিসেবে যা সঠিক এবং ভালো সে কাজে সফলভাবে লিপ্ত থাকার শক্তি অর্জন করতে পারব।

নিজেকে জানো: আরব শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা

স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ইজতিহাদ বা গবেষণার প্রবল চাহিদা: The United Nations Arab Human Development Report, 2009-এ বর্তমান আরব বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি হতাশাজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। আরবদের একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও আজ তারা অন্যান্য জাতি থেকে পিছনে পড়ে আছে। অন্যদিকে, ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ ভিত্তিক এক গবেষণায় দেখা যায়- আরব দেশগুলো প্রকাশনা শিল্পেও বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। আর এক্ষেত্রে ইউরোপ রয়েছে সর্বাগ্রে যারা আরব বিশ্ব থেকে প্রায় পাঁচগুণ এগিয়ে।

উপরোল্লিখিত রিপোর্টটি আরব দেশগুলো ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা অসমতা নির্দেশ করে। কর্তৃত্বপরায়ণ আরব দেশগুলো নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টায় এতটাই নিবদ্ধ যে

সেখানে সৃজনশীলতা ও যুক্তিতর্ক রহিত হয়ে গেছে। "স্বাধীনতা যা ভুয়া নিরাপত্তার নামে পরহস্তে সমর্পিত, যা সেন্সরশিপে আবদ্ধ এবং যা স্বেচ্ছা নিয়োগকৃত পাহারাদারের কাছে জিম্মি -তাকে মূলত স্বাধীনতা বলা যায় না। বরং এটি স্বাধীনতার অস্বীকার। আর এ অস্বীকৃতির প্রথমত শিকার হলো সৃজনশীলতা, উদ্যোগ, নতুনত্ব এবং জ্ঞান[৩] (The Economist, 2003)।

সে যা হোক, বাবা-মা সরকারের ওপর তাদের সন্তানের দায়িত্ব দিয়ে নিজেরা ভারমুক্ত হতে পারেন না। সন্তানের আদর্শ এবং প্রথম শিক্ষক হিসেবে তাদেরকেই এসব চ্যালেঞ্জ ও বাধা পেরিয়ে সমাজ পরিবর্তনের প্রভাবক হিসাবে কাজ করতে হবে। একটি গাড়ির সাথে যদি তুলনা করি তবে বাবা-মায়েরা হচ্ছেন গাড়ির প্রজ্জ্বলন চাবি (Ignition Key- যা পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি গ্যাস জ্বলন করে গাড়িকে চালু করে); আর ড্রাইভার হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষকগণ যারা বাবা-মাকে কখন কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তার দিকনির্দেশনা দেন। এক্ষেত্রে যদি বাবা-মায়েরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তবে তারা আগ্রহ সহকারে সেই কাজে এগিয়ে আসবেন। সন্তানদের ওপর তাদের রয়েছে গভীর প্রভাব এবং তারাই পারেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্রকে ঢেলে সাজাতে।

[৩] Freedoms that are Hostage to False Matters of Security, to censorship and to self-appointed watchdogs of public morality are freedoms denied. (The Economist, 2003)

করণীয়

করণীয়- ২১: মুসলিম বিশ্বের পিছিয়ে পড়া বনাম জাপান-জার্মানির উন্নয়ন

একটি অনাড়ম্বর পরিবেশে তিনটি দম্পতির একটি গ্রুপের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করা যায়- জাপান এবং জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েও এখন তারা বিশ্বে প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থানে রয়েছে সেখানে মুসলিম দেশগুলো পিছিয়ে কেন?

কোন মুসলিম দেশগুলো এখনো নদীতে আবর্জনা ফেলে? কেন তাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নমানের? এবং কেন তারা সস্তামূল্যে বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি করে, আবার অধিক মূল্য দিয়ে সেই কাঁচামাল দিয়ে তৈরি শিল্পজাত পণ্য আমদানী করে? উদাহরণস্বরূপ- মাত্র ২০০০ ডলারের এক টন লৌহ আকরিক রপ্তানি করে আবার মিলিয়ন ডলার দিয়ে কম্পিউটার এবং ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এর কারণ কী? কেন মুসলিম বিশ্ব অশিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে কুরআনের পড়ো (ইক্বরা) নির্দেশ সত্ত্বেও?

করণীয়- ২২: শিশু ও তার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক তৈরিকরণ- কম বয়সেই!

পদ্ধতিগতভাবে যদিও প্রত্যহ পাঁচবার আমরা সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করি- তবে এমনও কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো পালন করে আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযুক্তি স্থাপন করা জরুরি।

শিশুদেরকে প্রতিনিয়ত আল্লাহকে স্মরণ করার (যিকির) শিক্ষা দেয়া উচিত। আর এটি শেখানোর সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে রসুল সা. ঘুম থেকে ওঠতে এবং পুনরায় ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যেসব দোয়া (নিম্নে দেয়া হলো) অনুশীলন করতেন, সেসব দোয়ার শিক্ষা দেয়া। তারা যাতে দোয়াগুলো মুখস্থ করে, প্রয়োগ করে- সেদিকে খেয়াল রাখা। সংক্ষিপ্ত এ দোয়াগুলো যা আমাদের মানসিক উন্নয়ন ও সঠিক আচরণের প্রতি ধাবিত করে (বিশেষ করে যখন আমরা খাবার শুরু করি ও যখন খাবার শেষ করি)। তাই, বাবা-মায়েদের উচিত নিম্নের দোয়াগুলো থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে নির্দিষ্ট করে যেকোনো একটি বা দুটি দোয়া

নির্বাচিত করা এবং শিশুদের ওপর সেসব দোয়ার অনুশীলন ঘটানো। যখন তাদের সেই দোয়াগুলো অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আরো দুটি বা একটি দোয়া নির্বাচন করে সেটি তাদের শেখানো। আর অবশ্যই শিশুদেরকে অর্থসহ দোয়া শেখাতে হবে।

(আরবি ভাষায় মুখস্থ করাটা যদি একান্তই তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে তবে তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় শেখাতে পারেন)।

ঘুম থেকে ওঠার দোয়া: সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার- যিনি আমাদেরকে মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত করেছেন এবং যার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

إذا أفاق من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور

ভোরের আলো দেখার পর দোয়া: সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা সকালে জেগে উঠেছি এবং বিশ্বমণ্ডলের সবকিছু আল্লাহ তা'আলার।

إذا رأي نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله

আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সময় দোয়া: আমি সেই একক সত্তার প্রশংসা করছি- যিনি আমাকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যেভাবে উত্তমভাবে সৃষ্টি করেছ আমার চরিত্রকেও উত্তম করে দাও।

إذا نظر إلى المرآة قال: الحمد لله الذي خلقني فسواني،
اللهم حسن خُلُقي كما أحسنت خَلْقي

পোশাক পরার দোয়া: সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য পোশাক দিয়েছেন এবং আমার জীবনকে সুন্দর করেছেন।

إذا لبس ثوباً قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به
عوراتي وأتجمل به في حياتي

মসজিদে প্রবেশের দোয়া: হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার দয়া ও জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা খুলে দাও।

إذا دخل المسجد قال: اللهم أفتح لي أبواب
رحمتك وانشر علي خزائن علمك

খাওয়ার পর দোয়া: প্রশংসা তার যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলিম বানিয়েছেন।

إذا أكل طعاماً قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا
وسقانا فأروانا وجعلنا مسلمين

পানি খাওয়ার সময় দোয়া: প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি তাঁর করুণাবলে পানিকে আমাদের জন্য সুমিষ্ট করেছেন এবং আমাদের পাপের জন্য একে তিতা বা লবণাক্ত করেননি।

إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعل الماء فراتاً
برحمته ولم يجعله ملحاً أُجاجاً بذنوبنا

গোসলখানায় প্রবেশের দোয়া: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি ময়লা ও অশ্লীলতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।

إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني
أعوذ بك من الخبث والخبائث

গোসলখানা থেকে বের হওয়ার দোয়া: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করেছেন এবং সুস্থতা দান করেছেন।

إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া: আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি। আমি তাঁর ওপর ভরসা করছি এবং অধিনায়কত্ব ও বিপথগামী হওয়া থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই।

إذا خرج من البيت قال: بسم الله توكلت على الله اللهم إني
أعوذ بك أن أضل أو أُضل

ঘরে প্রবেশের দোয়া: আল্লাহ তা'আলার নামে আমরা প্রবেশ করি এবং তার নামেই বের হই যার ওপর আমরা ভরসা করি।

إذا دخل البيت قال: بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا

করণীয়- ২৩: আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের উপলব্ধি

ওপরের কিছু নিয়মতান্ত্রিক দোয়া ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেদের একান্ত কিছু চাওয়ার ধারণা শিশুদের মধ্যে দেয়া উচিত। যাতে তারা নিজ ভাষায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়তে পারে, প্রয়োজন পূরণের কথা বলতে পারে এবং সেই একান্ত চাওয়া-পাওয়া বাবা-মায়েদের সাথেও শেয়ার করে।

করণীয়- ২৪: সমস্যার পরিপেক্ষিত পর্যালোচনা করা

মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত ছোটো ছোটো অনুগ্রহসমূহেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস আমাদের সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তির দিকে ধাবিত করে, যা আমাদের ঈর্ষা, তিক্ততা বা বিষাদ হওয়া থেকে বিরত রাখে। এটিই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সুখী থাকার প্রধান উপায়।

> আমি একজন অল্পবয়স্ক মহিলাকে চিনি। যিনি খুব গুরুতর সমস্যার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। তার বাবা-মার মাঝে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাকে অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করতে হয়। পূর্ণকালীন চাকরি করতে না পারার কারণে আর্থিক সমস্যারও সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সে সবসময় প্রফুল্ল চিত্তে থাকত। তার মতে, "যদি আমি সকালে সুস্থভাবে উঠতে পারি এবং নিজের পায়ে হাঁটতে পারি, তাহলে আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ।"

অন্যকথায় তোমার যা আছে সেটিতেই মনোনিবেশ করে তা থেকে সর্বোৎকৃষ্টটা বের করে নিয়ে আসার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাও।

নিম্নের হাদিসে এ দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম পাওয়া যায়:

রসুল সা. বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে দেখে যে তার চারপাশ নিরাপদ, সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সেই দিনের জন্য তার যথেষ্ট খাবার আছে- তাহলে এটি এমন যে পৃথিবীর সবকিছুই তার কাছে আছে।" (তিরমিযি, ইবন মাজাহ)

করণীয়- ২৫- শিশুকে শেখানোর মতো সাতটি ধারণা

শিশুকে নিচের হাদিসটি পড়তে দিন, তারপর প্রত্যেকটি বিষয়কে বাস্তবিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজেদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করুন-

"সাত ধরনের মানুষ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছাঁয়ায় থাকবে- যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না-

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২. আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকারী যুবক।

৩. এমন ব্যক্তি যার মন মসজিদে পড়ে থাকে, মসজিদ ত্যাগ করে পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত।

৪. দুজন ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহ তা'আলার জন্যই ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলার জন্যই মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়।

৫. সেই ব্যক্তি যে নীরবে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে, চোখের পানি ফেলে।

৬. সেই ব্যক্তি যে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও সুন্দর নারীর সান্নিধ্যে আসা থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখে এবং বলে- 'আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি'।

৭. সেই দানশীল ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী দান করেছে। (বুখারি, মুসলিম)

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ভূমিকা **১৯২**
- বাবা-মায়েরা যেসব মৌলিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন **১৯২**

  অভিজ্ঞতার অভাব **১৯৩**

  নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম: শিশু প্রতিপালনের কাজ একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব (২৪ঘণ্টা/৭দিন) **১৯৪**

  শিশু প্রতিপালন একটি অনমনীয় কাজ **১৯৫**

  শিশু প্রতিপালন হলো সময়, শ্রম ও টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ **১৯৫**

  শিশুর বিকাশে বাবা-মা ছাড়াও আরো অনেক কিছুর প্রভাব রয়েছে **১৯৫**

  ছোটো শিশুরা কথার মাধ্যমে ভাব প্রকাশে অক্ষম **১৯৬**

  প্যারেন্টিং বহুবিধ দক্ষতার সমন্বয় **১৯৭**

  বাবা-মাকে একটি টিমের মতো কাজ করতে হবে **১৯৮**

  সন্তান লালন-পালনে সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অপরিহার্য **১৯৮**

  বাবা-মা সম্পর্কে সন্তানদের উপলব্ধি বাবা-মায়ের ধারণার বিপরীতও হতে পারে **১৯৯**

  শিশুকে কখন কী বলতে হবে তা জানুন **১৯৯**

  শিশুর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল ধারণার অনুপ্রবেশ **২০১**

  নিজের দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা **২০২**
- শিশু প্রতিপালন সম্পর্কে বাইবেলের কিছু উদ্ধৃতি **২০৩**
- উপসংহার **২০৪**
- করণীয়: ২৬ **২০৫**

ভূমিকা

সামাজিক মূল্যবোধ, শিশু লালন-পালনের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা ও ফলাফল নির্ণয়ের মৌলিক মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা আমরা পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে করেছি। সেখানে আমরা উত্তমভাবে শিশু লালন-পালনের জন্য বাবা-মায়ের সহজাত জ্ঞানের সাথে সাথে এ বিষয়ক সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজনকে তুলে ধরেছি। আমরা এক্ষেত্রে সহজ ও নমনীয় নীতি (Flexible Approach) উপস্থাপন করেছি যাতে বাবা-মায়েরা তাদের নিজেদের সুবিধা ও প্রয়োজন মতো এর কাটছাঁট ও কিছুটা পরিবর্তন করে রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন ও পরিবার গঠন করতে পারেন। আর এভাবেই আশা করা যায় তারা শিশুদের ধার্মিক, দায়িত্বশীল এবং সামাজিকভাবে দক্ষ নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে পারবেন। আমরা এক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি যে, শিশুর উত্তম বিকাশ কেবল বাবা-মায়ের মানসিক শান্তি আর সুখী পরিবার গঠনের জন্যই জরুরি নয়, বরং এর আরো ব্যাপক প্রতিক্রিয়া রয়েছে; এর মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও সভ্যতার মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে।

একটি ভালো পরিকল্পনা শিশু লালন-পালনের মতো অনেক কঠিন কাজকেও তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ করে দিতে পারে। তবে ভালো পরিকল্পনা করতে হলে শিশু প্রতিপালনের বাধা ও অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে আগে থেকেই সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এই অধ্যায়ে আমরা শিশু প্রতিপালনের কিছু বাধা ও চ্যালেঞ্জ আলোচনা করব এবং সেগুলো সমাধানের কিছু উপায় তুলে ধরব। এসব বিষয়গুলো পূর্ববর্তী অধ্যায়েও কিছুটা স্পর্শ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এগুলোর বিস্তারিত ও পুনরালোচনা আমাদের একটি পরিপূর্ণ ধারণা দেবে এবং বাবা-মায়েদের বর্তমান সময়ের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হতে সহায়তা করবে।

বাবা-মায়েরা যেসব মৌলিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন

প্যারেন্টিং ততক্ষণ বেশ সহজই মনে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর গুরুত্ব ও কীভাবে সেটি করতে হয় তা উপলব্ধি করতে না পারি। যে মুহূর্তে এ উপলব্ধি আসে সে মুহূর্ত থেকেই এটি কঠিন মনে হতে থাকে।

শিশু: বাবা-মা আমাদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে;
বাবা-মা: ছেলে-মেয়েদের জন্য পাগলই হয়ে যাচ্ছি;
একে অন্যের প্রতি এই দোষারোপ বন্ধ করুন!
সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন
সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করুন এবং
একত্রে সমস্যার সমাধান বের করুন,
ধৈর্য সহকারে॥

আমাদের জীবনটা কঠিন সব পরীক্ষায় পরিপূর্ণ আর সন্তান লালন-পালন হলো তন্মধ্যে কঠিনতম একটি। তবে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পুরস্কারও অমূল্য। এ পরীক্ষায় বাবা-মায়েরা যেসব বাধার সম্মুখীন হবেন আগে থেকে সেগুলোর প্রকৃত গভীরতা জানা থাকলে তা তাদের জন্য সহায়ক হবে। এতে তারা কাজটিকে একদিকে যেমন হালকাভাবে নেয়া থেকে বিরত থাকবেন অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কঠিন ভেবেও আতঙ্কিত হবেন না। এটি তাদের সামনে চলার পথে ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

যদি বাবা-মায়েরা সন্তান লালন-পালনকে নিরতিশয় সহজ মনে করেন তবে তারা এর জন্য সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। আবার যদি মনে করেন যে, এটি অতিশয় কঠিন তবে তারা হতাশ হয়ে পড়বেন। ফলে তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে নাও চাইতে পারেন। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমরা চেষ্টা করব বাধাসমূহের গভীরতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে। আশা করব বাবা-মায়েরা এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। অন্যান্য বাবা-মায়ের অভিজ্ঞতার কথা জানলে তারা নিজেদের সমস্যার সাথে অদ্ভুত রকম মিল দেখতে পাবেন এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করবেন এ দেখে যে, তারা এ সংগ্রামে একা নন।

এখন দৃষ্টি দেয়া যাক বাবা-মায়েরা যেসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেন এমন কিছু উদাহরণের দিকে -

অভিজ্ঞতার অভাব

যখন কেউ প্রথম বারের মতো বাবা-মা হন তখন অভিজ্ঞতার অভাব একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। বাবা-মায়ের কেউই জানেন না কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। যদিও সবারই কিছু তত্ত্বগত জ্ঞান থাকে কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব থেকেই যায়। এক্ষেত্রে অন্যান্য বাবা-মায়ের সাথে কথা বলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ব্যাপারটি অনেকটা কোনো প্রশিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই কাজ করতে করতে প্রশিক্ষণ পাবার মতো বিষয় (On-the-job Training without Supervisor)।

আক্ষরিক অর্থে! কানের সাহায্যে প্যারেন্টিং

পূর্বে শিশু প্রতিপালন একটি অতি সাধারণ বিষয় ছিল যখন তোমার মা তোমাকে শুধু কান ধরে টেনে আনতে পারত।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন ও দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের চাপ অনেক সময় প্যারেন্টিং-এর কাজকে আরো চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। অনেক সংস্কৃতিতে মায়েরা দিনে বাসার কাজ করেন আর বাবা বাসার বাইরে উপার্জন করেন। সন্ধ্যায় মা বাইরে যেতে চান এবং বাবারা বাসায় ফিরে বিশ্রাম নিতে চান। এ অবস্থা বাবা-মায়ের মধ্যে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে যদি তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল না হন।

পিতৃত্ব মানে শুধু সন্তানের আহার যোগাড় আর তাদের বৈষয়িক চাহিদা পূরণই নয়।

আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সন্তানদের মুখে আহার আর মাথার ওপর ছাদ দিলেই পিতৃত্বের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম: শিশু প্রতিপালনের কাজ একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব (২৪ঘণ্টা/৭দিন)

শিশু প্রতিপালনের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। বাবা-মাকে এ কঠিন বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে হয় যে, সন্তান লালন-পালন দিনে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিন, বছরে ৫২ সপ্তাহের চাকরি; এতে কোনো ছুটি নেই, সাপ্তাহিক বন্ধ নেই, বাৎসরিক অবকাশ নেই সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার কোনো সুযোগই নেই। বিবাহ বিচ্ছেদ থাকলেও "সন্তান বিচ্ছেদ" (Children Divorce) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। একবার এ দায়িত্ব কাঁধে আসলে তা সারা জীবনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

কোনটি বেশি কঠিন: বাবার দায়িত্ব নাকি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির?

"আমি এ দুটোর যেকোনো একটি দায়িত্ব নিতে সক্ষম, হয় আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেব অথবা এলিসের বাবার দায়িত্ব পালন করব। দুটো একসঙ্গে আমার পক্ষে সম্ভব নয়"।

-থিওডোর রুজভেল্ট
(১৮৫৮-১৯১৯), US President
(Porter and Cervantes, 2007)

"লাখ লাখ লোকের জন্য আমার একটি নির্দেশই যথেষ্ট, কিন্তু আমি আমার তিন কন্যাকে কিছুতেই সময়মত নাস্তার টেবিলে আনতে পারি না"।

ব্রিটিশ অফিসার ওয়াভেল
(১৮৮৩-১৯৫০)
(Shaw, 1998)

শিশু প্রতিপালন একটি অনমনীয় কাজ

শিশু জন্মগ্রহণের পর বাবা-মা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী প্রতিপালনের দায়িত্ব-কর্তব্যকে স্থগিত, পুনঃনির্ধারণ অথবা অবহেলা করতে পারেন না। শিশু তার নিজের গতিতে বড় হতে থাকে এবং বাবা-মাকে তার এই শরীরবৃত্তীয় বিকাশের ব্যাপারটি বুঝতে হয়। বাবা-মা চাইলেই নিজেদের ইচ্ছামতো শিশুর বিকাশের গতি কমাতে পারেন না আবার বাড়াতেও পারেন না। যদি তারা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক এ প্রবণতাকে বাধাগ্রস্ত করেন তবে তারা নিজ হাতে নিজ সন্তানের বিপর্যয় ডেকে আনবেন। পৃথিবী দ্রুতগতিতে ছুটছে, কিন্তু শিশুর তাড়া নেই। বুদ্ধিমানের কাজ হবে সাধারণ স্বভাবকে মেনে নিয়ে প্রকৃতিগত গতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান- আর এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের।

শিশু প্রতিপালন হলো সময়, শ্রম ও টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ

শিশু প্রতিপালন একটি ধীরগতির কাজ। এ কাজে লম্বা সময় ধরে লেগে থাকতে হয়। সন্তানের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব তৈরিতে এবং তার নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশে অনেক বছর লেগে যেতে পারে।

শিশুর বিকাশে বাবা-মা ছাড়াও আরো অনেক কিছুর প্রভাব রয়েছে

বাবা-মাকে শিশুর চারপাশের জগৎ সম্পর্কে (যা নিয়তই পরিবর্তনশীল) যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা [সুবিধার পাশাপাশি] বাবা-মায়ের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বর্তমানে শিশুরা প্রযুক্তির সমুদ্রে বসবাস করে, যেমন: টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সেলফোন, অনলাইন চ্যাট রুম, ডিজিটাল গান, ডিভিডি এবং কম্পিউটার গেমস ইত্যাদি। এসবের প্রভাবে চিত্র তারকা, মডেল তারকা ও পপস্টার প্রীতি অবিশ্বাস্য গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে বাবা-মায়ের পাশাপাশি এদের কঠিন প্রভাব শিশুদের ওপরও পড়ছে। এক কথায় বলা যায় যে, বাবা-মায়েদেরকে বর্তমানে টিভি তারকা, ইন্টারনেট ও শিশুদের চারপাশের ব্যক্তিত্বের (Peer Pressure) সাথে রীতিমত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়।

চারপাশের পরিবেশের অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব শিশুর উপর পড়ে। যদিও বাবা-মায়েরা সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার সফলতার কৃতিত্ব কিংবা তা না হতে পারার ব্যর্থতার দায়ভার সম্পূর্ণ নিজেদের কাঁধে নেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুর বিকাশে বাবা-মায়ের প্রভাবই একমাত্র অনুঘটক নয়, এ প্রক্রিয়ায় আরো অনেক প্রভাবক বিরাজমান। বাবা-মায়েরা সন্তান লালন-পালনে নিজেরা প্রত্যয়ী ও সচেতন হতে পারেন, কিন্তু তারা ইন্টারনেটের নগ্নতা, রাস্তায় বখাটেদের উৎপাত এবং প্রচারমাধ্যমের অশ্লীলতাকে কমাতে অসমর্থ। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে বাবা-মাই শিশুদের বিকাশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন; তথাপি সন্তানরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের ওপর বন্ধু-বান্ধবের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং এটি তাদের কলেজ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ে তারা তাদের বন্ধুদের মূল্যবোধ এবং আচরণকে অনুকরণ করে। বয়ঃসন্ধিকালে (সাধারণত ১০ বছর বয়সে) তারা তাদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া শুরু করে এবং বাবা-মা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিতে থাকে। শুধু বন্ধু-বান্ধবই নয়, অনেক সময় বড় ভাই-বোনরাও তাদের বিকাশে দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলে। তারা বড় ভাই-বোনদের (বয়সের পার্থক্যের ওপর অনেক সময় নির্ভর করে) হুবহু অনুকরণ করে এবং তাদেরকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। অপরদিকে, সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রও দেখা যায়; অনেক সময় তারা একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঈর্ষার পাত্র হিসেবে নেয়। এছাড়াও পরিবেশগত চলকসমূহ (Environmental Variables) যেমন: তাদের ভৌগলিক অবস্থান, পরিবারের আকৃতি, আর্থ- সামাজিক অবস্থান, দেশের প্রধান ধর্ম এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির আন্তঃসম্পর্ক প্রভৃতিও শিশুর বিকাশে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

ছোটো শিশুরা কথার মাধ্যমে ভাব প্রকাশে অক্ষম

একবার কল্পনা করে দেখুন যে, পশু-পাখিদের সাথে যোগাযোগ করা কতটা কঠিন। এবার শিশুদের কথা চিন্তা করুন। শিশুরা কথা বলে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না বিধায় তাদের প্রয়োজন, অনুভূতি এবং চিন্তা

সম্পর্কে জানা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, একেবারে ছোটো বয়স থেকেই শিশুকে বই পড়ে ও কুরআন তিলাওয়াত শোনানো উচিত। কেননা শিশুরা কথা বলতে পারার আগেই শব্দ মনে রাখতে শুরু করে।

অকল্পনীয় অনুভূতি!

আমি যখন ১৪ বছরের বালক তখন মনে হতো আমার বাবা কিচ্ছু জানে না, এ পুরনোকালের মানুষটির সাথে থাকা অসহ্যকর। কিন্তু আমি যখন একুশে পা দিলাম তখন উপলব্ধি করলাম এ লোকটি কতটা জানে।

Mark Twain

আহা! আহা! এতদিনে আমি বুঝলাম ...

সন্তানরা তাদের বাবা-মায়েদের ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু চল্লিশে এসে আকস্মিকভাবে তারা তাদের মতোই হয়ে যায়- যেন পুরনোর পুনরাবৃত্তি।

-Quentin Crewe, American Writer

সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

আহা, আমার ছেলে ছোটো বয়সে আমাকে যতটা বিস্ময়কর (Wonderful) ভাবত, আমি যদি তার অর্ধেকটাও হতাম! হায়, আজ আমার টিনেজ ছেলে আমাকে যতটা স্টুপিড ভাবে, তার অর্ধেকটাও যদি আমি হতাম!

Rebecca Richards (Brown-1994)

প্যারেন্টিং একটি যথাসময়োচিত কাজ (Timely Duty)

আমরা সন্তান লালন-পালনে অনেক ভুল করে থাকি। কিন্তু সব থেকে বড় ভুল হলো সঠিক সময়ে সন্তানদের প্রয়োজনকে পূরণ না করা, তাদেরকে উপেক্ষা-অবহেলা করা, তাদের জীবনের প্রবাহের চাহিদাকে সময়মতো গুরুত্ব না দেয়া। আমাদের জীবনের অনেক কাজ পরে করলেও চলে, কিন্তু সন্তানদের বিকাশের চাহিদাকে অপেক্ষমান রাখা যায় না। যখন তার হাড় শক্ত হচ্ছে, তার শারীরিক আকৃতি গঠিত হচ্ছে, তার মন গঠন প্রকৃতি লাভ করছে তখন আমরা এ প্রক্রিয়াকে বলতে পারি না - আজ এগুলো থাক, আজ আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, কাল এগুলো করা যাবে। এসবের জন্য আজকের দরকারী কাজগুলো আজই সারতে হবে।

-জি. মিস্ট্রাল
Nobel Laureate, Chile, ১৯৮৬

প্যারেন্টিং বহুবিধ দক্ষতার সমন্বয়

সন্তান সুষ্ঠু প্রতিপালনে দরকার জটিল কিছু দক্ষতার সমন্বয় (যার অনেকগুলো এমনকি আমরা খেয়ালও করি না)। সন্তান লালন-পালনের জন্য অনেক ধরনের জ্ঞানের ওপর দখল থাকতে হয়, যেমন: মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মেডিসিন, জীববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, শিল্প এবং কলা। শিশু লালন-পালন কলা এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয়েরই সমন্বয়। আমাদের চারপাশের জগৎ যতই পরিবর্তিত হচ্ছে

শিশু লালন-পালনে চ্যালেঞ্জ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে প্যারেন্টিং-এ দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনও দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার মানে এ নয় যে, সুখী পরিবার গঠনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকতে হবে। সঠিক ও কার্যকরি পারস্পরিক যোগাযোগের দক্ষতা সফল প্যারেন্টিং-এর একটি মৌলিক উপাদান।

বাবা-মাকে একটি টিমের মতো কাজ করতে হবে

বাবা-মায়ের পক্ষে টিমের মতো কাজ করাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ; এটি সহজ কাজ নয়। স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে কাউকে বেছে নেয়া মানে তারা শুধু স্বামী অথবা স্ত্রীই নয়, বরং তারা ভবিষ্যৎ বাবা-মাও। আমাদের কতজন বিয়ের আগে এমন চিন্তা করে? একটি টিম হিসেবে কাজ করার জন্য কেবল ভালোবাসা এবং আন্তরিক হওয়াই যথেষ্ট নয়। এছাড়া আরো কিছু বিষয় রয়েছে যা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন: জ্ঞান, দক্ষতা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। তদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যে, কোনো কিছু খারাপ দেখলে তারা একে অপরকে দোষারোপ করবে না; তারা একে অন্যকে দায়ী করবে না যে তার কারণেই এমনটি হয়েছে। মনে রাখতে হবে, তাদের সন্তানরা প্রতিনিয়ত একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের এ সময়টায় বাবা-মায়ের পারস্পরিক সহযোগিতা একটি বড় ভূমিকা রাখে।

সন্তাল লালন-পালনে সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অপরিহার্য

পরিবারের অর্থনৈতিক বিষয় দেখার জন্য একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে, শিক্ষা বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য একজন টিউটর রাখা যায় বা স্বাস্থ্যের পরিচর্যার জন্য একজন নার্সকে নিয়োগ দান করা সম্ভব। কিন্তু পরিবারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব (Family Management) বাবা-মাকেই নিতে হয়। এ কাজ অন্য কাউকে দিয়ে সম্ভব না। বাবা-মা যদি পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে করতে না পারেন তবে অন্য কেউ তা করে দিতে পারবে না। আর এ সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন

ভালোবাসা, স্নেহ, সময় এবং মনোযোগ। এটি হলো পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা বাবা-মাকেই পালন করতে হয়।

সোভিয়েত রাশিয়ার মার্ক্সবাদীদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত বাবা-মা থেকে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব অন্যদের দেয়া হয়েছিল। একই উদাহরণ দেখা যায় গ্রিসের স্পার্টাদের প্রাথমিক দিকে। দুটি ক্ষেত্রেই ফলাফল বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একক প্যারেন্টদের (Single Parent) জন্য সময় এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সাধারণ পরিবারের থেকে আরো অনেক বেশি। কেননা তার একহাতে অনেক কাজ করতে হয়; ফলে একসাথে অনেক কাজ করার কৌশল তাকে অবলম্বন করতে হয়।

বাবা-মা সম্পর্কে সন্তানদের উপলব্ধি বাবা-মায়ের ধারণার বিপরীতও হতে পারে

সন্তানরা অনেক সময় তাদের বাবা-মায়েদের সহযোগিতাকে অযাচিত হস্তক্ষেপ, তাদের ভালোবাসা ও যত্নকে বাড়াবাড়ি এবং তাদের পরামর্শ বা উপদেশকে কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণ বলে মনে করতে পারে। বাবা-মায়ের কাছে বাস্তবতাটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ছোটোদের কাছে তার নিজের উপলব্ধিই হচ্ছে তার বাস্তবতা। এজন্যই তাদের চিন্তা, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করুন: "আমি তোমার জন্য যা করেছি সেটি তোমার কেমন লেগেছে"?

শিশুকে কখন কী বলতে হবে তা জানুন

একটি গল্প থেকে বড়রা যা শিখবে শিশুরাও একই শিক্ষা পাবে এমন কোনো কথা নেই। বাবা-মাকে তার সন্তানদের কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের বয়সানুযায়ী বোধগম্য হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায়, তাদের কাছে তা পৌরাণিক কাহিনীর মতো মনে হবে।

বাবা-মা নিজেদের কাজকে সহজ করার জন্য অনেক সময় শিশুদের সরলতা ও অজ্ঞানতার সুযোগ নেন। যেমন: শিশু যখন ডালিম জাতীয় ফল খায় তখন কিছু বাবা-মা তাদের বলেন, 'সবগুলো দানা খেতে হবে, একটি দানাও কাপড়ে বা মাটিতে ফেলো না। এর মধ্যে যেকোনো একটি দানায় বিশেষ নিয়ামত আছে।' এভাবে তারা শিশুদের এমনভাবে প্রলুব্ধ করেন যাতে শিশুরা সচেতনভাবে প্রতিটি দানা খায়, আর তারা কাপড়ের দাগ থেকে ও সেই দাগ

উঠানোর পরিশ্রম থেকে রেহাই পান। একইভাবে অনেক বাসায় ভাতের ক্ষেত্রে এমনটি বলা হয়। যেমন: 'ভাত ফেলো না, ফেললে ভাতের প্রতিটি দানা কবরে সাপ হয়ে কামড়াবে,' এভাবে শিশুদের ভয় দেখিয়ে সতর্কতার সাথে ভাত খেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ উপায়গুলো বাবা-মায়েরা ব্যবহার করেন টাকা ও সময় বাঁচানোর সহজ কৌশল হিসেবে; এর মাধ্যমে তারা শিশুদের মিতব্যয়িতা, সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মনে রাখতে হবে সন্তানদের বিবেক-বুদ্ধিকে কুসংস্কার মুক্ত রাখা জরুরি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুদের জানা জরুরি যে, এগুলো মিথ বা বানানো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

পশ্চিমা শিশুদের মাঝে সান্তাক্লস সম্পর্কে ব্যাপক মাত্রায় একটি পৌরাণিক ধারণা প্রচলিত আছে যে, ক্রিসমাসের সময় সান্তাক্লজ শিশুদের জন্য উপহার নিয়ে আসে। এটি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর, এমনকি স্রষ্টার চেয়েও সান্তাক্লজ-এর ওপর বিশ্বাস তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই বাবা-মাকে সাবধান হতে হবে শিশুকে কখন কী বলতে হবে সে বিষয়ে।

আপনার শিশুকে কখন কী বলবেন?

কোন বয়সের জন্য এ গল্পটি উপযুক্ত?

একটি সিংহ, নেকড়ে বাঘ আর একটি শিয়াল মিলে একটি গরু, ছাগল আর একটি খরগোশ শিকার করল। সিংহটি নেকড়েকে বলল, "শিকারগুলোকে ভাগ করো"। নেকড়ে বলল, "গরুটি তোমার, ছাগলটি আমার আর খরগোশটি শেয়ালের"। এ কথায় সিংহটি নেকড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করল। এবার সিংহ শিয়ালকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি শিকারগুলোকে কীভাবে ভাগ করবে?" শিয়ালটি উত্তর দিলো, "খরগোশটি আপনার নাস্তার জন্য, ছাগলটি লাঞ্চের (দুপুরের খাবার) জন্য আর গরুটি রাতের খাবারের জন্য"। অতঃপর সিংহটি শিয়ালকে জিজ্ঞাসা করল, "এমন বিচক্ষণতা তুমি কোথায় শিখলে?" শিয়ালটি উত্তর দিলো, "নেকড়ের বিচ্ছিন্ন মস্তক থেকে"।

যখন এ গল্পটি শিশুদের বলা হবে, তারা শিখবে- ভয়, কাপুরুষতা ও কপটতা। অথচ এ একই গল্প থেকে বড়রা শিখবে কীভাবে সতর্ক ও সাবধান হতে হয়।

শিশুদের গল্প বলার ক্ষেত্রে সময়জ্ঞানটা জরুরি। তাদেরকে শিক্ষণীয় কিছু বলার ক্ষেত্রে তা বয়সোপযোগী কিনা তা মাথায় রাখতে হবে।

শিশুর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল ধারণার অনুপ্রবেশ

নিচে কিছু সত্য ঘটনা সম্পর্কে জানা যাক -

ঘটনা-১: আব্দুস সালাম কিন্ডার গার্টেনের বাথরুমে যেতে চায় না। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- কেন সে বাথরুমে যেতে চায় না? সে বলল, আমার বাবা-মা আমাকে বলেছে যে, বাথরুমে জিন - শয়তান থাকে। তাই আমি একা বাথরুমে যেতে ভয় পাই।

ঘটনা-২: বালক আব্দুল হামিদ দ্বিধান্বিত। তাকে বলা হয়েছে - ফেরেশতারা বাথরুমে প্রবেশ করে না। তাকে আরো বলা হয়েছে দুজন ফেরেশতা তার কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করার জন্য সবসময় তার কাঁধে অবস্থান করছে। তাহলে ফেরেশতা দুজন তার সাথে বাথরুমে যায় কি? আব্দুল হামিদ কিছুতেই বুঝতে পারছে না কোনটি ঠিক!

কিছু বাবা-মা শুকরের গোশত খাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটিকে শিশুদের ভুলভাবে বোঝিয়ে থাকেন। তারা এভাবে বলেন যাতে মনে হয় শুকর প্রাণীটা হারাম; প্রকৃতপক্ষে শুকর খাওয়া হারাম। ফলে শিশুরা মনে করে শুকর খুব খারাপ একটি প্রাণী; এদের ঘৃণা করতে হবে এবং এদের সাথে নির্দয় আচরণ করা সাওয়াবের কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সকল প্রাণীই আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সৃষ্টি। তবে এদের কোনো কোনোটি খাওয়ার উপযোগী নয়। কিছু প্রাণী আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্য হিসেবে সরাসরি সম্পর্কিত; কিছু প্রাণী আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তাদেরকে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রাণীকেই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে।

"আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মাঝখানে যা কিছু রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি।" (সুরা সাদ, ৩৮: ২৭) তাই আমাদের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি দয়ালু হতে হবে।

কিছু অতি আগ্রহী এবং অতি সচেতন বাবা-মা অপরাধী মানুষকে ঘৃণা করার ব্যাপারে শিশুদের ভুল ধারণা প্রদান করেন। তারা খারাপ কাজ এবং কাজ সম্পাদনকারীকে আলাদা করতে পারেন না। যেমন তারা ধূমপান এবং ধূমপায়ী উভয়কেই ঘৃণা করেন। একারণেই শিশুরা মানুষকে ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা করতে শেখে; খারাপ কাজ সম্পাদনকারীকে ভালোবেসে তার ভুল শুধরানোর পরিবর্তে তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে যেতে শেখে। এভাবে তারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে ওঠে।

নিজের দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা

দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে চারপাশে প্রচলিত মিথ, ফ্যাশন ম্যাগাজিন, হলিউড ও পপ তারকাদের সৌন্দর্যের প্রচার- প্রভৃতির বদৌলতে ছেলে-মেয়েরা (বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণীরা) সহজেই এক মোহের ফাঁদে পা দিয়ে বসে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণের নামে পুষ্টিহীনতা ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের শিকার হয়। মেকআপ এবং পোশাকের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ে। এভাবে তারা বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলোর তৈরি দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বদানের প্রচারে প্রতারিত হয়ে বিশ্বাস করে যে 'চিকন' মানেই 'সুন্দর'।

বর্তমানে শিশুদের প্রতি বয়স্কদের অনুকরণের চাপ অনেক ছোটো বয়সেই শুরু হয়ে যায় (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দুমাসের শিশু মেয়েকে সাঁতারের পোশাক হিসেবে বড়দের অনুকরণে বিকিনি পড়ানো, খুব ছোটো বয়সে নিজস্ব মোবাইল ফোন দিয়ে দেয়া, নেটে অ্যাডাল্ট সাইট ভিজিট, ইত্যাদি)। এভাবে তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নিষ্কলুষ আনন্দময় শৈশব। যেসব বাবা-মায়েরা চান তাদের সন্তানরা শৈশব উপভোগ করুক তাদের প্রতি এটি বিরাট এক চাপ। বর্তমানে ভোগবাদের সমাজে ব্যবসায়ীদের সুচতুর কৌশল ও অধিক মুনাফার আশায় অপ্রাপ্তবয়সেই ছেলেমেয়েদের সেক্সুয়ালাইজেশন করা সম্পর্কে বাবা-মাকে সচেতন থাকতে হবে (Williams, 2002)। [যেমন: কিছু ব্যবসায়ী বাজার পাবার উদ্দেশ্যে বালিকাদের জন্য "সেক্সি হ্যালুইন ড্রেস" নামে পোশাক বাজারে ছেড়েছিল।]

শিশুদের আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ আসা উচিত সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, চারপাশের ভালোবাসা এবং পারিবারিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে, মিডিয়ার শেখানো কৃত্রিম চমৎকারী চটকদার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রতিযোগিতা থেকে না (যেমন: টাকা, ক্ষমতা বা খ্যাতির মাধ্যমে না)।

শিশু প্রতিপালন সম্পর্কে বাইবেলের কিছু উদ্ধৃতি

> শুনুন, ওহে ইসরাইল: ঈশ্বর আমাদের মনিব, তিনি এক। (Deuteronomy, 6: 4)

শিক্ষা ১: সঠিক অগ্রাধিকার নির্বাচন করো! বাবা-মা কীভাবে সন্তানদের অগ্রাধিকার নির্বাচনের শিক্ষা দেয়? আমরা কি জানি সেটি কোনো কাজে আসে না, যতক্ষণ না আমরা জানি কোনটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা অন্তিম সত্তাকে (God) ভুলে যাই তবে আমরা নগদ কিছু ক্রীতদাসে পরিণত হই।

> তোমার উচিত তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে স্রষ্টাকে ভালোবাসা। (Deuteronomy, 6: 5)

শিক্ষা ২: নিয়মের থেকে সম্পর্ক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ম-নীতির মূলনীতি হলো, অল্পকিছু গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক, সহজ ও রূপান্তরযোগ্য নিয়মসমূহ তুলে ধরা। নিয়ম খারাপ নয়, তবে মনে রাখতে হবে নিয়ম-নীতি অভ্যন্তরীণ আচরণের চেয়ে বাহ্যিক আচরণ পরিবর্তন করে। অন্যপক্ষে, ভালোবাসা একজনের হৃদয় ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার আচরণের পরিবর্তন করে।

> এবং আজ আমি তোমাদের যা আদেশ করব তা তোমাদের হৃদয়ে রাখবে। (Deuteronomy, 6: 6)

শিক্ষা ৩: ঐশী কিতাবের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করা। স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিধি-নিষেধ সন্তানদের শেখানোর পূর্বে বাবা-মায়েদের নিজেদের জীবনে অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলে কিছু কথা আছে যা আগে বাবা-মায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তারপর শিশুদের সাথে। বাবা-মায়ের যা নেই তা তারা অন্যকে কীভাবে দেবে? তাই তারা যা প্রচার করবে তা আগে নিজেদের চর্চা করতে হবে। যা তারা নিজেদের ঘরে চর্চা করতে পারেন না তা অন্যদের করতে বলা উচিত নয়।

> এবং তুমি তোমার সন্তানদেরকে ধৈর্যসহকারে তা শেখাবে। (Deuteronomy, 6: 7)

শিক্ষা ৪: বাবা-মা সন্তানদেরকে কী পরিমাণ সময় দিচ্ছেন তা বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং কতটুকু কার্যকরী সময় (Quantity of Quality Time) দেয়া হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মায়ের উচিত শিক্ষাদানের সুযোগগুলো সাদরে গ্রহণ করা এবং তার জন্য পরিকল্পনা করা। প্রয়োজনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে

শিশুদের শেখানো যায়। বাবা-মায়েরা সন্তানদের সবকিছু দিতে আগ্রহী থাকে কিন্তু যেটা তাদের সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি ছাড়া - আর তা হলো সময়। অনেক সমাজ কর্ম-কেন্দ্রিক, পরিবার-কেন্দ্রিক নয়। আমাদের শিডিউলকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, প্রয়োজনের অগ্রাধিকার অনুযায়ী শিডিউল করতে হবে।

> সন্তানদের সাথে কথা বলো- যখন তোমরা ঘরে থাকো, যখন বাইরে যাও, যখন শুয়ে থাকো এবং যখন তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠো। (Deuteronomy, 6: 7)

শিক্ষা ৫: স্মরণের জন্য পুনরাবৃত্তি খুবই জরুরি। বাবা-মায়ের উচিত মূল্যবোধ সম্পর্কে মুখে বলা, এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, পুনরাবৃত্তি করা এবং স্পষ্ট করে বলা। এটি যথাযথ, বোধগম্য এবং সহজ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। দেখাও এবং বলো: বাবা-মা শিশুদেরকে সেসব আত্মীয়-স্বজন, ধর্মীয় নেতা, দা'ঈ, ইমাম এবং অতিথিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন যারা বাবা-মায়ের শেখানো মূল্যবোধের মূর্তপ্রতীক। এতে শিশুরা তাদের কাছ থেকেও মূল্যবোধগুলো শিখবে ও তার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপসংহার

শিশু প্রতিপালন একদিকে যেমন আনন্দদায়ক ও বাবা-মায়ের জন্য প্রতিদানে পরিপূর্ণ; তেমনি এ কাজে প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে অনেক। যেমন: খারাপ বন্ধুদের প্রভাব, প্রচার মাধ্যমে যৌনতা, ভুল যোগাযোগ ও অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এছাড়াও প্যারেন্টিং বিষয়ে সমাজে রয়েছে অনেক ভুল ধারণা, মিথ এবং কল্প-কাহিনী যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানব।

করণীয়

করণীয়- ২৬: গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা

আপনার শিশুর কাছে আপনার নিজের জীবনের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করুন:

তুমি কি জানো সেটি কোনো কাজে আসে না, যতক্ষণ না তুমি জানো কোনটা গুরুত্বপূর্ণ (Priority, অগ্রাধিকার)।

আমাদের শিডিউলকে অগ্রাধিকার না দিয়ে; প্রয়োজনের অগ্রাধিকার অনুযায়ী শিডিউল করতে হবে।

তোমার হৃদয় স্রষ্টার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করো, তবেই তুমি অন্যদেরকে ভালোবাসা বিলাতে পারবে। তোমার যা নেই তা তুমি অন্যকে দিতে পারবে না।

বাবা-মায়ের জন্য: আপনার উপদেশকে আগে নিজের চর্চায় আনুন। একটি ছবি এক হাজার শব্দের চেয়ে শক্তিশালী। আর একটি বাস্তব উদাহরণ একটি ছবির এক হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রচলিত ভুল ধারণা, ভ্রান্তি ও জনশ্রুতি এবং এ থেকে বাঁচার উপায়

- ভূমিকা **২০৮**
- প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করা ও গুপ্ত ফাঁদগুলো সম্পর্কে সচেতন করা **২০৮**
  উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্যারেন্টিং পদ্ধতিগুলোর অন্ধ অনুসরণ **২০৮**
  অপরের অন্ধ অনুকরণ **২০৮**
  সন্তানের মাধ্যমে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছার পূর্ণতা দেবার চেষ্টা **২০৯**
  পিতৃত্ব-মাতৃত্বের দায়িত্বভার অন্যের কাঁধে অর্পণ করা **২১০**
  শিশুকে শুধু যুক্তি দিয়ে বুঝানোকেই যথেষ্ট মনে করা **২১০**
  শক্তি প্রয়োগ করে সন্তানকে বশীভূত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা **২১১**
  বাবা-মা সন্তানদের থেকে বড় এবং সন্তানরা তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন **২১২**
  সব সন্তানকে একই ছাঁচে ফেলা **২১২**
  ছোটোদের কাছ থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ আশা করা **২১৩**
  শিশুরা যা চায় তাই কিনে দেয়া **২১৪**
- সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস, জনশ্রুতি (Myth) এবং এর খণ্ডন **২১৪**
- করণীয়: ২৭-২৮ **২২০**

ভূমিকা

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করেছি যে, একটি শিশুর ভালোভাবে গড়ে ওঠার প্রয়োজন শুধু বাবা-মায়ের মানসিক শান্তি আর পরিবারের সুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজ এবং সভ্যতারও মূল ভিত্তি। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব এবং বাবা-মায়েদের যেসব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা কিছু বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা তুলে ধরব, সেই সাথে কিছু 'ফাঁদ' নিয়েও আলোচনা করব। এখানে আরো থাকবে কীভাবে এ ফাঁদগুলো এড়িয়ে চলা যায় সে বিষয়ে আলোচনা। সবশেষে থাকবে প্রচলিত কিছু জনশ্রুতি (Myth) এবং তার খণ্ডন। এসব ভুল ধারণাগুলো তুলে ধরার কারণ হচ্ছে, প্যারেন্টিং-এ কী কী বাধা আসতে পারে তা সম্পর্কে বাবা-মায়েদের সচেতন করা। কারণ প্যারেন্টিং-এর চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আগে থেকেই ভালো ধারণা ছাড়া একটি ভালো প্যারেন্টিং প্ল্যান কখনোই সম্ভব নয়।

প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করা ও গুপ্ত ফাঁদগুলো সম্পর্কে সচেতন করা

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্যারেন্টিং পদ্ধতিগুলোর অন্ধ অনুসরণ

অনেক সময়ই আমরা আমাদের আচরণগত অভ্যাসগুলো আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করি। এগুলো যে সবসময় কার্যকর বা সর্বোত্তম তা কিন্তু নয়। বরং অনেক সময়ই দেখা যায় এদের অনেকগুলোই ঠিক যুগোপযোগী নয়, এমনকি কোনো কোনোটি অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিকরও বটে। একজন মা বলেছিলেন, "যে মুহূর্তে আমি গর্ভবতী হলাম, সে মুহূর্ত থেকে আমি আমার মা-এর মতো হয়ে গেলাম"। কিছু বাবা-মা বিনয় আর কৃতজ্ঞতা থেকে ঘোষণা করে দেন যে, তাদের বাবা-মা তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে বড় করেছেন। একথা সত্যি যে, আমাদের সবারই বাবা-মায়ের কাছ থেকে অনেক বেশি আদর-ভালোবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু তাদের সবারই যে ইতিবাচক প্যারেন্টিং সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান বা দক্ষতা ছিল তা কিন্তু বলা যাবে না।

অপরের অন্ধ অনুকরণ

অন্য কোনো বাবা-মায়ের পুরোপুরি অন্ধ অনুকরণ প্যারেন্টিং এর সঠিক

পদ্ধতি হতে পারে না। মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিশুরই নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব থাকে যা অন্য শিশুর থেকে ভিন্ন। তাই এক শিশুর জন্য যা ভালো তা অন্য শিশুর জন্য ভালো নাও হতে পারে। বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানকে ভালোভাবে জানা ও সেই সন্তানের জন্য কোনটা ভালো তা খুঁজে বের করা। অন্য বাবা-মায়েদের পরামর্শ নেয়া অবশ্যই জরুরি। তবে এ সময় মনে রাখতে হবে যে, প্যারেন্টিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে এসব পদ্ধতির কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ একেক ক্ষেত্রে একেক পদ্ধতি কার্যকর। যেমন: অনেক বাবা-মা সন্তানদের সাথে বেশ নমনীয় আর উদার থাকেন, আবার কেউ হয়তো সন্তানদের বেলায় কঠোরতা অবলম্বন করতে পছন্দ করেন।

প্রতি পদক্ষেপেই নতুন চমক

"নতুন বাবারা দ্রুতই বুঝে যান যে, সন্তান মানুষ করা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ক্রমাগত উদ্ভাবনের এক মরিয়া প্রয়াস" (Desperate Improvisation)।

(Bill Cosby, Actor)

"প্যারেন্টিং এমন বিষয় নয় যে আমরা এটি শিখে নিয়ে তারপর শুরু করি বরং এটি শুরু হওয়ার পর করতে করতে শিখি"।

(Elkind, 1995)

সন্তানের মাধ্যমে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছার পূর্ণতা দেবার চেষ্টা

সন্তানের মাধ্যমে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছার পূরণ আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত একটি ভুল প্যারেন্টিং আচরণ। এমন অনেক বাবা-মাই আছেন যারা সন্তানদের মাধ্যমে নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করেন। এমনকি অনেক সময় সন্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি তোয়াক্কা না করেই তারা সন্তানদের ওপর নিজেদের পছন্দ চাপিয়ে দেন। যেমন: আমরা অনেককে দেখি যারা নিজেরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি তারা নিজেদের সেই অপূর্ণতা থেকে সন্তানদের বাধ্য করেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। আমাদের মনে রাখা উচিত, সন্তান কখনোই বাবা-মায়ের সংযোজন নয়। সন্তানদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা রয়েছে।

বাবা-মায়েরা অনেক সময় সন্তানদেরকে নিজেদের একটি বর্ধিত অংশ ভাবতে পছন্দ করেন। তাই নিজেদের ভুলগুলোকে সন্তানদের মাধ্যমে শুধরে নিতে চান; এমনকি নিজেদের বাবা-মায়ের প্রতি করা অতীতের ভুলগুলোও অনেক সময় তারা নিজেদের সন্তানদের মাধ্যমে শুধরানোর চেষ্টা করেন। যখন কোনো বাবা-মা নিজেদের জীবনে কোনো

কিছু অর্জনে ব্যর্থ হন তখন সন্তানের মাধ্যমে সে ব্যর্থতা পুষিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন, খেলাধুলায় নিজেরা আকাঙ্ক্ষখানুযায়ী ভালো করতে না পারলে অনেক বাবা-মা চান তাদের সন্তানরা খেলাধুলায় চ্যাম্পিয়ন হোক। অনেকে নিজেদের জীবনে গণিত বা বিজ্ঞানে খারাপ করলে চান তাদের সন্তান আইনস্টাইন হোক। কেউ যদি রাজনীতিতে সফলতা না পান, তাহলে চান তাদের সন্তান বড় রাজনীতিবিদ হোক। কিন্তু বাবা-মায়ের মনে রাখতে হবে, মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব কখনোই দ্বিতীয় শৈশব নয়, আর সন্তানও মা-বাবার ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। জীবনের শুরু থেকেই সন্তানদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং প্রত্যেক বাবা-মায়েরই উচিত তাদের সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করা।

পিতৃত্ব-মাতৃত্বের দায়িত্বভার অন্যের কাঁধে অর্পণ করা

অনেকে মনে করেন যে, প্যারেন্টিং-এর দায়িত্ব বাবা-মা কিংবা যেকোনো একজনের পালন করলেই চলে। সত্যিকার অর্থে, বাম হাত যেমন ডান হাতের বিকল্প হতে পারে না আবার ডান হাত যেমন বাম হাতের দায়িত্ব নিতে পারে না, ঠিক তেমনি মা কিংবা বাবা কেউই একজন আরেকজনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন না। একটি সন্তানের বেড়ে ওঠার পিছনে বাবা-মা দুজনেরই নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দাদা-দাদি, নানা-নানি, অন্য কোনো আত্মীয়, বেবি সিটার (Baby Sitter) বা কাজের বুয়া কেউই কখনোই বাবা-মায়ের প্রতিস্থাপক হতে পারে না। তারা বাবা-মায়ের সাহায্যকারী হতে পারে ঠিকই কিন্তু কখনোই বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিকল্প হতে পারে না।

শিশুকে শুধু যুক্তি দিয়ে বুঝানোকেই যথেষ্ট মনে করা

সন্তান ও বাবা-মায়ের সম্পর্ক শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর সরল সমীকরণ নয়। বাবা-মা আর সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক একমাত্র যুক্তির ওপর ভিত্তি করে হয় না। এ সমীকরণে অভ্যাস, আবেগ-অনুভূতিরও স্থান রয়েছে।

যেমন ধরুন, কোনো বাবা-মা যদি সন্তানকে ফলমূল বা শাকসবজি খেতে উদ্বুদ্ধ করতে চান তাহলে, "খাও, এসব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তোমার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর মিনারেল এ খাবারে রয়েছে।" - এরকম যুক্তি দিলেই কাজ হয়ে যাবে এমনটি ভাবা ঠিক নয়, এক্ষেত্রে ভালোবাসা-আবেগ ইত্যাদিরও প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যুক্তির প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু যুক্তিই যথেষ্ট নয়।

শক্তি প্রয়োগ করে সন্তানকে বশীভূত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা

বাবা-মায়েরা শক্তি প্রয়োগ করে সন্তানের বিরুদ্ধে দু-একটি যুদ্ধে হয়তো ঠিকই জয়লাভ করতে পারেন, কিন্তু পরিণতিতে সন্তানের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সাধারণত দেখা যায় পরবর্তী সময়ে তারা বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রদর্শনের মাধ্যমেই এর প্রতিশোধ নেয়। কেউ হয়তো তার দশ বছরের মেয়েকে বা ছেলেকে তাদের অযৌক্তিক ইচ্ছা পূরণে জোরপূর্বক বাধা দিতে পারেন, কিন্তু সেই মেয়েটিই যখন তেরোতে পা দেবে তখন সম্ভাবনা থেকে যায় যে, সে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে খারাপ প্রভাবে পড়ে অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে কিংবা ছেলেটি হয়তো কিশোর বয়সে গাড়ি চুরি করে নিয়ে বড় ধরনের একটি দুর্ঘটনায় পড়বে। এভাবে একদিন বাবা-মা যে "শক্তির যুদ্ধের" সূচনা করেছিলেন (ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়া চিন্তা না করেই), কয়েক বছর পর সন্তান হয়তো সেই 'যুদ্ধে' জয়ী হতে চাইবে। কাজেই কোনো বাবা-মায়েরই উচিত না সন্তানের সঙ্গে শক্তি প্রদর্শনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। সন্তানকে প্রতিপক্ষ করে যুদ্ধ না করে বরং বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদেরকে নিজেদের দলে ভিড়ানো। আর সেটি করতে হলে বাবা-মাকে সন্তানের কথার ভালো শ্রোতা হতে হবে, তার সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে, ভালোবাসা আর যুক্তি দিয়ে তার সাথে ভালো বুঝাপড়া করতে হবে। এটি খুবই সূক্ষ্ম একটি কৌশল, যার জন্য প্রয়োজন অনেক ধৈর্যের; আর সেই সাথে প্রয়োজন সন্তানের সাথে সাবলীল সম্পর্ক ও সুগভীর সমঝোতার (Effective Communication)।

বাবা-মা সন্তানদের থেকে বড় এবং সন্তানরা তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন

বাবা-মা সন্তানদের থেকে বড়, তাদের গায়ের জোর বেশি ও তাদের ক্ষমতা বেশি এসব কারণে যদি তারা ভীতিপ্রদর্শন করে কিংবা বলপ্রয়োগ করে সন্তানদের কথা শোনাতে চায়, তবে সন্তান বড় হলে একই আচরণ বাবা-মায়ের সাথে করতে চাইবে। সন্তানরা একসময় বড় হবে, তাদের গায়ে জোর হবে, বাবা-মায়েদের একথা মনে রাখতে হবে।

বাবা-মা সন্তানকে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন না করে যদি সন্তানদের বুঝিয়ে দেন যে সন্তান আর বাবা-মা একই দলে, তখন সন্তানরাও কীভাবে সুস্থ সমঝোতা ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় সেটি শিখে নেয়। এভাবে তারা বুঝতে পারে যে, বাবা-মায়ের ক্ষমতা তাদের নিজেদের ক্ষমতার পরিপূরক। যেসব বাবা-মা সন্তানদের বাধ্য করে বা জোর করে কাজ করাতে চান, তারা এটি বুঝতে ব্যর্থ হন যে, সন্তানদের একটু ভালোবাসা আর বুঝ দিয়ে একই কাজ করানো যায়। বরং সেক্ষেত্রে ফল আরো অনেক ভালো হয়। যদি ভালোবাসা আর বুঝ দিয়ে একই ফল পাওয়া যায়, তাহলে আমরা জোর কেন করব?

তাদেরকে সন্তান হিসেবে বড় করুন - "আপনি নায়ক তৈরি করছেন না, সন্তান লালন-পালন করছেন। সন্তানদেরকে সন্তান হিসেবে বড় করুন, একদিন তারা নিজেরাই নায়কে পরিণত হবে; অন্তত আপনার কাছে"।

(Schirra, 2001)

সব সন্তানকে একই ছাঁচে ফেলা

বাবা-মায়েরা অধিকাংশ সময় মনে করেন যে, সব সন্তানই একই প্রকৃতির। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একটি পরিবারের সন্তানরা হচ্ছে এক তোড়ায় কয়েক রকম ফুলের মতো; সবাই এক গুচ্ছে আবদ্ধ থাকলেও এক একটি ফুল এক একদিকে মুখ করে থাকে। এক পরিবারের সন্তান হলেও সবার মধ্যে কোনো না কোনো ভিন্নতা থাকেই। কেউ হয়তো বেশি ধৈর্যশীল, কেউ বেশি সামাজিক, কারো আবার রয়েছে ভিন্ন রকম শখ। বাবা-মা একটু নজর দিলে সহজেই বুঝতে পারেন তাদের কোন সন্তানের কী বিশেষত্ব রয়েছে, কোন সন্তানের কোন বৈশিষ্ট্য তার অন্যান্য ভাই-বোন থেকে ভিন্ন। কখনো কখনো ভাই-বোনদের মধ্যে অবাক করা ভিন্নতাও দেখা যায়, এর পিছনে অনেক ধরনের কারণ থাকতে পারে। এসব কারণে এটি ধারণা করা

ভুল যে, সব সন্তানের সঙ্গে একই আচরণ সমান ফল দেবে।

ছোটোদের কাছ থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ আশা করা

অনেক বাবা-মাই ভুল করে ভেবে থাকেন যে, তাদের সন্তান ক্ষুদ্র আকারের একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (Small Adult) এবং তাদের সাথে সেভাবেই আচরণ করেন। প্রাচীন গ্রিক-রোমান পৌত্তলিক তত্ত্বে শিশুদের ছোটো আকারের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ভাবা হতো। Al-Jarajrah (1988, in Arabic) প্রাচীন গ্রিক আর রোমানদের ধারণা থেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, একজন শিশু পূর্ণবয়স্ক মানুষ থেকে ভিন্ন। তিনি তার লেখাতে বর্ণনা করেছেন যে, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে শৈশবকাল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন পিয়াজেট (Jean Piaget) শিশুদের Cognitive Development (বৌদ্ধিক বিকাশ/বোধোন্নয়ন) নিয়ে কাজ করার পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতি শিশুদের নিষ্পাপ জগতের জটিলতাগুলোকে ভুল বুঝে আসছিল। তার আগ পর্যন্ত বহুল প্রচলিত ছিল গ্রিক-রোমান তত্ত্ব, যাতে শিশুদের ছোটো আকারের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ভাবা হতো এবং শিশুদের সাথে ক্ষুদ্র আকারের প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই আচরণ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। শিশু যেমন ক্ষুদ্র আকারের প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরাও বড় আকারের শিশু নন।

বাস্তবে, বাবা-মায়েদের সন্তানের মানসিক জগতটা ভালোভাবে বুঝতে হবে, যদিও এটি খুব সহজ কাজ নয়। শিশুদের শারীরিক চাহিদাগুলো বুঝতে পারা সহজ (যেমন: শিশু ক্ষুধা নিয়ে কান্না করলে তাকে খাওয়ানো, ঘুম আসলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া, কাপড় ভিজিয়ে ফেললে কাপড় পাল্টে দেয়া ইত্যাদি), কিন্তু তাদের মানসিক চাহিদা বোঝতে পারা ততটা সহজ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদেরই নিজেদের মানসিক জগত সম্পর্কে যেখানে ধারণা করা কঠিন, সেখানে শিশুদের মানসিকতা বুঝা কঠিনতো বটেই।

শিশুরা বাবা-মায়ের প্রশিক্ষক

"বিবাহের তাৎপর্য এই নয় যে, এর মাধ্যমে মানব শিশুর জন্ম হয়। বরং শিশু লালন-পালন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাপ্তবয়স্করা পরিপূর্ণতা লাভ করে।"

(Peter De Vries in Coloroso, 2002)

শিশুরা যা চায় তাই কিনে দেয়া

বাবা-মায়ের উচিত নয় সন্তান যখন যা চায় তখনই সেটি কিনে দেয়া; শিশুদের প্রতিটি চাওয়া বা ইচ্ছা যাচাই-বাছাই না করেই পূরণ করে দেয়া ঠিক নয়। বাবা-মায়ের উচিত ছেলে-মেয়েদেরকে চাওয়া আর প্রয়োজনের পার্থক্য বোঝানো এবং তাদেরকে বোঝানো যে জীবনে সবকিছুই সহজপ্রাপ্য নয়। এখানে নেয়া যেমন আছে, দেয়াও তেমনি রয়েছে। বাবা-মা যদি সন্তানের জন্য ছোটোবেলা থেকে অনেক কিছু কিনে দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তবে তারা নিজেদের অজান্তেই সন্তানের ক্রমবর্ধমান দাবির ফাঁদে পড়ে যাবেন। সন্তান যত বড় হবে তাদের দাবিও ততো বাড়তে থাকবে। তখন তারা একটির পর একটি এমন দাবি করতে থাকবে যা পূরণ করা যেমন একদিকে অসম্ভব হয়ে পড়ে তেমনি সন্তানদের সেই বদভ্যাস থেকে ফিরিয়ে আনাও দুরূহ হয়ে ওঠে। গাড়ি, জামা-কাপড়, খেলনা, সিডি, ডিভিডি, ইত্যকার নতুন নতুন জিনিস সে অবিরত চাইতেই থাকে।

সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভ্রান্তবিশ্বাস, জনশ্রুতি (Myth) এবং এর খণ্ডন

এটি সত্যি যে, মানব জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারটাকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে অনেক দম্পতি বাবা-মা হতে আগ্রহী হন, কারণ নতুন সদস্য ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। কিন্তু তার মানে এটি নয় যে, এ রকমের বাস্তবতাগুলোকে তাদের চোখের আড়াল করে রাখতে হবে। বাস্তবতার বিপরীতে প্যারেন্টিং সম্পর্কে সমাজে অনেক ভুল ধারণা ও মিথ (Myth) প্রচলিত রয়েছে। যেমন: উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- অনেক বাবা-মা মনে করেন যে, সন্তান লালন-পালন সর্বদাই আনন্দের কাজ; কেউ কেউ মনে করেন বাবা-মা ভালো হলে সন্তান আপনা আপনিই ভালো হয়ে যাবে; অনেকে এমনও ভাবেন যে, কেবল ভালোবাসা আর স্বজ্ঞা বা প্রাকৃতিক অনুভূতি (Intuition) থাকাটাই ভালো বাবা-মা হওয়ার জন্য

যথেষ্ট। এছাড়াও প্যারেন্টিং সবার মধ্যে স্বভাবজাত একটি ব্যাপার, কিংবা সন্তান সহজেই বাবা-মায়ের ত্যাগকে মূল্যায়ন করতে শিখে যাবে বা পারিবারিক মূল্যবোধগুলো সন্তানের মধ্যে সহজেই স্থাপন করা যায়- এমন সব ভুল ধারণাও সমাজে বহুল প্রচলিত আছে। সত্যিকার অর্থে এ বিশ্বাসগুলো কোনোটাই প্রকৃত বাস্তবতার প্রতিফলন নয়। পরবর্তী অংশে আমরা প্যারেন্টিং নিয়ে এমন কিছু বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা খণ্ডন করার চেষ্টা করব। (Knox and Schacht,1997)

জনশ্রুতি (Myth) ১: সন্তান লালন-পালন সবসময় আনন্দের

টিভি'র পর্দায় ছোটো ছোটো মিষ্টি ছেলে-মেয়েদের তাদের বাবা-মায়ের সাথে পার্কে কিংবা বাড়ির উঠানে খেলা করার আনন্দঘন চিত্র দেখে হবু বাবা-মায়েরা মনে করতে পারেন যে, সন্তান লালন-পালন বিষয়টি পুরোটাই এই বিজ্ঞাপন চিত্রের মতো অফুরন্ত আনন্দের। কিন্তু বাস্তবতা আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আনন্দের অভিজ্ঞতার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- মানুষ এটি গ্রহণ কিংবা বর্জনের ব্যাপারে স্বাধীন। কেউ চাইলে সে এটি দুহাত পেতে নিতে পারে, আবার ভালো না লাগলে ছেড়ে চলেও যেতে পারে। কিন্তু সন্তান লালন-পালন বিষয়টি সে রকম ইচ্ছাধীন কোনো ব্যাপার না। সন্তান লালন-পালন সার্বক্ষণিক এক দায়িত্ব এবং বাবা-মাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা সে আনন্দের হোক বা নাই হোক। একবার এ কাজে ঢুকে গেলে এর থেকে বের হওয়ার আর কোনো উপায় নেই; তা বাবা-মায়েরা পছন্দ করুন আর নাই করুন।

জনশ্রুতি (Myth) ২: ভালো বাবা-মায়ের সন্তান সবসময়ই ভালো সন্তান হবে

অনেকেই মনে করে থাকেন যে, যেসব সন্তান 'নষ্ট' হয়ে গেছে (ড্রাগ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ইত্যাদি খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছে) তাদের বাবা-মায়েরা সন্তানের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি। আমরা প্রায়ই সন্তানের অপরাধের জন্য মা-বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক বাবা-মাই সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করে তোলার সবরকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও সন্তানরা ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি (যেমন: উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হযরত নুহ আ.-এর সন্তান)।

অপরদিকে, অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, মা-বাবা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও সন্তান ভালো মানুষরূপে গড়ে উঠেছে (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসা আ., যিনি ফিরাউনের ঘরে বড় হয়েছিলেন; ইবরাহিম আ., যার পিতা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন)।

জনশ্রুতি (Myth) ৩: সন্তানমাত্রই বাবা-মায়ের ত্যাগের সঠিক মূল্যায়ন করবে

অনেক বাবা-মাই ভেবে থাকেন যে সন্তানের সব চাহিদা পূরণ করা হলে সন্তান নিজ থেকেই বাবা-মায়ের এহেন ত্যাগ তিতিক্ষার সঠিক মূল্যায়ন করতে শিখে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় হয় না। অনেক বাবা-মা সন্তানকে যে আদর, ভালোবাসা আর যত্ন দিয়ে মানুষ করেন, সন্তানের কাছে তার সঠিক মূল্যায়ন পান না। আবার কেউ কেউ মনে করেন সন্তান যা চায় তাদেরকে তাই দিয়ে দিলে সন্তান তাদের মূল্যায়ন করবে। তাদের এ ধারণা প্রায়শই ভুল প্রমাণিত হয়। বরং এতে তাদের চাহিদা বাড়তে থাকে, তাদের নিজের অধিকারের সীমার পরিধি বেড়ে যায় কিন্তু অপরপক্ষে বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বের অনুভূতি তৈরি হয় না। অতিরিক্ত প্রাপ্তিতে বড় হওয়া ছেলে-মেয়েরা অনেক সময়ই মনে করে যে, তারা বাবা-মায়ের কাছে যা পাচ্ছে তা পাওয়া তাদের অধিকার এবং এর বিনিময়ে তাদের বাবা-মায়ের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তারা নিজেদের অধিকারের অংশটাকে অনেক বড় করে দেখে আর অন্যদিকে দায়িত্বের অংশটি দেখতে শেখে না।

জনশ্রুতি (Myth) ৪: প্যারেন্টিং মানুষের স্বভাবজাত

কেউ কেউ মনে করেন যে, প্যারেন্টিং মানুষের স্বভাবজাত, এর জন্য আলাদা কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞ আর অনভিজ্ঞ বাবা-মায়েদের মধ্যে অনেক তফাৎ লক্ষ করা যায়। অনভিজ্ঞ বাবা-মায়েরা সন্তানদের প্রয়োজন সহজে বুঝতে পারেন না, তাই সন্তান বড় হলে তার কাছ থেকে কোন ধরনের আচরণ পাবেন তা তারা ধারণা করতে পারেন না। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ বাবা-মায়েরা সন্তানদের চিন্তাভাবনা আর আচরণ সম্পর্কে অনেক বেশি স্বচ্ছ ধারণা

প্যারেন্টিং-এ কখনো কখনো হতাশা দেখা দেয়

সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো এমনও মনে হয়, যে মুখ আমাকে কামড়াচ্ছে সে মুখের জন্যই আমি খাবারের যোগান দিচ্ছি।

রাখেন। প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে অনেক বাবা-মাকেই তাদের নিজেদের বাবা-মায়ের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায়।

জনশ্রুতি (Myth) ৫: সন্তানদের খুব সহজেই পারিবারিক মূল্যবোধ শেখানো যায়

পারিবারিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণত আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বুঝি:

- গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা;
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে মূল্যায়ন করা;
- অন্যের সাথে মতবিরোধ হলে শান্তভাবে আলোচনা করে তার সামষ্টিক সমাধান বের করা;
- কষ্টকর হলেও সৎকাজ করা আর সৎপথে বলিষ্ঠ থাকা;
- প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করা;
- সর্বাবস্থায় সততার পন্থা অবলম্বন করা;
- অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া;
- সমাজ গঠনমূলক কাজে অংশ নেয়া;

স্বাভাবিকভাবেই এসব পারিবারিক মূল্যবোধ শেখানো সহজ কাজ নয়; এটি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

জনশ্রুতি (Myth) ৬: সন্তান লালন-পালনের জন্য বিবেক বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান আর ভালোবাসাই যথেষ্ট

সন্তান লালন-পালনে সাধারণ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির দরকার রয়েছে, কিন্তু সেই সাথে এ বিষয়ক শিক্ষা আর দক্ষতারও প্রয়োজন। এ বিষয়টি প্রতিনিয়ত ছোটো ছোটো ঘটনা-দুর্ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে সময়োপযোগী ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয়। এমন প্রতিটি ঘটনায় বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। মনে রাখতে হবে, বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়ার ধরনের ওপর নির্ভর করে তা সন্তানের ব্যক্তিত্বে ভালো, নাকি খারাপ প্রভাব ফেলবে। কাজেই সন্তানের প্রয়োজনে সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারা খুব প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার।

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার চারপাশের বিভিন্ন ব্যক্তি আর পরিস্থিতির সাথে তার অভিজ্ঞতার আলোকে। এটি একটি প্রক্রিয়া, ব্যক্তিত্বের ধরন বাবা-মায়েরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেমন খুশি তৈরি করতে পারেন না। কেউ কাউকে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বস্ততা, লেখনীর মাধ্যমে সাহসিকতা, সঞ্চালনের দ্বারা পৌরুষত্ব বা

নারীত্ব শেখাতে পারে না। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব গঠনে দরকার শিশুদের শারীরিক আর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান। বাবা-মায়েরা চান তাদের কিশোর-কিশোরী ছেলে-মেয়েরা সহানুভূতিশীল, প্রতিশ্রুতিশীল, সাহসী ইত্যাদি গুণের অধিকারী হবে। কিন্তু শুধু চাইলেই হবে না, সফলভাবে সন্তানের মধ্যে এসব গুণ গড়ে তোলার জন্য বাবা-মাকে জানতে হবে, তারা এক্ষেত্রে কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

পাগলামি কি বংশগত?

"পাগলামি বংশানুক্রমিক, তবে আপনি সেটি [আপনার পূর্বপুরুষ থেকে নয়] আপনার সন্তান থেকে লাভ করেন [অর্থাৎ সন্তান আপনাকে পাগল করে দেয়]"।

Sam Levenson (Brown 1994)

"আপনি তখনই বিজ্ঞ হন যখন আপনি জানেন কীভাবে কোন জিনিসটি এড়িয়ে যেতে হবে"।

William James (Lazear 1993)

জনশ্রুতি (Myth) ৭: আত্ম-বিসর্জন সম্পর্কিত ভুল ধারণা

অনেক বাবা-মাই (সন্তানের প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ) মনে করেন যে, তাদের উচিত সন্তানের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু বিসর্জন দেয়া। অনেকে মনে করেন ধর্মই তাদেরকে এ শিক্ষা দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামে ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততিকে মানুষের জন্য আনন্দ আর অলংকারস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, অত্যাচার বা নিপীড়ন হিসেবে নয়।

> এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা। স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার মাধ্যম। (সুরা আল কাহাফ, ১৮: ৪৬)

বাবা-মাকে, বিশেষত মাকে যে কেবল একতরফা সন্তানের সার্বক্ষণিক সেবিকা হয়ে থাকতে হবে, তাদের জন্য সীমাহীনভাবে শুধু করেই যেতে হবে, এমনটি কিন্তু নয়। সাহায্য আর সেবা মায়েদেরও প্রাপ্য। বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের পাশাপাশি নিজেদের যত্নটা নিশ্চিত করা।

জনশ্রুতি (Myth) ৮: সন্তানকে বাবা-মায়ের সবকিছুর উর্ধ্বে গুরুত্ব দিতে হবে

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক মানুষের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি নয়।

> সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার নিজের ভাই, বোন, মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। সেদিন প্রত্যেকেই এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো কথা তার মনে থাকবে না। (সুরা আবাসা, ৮০: ৩৪-৩৭)

কাজেই প্রত্যেকেরই উচিত নিজ, নিজের সন্তান ও নিজের প্রভুর সাথে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা। রসুল সা. বলেছেন:

তোমার স্ত্রী/স্বামীর তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে, তোমার শরীরের তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে, তোমার স্রষ্টার তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে, তাই সবাইকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো। (বুখারি)

আর এ হাদিসে বর্ণিত প্রাপ্য অধিকারের মধ্যে পড়ে নিজের শরীর স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া, আনন্দ করা, নিজেদের ন্যায্য বাসনা পূরণ, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটানো, বিশ্রাম ও ছুটি কাটানো ইত্যাদি।

করণীয়

করণীয়- ২৭: ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

বাবা-মা হিসেবে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তা করুন কেন ও কীভাবে প্যারেন্টিং একটি কঠিন কাজ। আপনার সন্তানদের সাথে ব্যাপারটি আলোচনা করুন, এতে করে আপনার সন্তানরা বাস্তবতার কঠিন দিক সম্পর্কে ধারণা পাবে।

করণীয়- ২৮: সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করা

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পরিবারের সবার সাথে বসে আলোচনা করুন, তারপর এ বিষয়ে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। আপনার আলোচনায় সন্তান গড়ে তোলার আনন্দদায়ক আর কষ্টকর দুটো দিকই ফুটিয়ে তুলুন। আপনার জানামতে কারো প্রাসঙ্গিক কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে সবাইকে তা জানাতে পারেন।

এক বাবা বলেছেন, "সন্তানদের তৈরিই করা হয়েছে বাবা-মাকে শাস্তি দেয়ার জন্য"।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা। স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার মাধ্যম। (সুরা আল কাহাফ, ১৮: ৪৬)

হে মু'মিনগণ, তোমাদের স্বামী বা স্ত্রী (Spouse) ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো, আর তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সুরা তাগাবুন, ৬৪: ১৪)

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (সুরা তাগাবুন, ৬৪: ১৫)

সপ্তম অধ্যায়

যখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়

- ভূমিকা **২২২**
- রাগ, অবাধ্যতা, বদমেজাজ, ক্রোধ এবং অশ্রু **২২৪**
- অবাধ্য সন্তানকে নিয়মের মধ্যে আনার কিছু উপায় **২২৪**
- ভীতিপ্রদর্শন: আপনি এবং আপনার শিশু কী করবেন? **২২৬**
- আপনার শিশু বুলিড বা নির্যাতিত হলে পরবর্তী সময়ে কী ঘটতে পারে? **২২৭**
- টিনেজার: বয়ঃসন্ধিকালের ধারণা পর্যালোচনা **২৩০**
- টিনেজারদের এবং আমাদের ক্রোধ **২৩২**
- রাগী কিশোর-কিশোরীদের বাবা-মা হবার কারণে আমাদের মাঝেও ক্রোধের জন্ম হয় **২৩৪**
- আমাদের নিজেদের জন্য ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য কী করতে পারি? **২৩৫**
- উত্তম যোগাযোগের কিছু নীতি **২৩৫**
- করণীয়: ২৯-৩০ **২৩৮**

ভূমিকা

অন্য যেকোনো সম্পর্কের মতো বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের ব্যাপারেও সাফল্যের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। সম্পর্কে অনেক বিরূপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক সময় ঘটেও যায়। নবজাতকের নিষ্পাপ মুখের দিকে গর্বের সাথে তাকিয়ে আপনি আশা আর স্বপ্নে বিভোর হতেন। আপনার মনে ভেসে উঠতো সন্তানের সঙ্গে কাটানোর মধুময় সবকল্পনা। আপনি প্রত্যাশা করতেন ভালোবাসা, বিনয় আর সম্মানপূর্ণ এক মধুর পারস্পরিক সম্পর্কের। কত আশায়ই না আপনি বুক বাঁধতেন!

আর পনেরো বছর পরে এসে আপনি একা একা হয়তো ভাবছেন, এসব কী হয়ে গেল? আপনার যা যা করার ছিল আপনি করেছেন, আপনি আপনার তরফ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টাটি করেছেন। আপনি আপনার শিশুকে ভালোবাসা, শৃঙ্খলা আর বিশ্বাস দিয়ে বড় করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তারপরও আপনার সন্তান কী করে এক বিরাট টিনেজ বিধ্বংসী দৈত্যে পরিণত হলো?

একজন অভিভাবক যখন জানতে পারলেন যে, তার সকল বিষয়ে 'এ' গ্রেড পাওয়া ছেলেটির আবেগ ও অনুভূতির অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি[১] রয়েছে, তখন তিনি বড় আঘাত পেলেন। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ছেলেটি ছিল অপরিণত। অনেক সময় বাবা-মা বুঝতে পারেন না যে, তাদের সন্তানের আবেগগত সমস্যা আছে। বিশেষ করে সন্তান যদি ছাত্র হিসেবে ভালো হয় এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ স্বাভাবিক থাকে তবে সেটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে। বাস্তবিকপক্ষে শিশুরা ক্লাসে সেরা ছাত্র/ছাত্রী হলেও আবেগ ক্ষমতার[২] অভাব থাকতে পারে তাদের মধ্যে। অনেক সময় এটি বাবা-মায়ের চোখ এড়িয়ে গেলেও শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব অথবা আত্মীয়দের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সংকেত কিংবা মন্তব্য আসতে পারে। সেক্ষেত্রে বাবা-মাকে সে বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে অতি দ্রুত এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কেননা, প্রতিকারের ব্যবস্থার উদ্যোগ তাদেরকেই নিতে হবে।

---

[১] Emotional deficiency

[২] Emotional ability

এক মা বলেন, আমরা সুন্দর এক শহরতলিতে থাকি, আমাদের শিশুরা সেরা স্কুলে পড়ে এবং আমরা তাদেরকে প্রচুর সময়ও দিই, যেমন: তাঁবুতে অবকাশ যাপন, সাঁতারকাটা, বরফে স্কি করা ইত্যাদি। তারপরও আমার ছেলে এখন কারাগারে। এক রাতে সে একটি দোকান ডাকাতি করতে গেলে তার পায়ে গুলি লাগে। আমাদের কী ভুল ছিল?- নিজেকে এরূপ প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিয়েছি। তার বয়স তেইশ। কিছু বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় সে পড়েছিল, যারা মিলে এক রাতে চুরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এ ধরনের সমস্যা তৈরি হলে কী করা যেতে পারে- এ অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতীত নিয়ে অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনা কিংবা বাবা-মা হিসেবে আমরা কোথায় ব্যর্থ সেটি নিয়ে হা-হুতাশ করার চেয়ে সমস্যা মোকাবেলার উপরে জোর দেয়া ভালো।

রাগ, বদমেজাজ, জোর খাটানো এবং কিশোর-কিশোরীদের অসদাচরণ ও অভদ্রতার বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে আরো দেখানো হয়েছে যে, এ বিষয়গুলো উত্তরণের জন্য উন্মুক্ত আলোচনা বা উদার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এমন কোনো সমস্যা বা বিষয় নেই যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

কোনো সমস্যা যখন হয়েই যায়, তখন তার দায়ভার বাবা-মাকেই নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটি আপনারই দোষ বা আপনার ইচ্ছাকৃত ভুলের ফসল-ব্যাপারটি এমন নয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার সন্তান প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছার পথে তাদের এ পরিবর্তন নানা সংঘাতের জন্ম দেয়। এসবের জন্য আপনার নিজেকে বা আপনার জীবনসঙ্গীকে দোষারোপ করা অনুচিত। প্যারেন্টিং-এর অবশ্যম্ভাবী কষ্টকর অভিজ্ঞতার জন্য বাবা-মায়ের নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের মাধ্যমে এ বাধাগুলো অতিক্রম করা যায় এবং এভাবেই পিতৃত্ব-মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করা যায়। আপনার আশা ও প্রার্থনা; অন্য পরিবারের কাছ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা; দক্ষতা ও নির্দেশনাই দিতে পারে সাফল্যের নিশ্চয়তা।

রাগ, অবাধ্যতা, বদমেজাজ, ক্রোধ এবং অশ্রু

শিশুরা অনবরত শিখছে আর বড় হচ্ছে। তাদের এ শেখার ও ক্রমবৃদ্ধির পথে তারা বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার পরিমান পরীক্ষা করে নেয়। অনেক সন্তানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ক্ষমতার ও ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্বে রূপ নিতে পারে। কিছু শিশু আছে যারা নিজের চাওয়া পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সারা বাড়ি জুড়ে চিৎকার কিংবা ভাংচুর শুরু করে অথবা তার দিকে মনোযোগ না দেয়া পর্যন্ত সে অনবরত কাঁদতে থাকে। এ ধরনের একরোখা শিশুদেরকে বাবা-মায়ের হাজারো বক্তৃতাও থামাতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে নিরুপায় বাবা-মা সাধারণত সবচেয়ে সহজ উপায় হিসেবে যা করে তা হলো সন্তানদের কাছে নতি স্বীকার করা। এভাবে তাৎক্ষণিক সন্তানদের ঠাণ্ডা করা গেলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য এটি মারাত্মক একটি ভুল পন্থা। এতে শিশুদের মধ্যে এ ধারণা মজবুত হয় যে, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এসব অসদাচরণ খুবই কার্যকর। আবার অন্যদিকে চিৎকার, মারধর কিংবা শিশুর উপরে বল প্রয়োগও এ সমস্যার সমাধান করবে না। বরং বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা পদ্ধতিই হলো এর সমাধান যা সন্তানদের আপনার নিয়মকে শ্রদ্ধা করতে শেখাবে এবং নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে থাকতে সাহায্য করবে।

অবাধ্য সন্তানকে নিয়মের মধ্যে আনার কিছু উপায় বা টিপস্

শৃঙ্খলা বিধান[৩] আচরণের উন্নতি ঘটায়; শাস্তি ঘটায় এর অবনতি।

- চেঁচামেচি না করে স্বাভাবিক স্বরে কথা বলুন, আচরণ, ফলাফল বা পরিণতি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরুন। অবাধ্যতার ফলাফলের দিকে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করুন। এতে কাজ না হলে চোখে চোখ রেখে গভীর স্বরে[৪] কথা বলুন। কোনো ব্যবস্থা নেয়ার আগে এটি হলো প্রাথমিক পদক্ষেপ। দৃঢ় এবং শান্ত কণ্ঠস্বর ব্যবহার করুন; চিৎকার করবেন না।
- আপনার শিশুকে বুঝতে দিন যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ, আপনি সিরিয়াস বা গম্ভীর এবং তার চোখের দিকে সরাসরি তাকান। আপনার কথাগুলো তাকে স্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে কয়েকবার বুঝিয়ে বলুন। সে যদি মনোযোগ দিয়ে না শোনে, তাহলে আরো কাছাকাছি আসুন এবং বুঝিয়ে বলুন, কণ্ঠ এবং দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ রাখুন এবং শান্তভাবে কথার পুনরাবৃত্তি করুন।

---

[৩] Discipline

[৪] Firm Voice

- এতেও কোনো কাজ না হলে পরিণাম[৫] নীতি প্রয়োগ করুন। নিয়ম মেনে না চললে কী কী পরিণতি হতে পারে তার একটি তালিকা তাদেরকে দিন। এই পরিণতিগুলোকে কার্যকর করুন যাতে তাদের মনে এ নিয়মগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। অন্যথায় আপনার সতর্কবাণী তারা গুরুত্বের সাথে নেবে না। তারা যদি চিৎকার, ঘ্যান ঘ্যান বা রাগ দেখানো শুরু করে, এর জবাবে তাদের সাথে একই আচরণ করবেন না। ধীরস্থিরভাবে এ আচরণের পরিণতিগুলো শিশুকে স্মরণ করিয়ে দিন। তাকে মেনে নেয়ার মতো সময় দিন; তাৎক্ষণিক ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাকে সময় দিয়ে আপনি চলে যান (যেমন: তাকে বলতে পারেন, আমি আধাঘণ্টা পরে এসে দেখতে চাই তুমি মেঝেতে ছড়ানো কাপড়গুলো আলমারীতে তুলে রেখেছ)।
- বিভিন্ন ধরনের পরিণাম পদ্ধতি (Consequences) আছে যা বাবা-মা প্রয়োজন বিবেচনায় প্রয়োগ করতে পারেন। আপনার সন্তানদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখুন, তাদের কাছে কোন জিনিসটি খুব মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তা খুঁজে বের করুন এবং সময়মত তা সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করুন। এটি হতে পারে একটি খেলনা কিংবা কোথাও ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপার। যখনি শিশুটি অনুতপ্ত হবে বা শান্ত হবে, তখনি তাকে ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করুন। শিশু যদি এ আচরণ ত্যাগ না করে তবে আপনাকে পরিণামের পুনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে শিশু পরিণাম বা Consequence-এর ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে নেয়।
- "চিন্তার জায়গা" নামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করুন যেখানে শিশুকে থাকতে হবে যতক্ষণ না সে নিজের আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ সময় আপনি আপনার নিজের কাজ করতে পারেন। অবাধ্য সন্তান মাফ না চাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে বলে দিন। ক্ষমা চাইলে সাথে সাথে ক্ষমা করে দিন, ঘটনাটি দ্রুত ভুলে যান, যাতে আপনি স্বাভাবিক মুডে ফিরে আসতে পারেন। আপনি এ জায়গাটির যেকোনো নাম দিতে পারেন, যে নামটি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং এটি যে সুবিধা বঞ্চিত একটি

[৫] Rule of Consequence

অবস্থা সেটি তারা বুঝতে পারে। এ সময় কোনো কথোপকথন নয়, শিশুকে একা রাখতে হবে সেখানে। যে জায়গাটি বাছাই করবেন সেটি যেন একঘেয়ে ধরনের, অথবা সুনসান নির্জন হয়; তবে কোনোমতেই সেটি তার শয়নকক্ষ হবে না (খেয়াল রাখুন জায়গাটি যেন নিরাপদ কোনো জায়গা হয়, যেমন: কোনো ওষুধ বা বিষাক্ত, ধারালো কিছু যেন সেখানে না থাকে)। সেখানে শিশুকে পাঠিয়ে সেখানে তার অবস্থানের সময় নির্দিষ্ট করে দিন। সে যদি কৈফিয়ত দিতে চায় বা প্রতিবাদ করে, তবে তা অগ্রাহ্য করুন।

- শিশুরা যখন ভালো আচরণ করে, তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। কিন্তু ভালো ব্যবহারে উৎসাহিত করতে বা বদমেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাকে উৎকোচ দেবেন না। এটি একটি ভুল পন্থা, যা থেকে আপনার বেয়াড়া সন্তান কাজের কিছুই শিখবে না।

ভীতিপ্রদর্শন:[৬] আপনি এবং আপনার শিশু কী করবেন?

ভীতিপ্রদর্শন শিশুদের ক্ষতি করে এবং এটি ছোটোবেলা থেকেই মনে গভীর ক্ষত এবং চাপ সৃষ্টি করে। একে প্রাথমিক অবস্থায় চিহ্নিত করা গেলে মনের ক্ষত ও চাপ কমানো যায়। ভীতিপ্রদর্শন বলতে আপনার শিশুর বিদ্রুপ, হয়রানি বা আক্রমণের শিকার হওয়া বোঝায়। বাবা-মাকে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, বেশির ভাগ শিশুই নির্যাতনের শিকার হলে বাবা-মাকে সেটি বলতে গিয়ে ভয় পায়। আপনার শিশুর কোনো অস্বাভাবিক আচরণের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং কোনো বিপত্তি ঘটলে শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান। বুলিইং অনলাইন (http://www.bullying.co.uk) ভীতিপ্রদর্শন মোকাবেলার জন্য নিয়োজিত একটি ওয়েবসাইট। এর মতে, 'যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর প্রায় ১৬ জন শিশু নির্যাতনের ফলে মানসিক চাপের কারণে আত্মহত্যা করে। তাদের স্কুলের বক্তব্য প্রায়ই এ রকম হয় যে, কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে কিছুই জানত না। কিন্তু যারা নির্যাতন করেছে তারা এবং তাদের বন্ধুরা ঠিকই জানত তারা কী করে আসছিল। যখন ভয় পেয়ে কেউ মারা গেছে কিংবা এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে তখন তারা অনুতপ্ত হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়'।

[৬] Bullying

বুলিইং অনলাইন কিছু নিদর্শনের তালিকা দিয়েছে যা দেখলে উপলব্ধি করবেন যে আপনার শিশু বুলিইং এর শিকার। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ছেঁড়া পোশাক
- ভাই-বোনদের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব
- টাকা হারানো
- স্কুলে অপেক্ষাকৃত কম ভালো করা
- আগে যে বন্ধুরা ভালো ছিল তাদের সঙ্গত্যাগ করা
- ঘুমে সমস্যা থাকা
- অস্থির এবং বদমেজাজী হওয়া
- উদ্বিগ্ন হওয়া
- চুপচাপ থাকা এবং নিজেকে গুটিয়ে নেয়া
- শরীরের কোথাও কেটে যাওয়া এবং আঘাতের কালসিটে চিহ্ন নিয়ে বাড়ি ফেরা
- সবসময় বাড়িতে থাকতে চাওয়া
- আপনাকে অনুরোধ করা তার চুরি যাওয়া জিনিস আবার তাকে কিনে দিতে

আপনার শিশু বুলিড বা নির্যাতিত হলে পরবর্তী সময়ে কী ঘটতে পারে?

বেশিরভাগ শিশুই নির্যাতিত হলে তা নিয়ে সে কিছু বলতে চাইবে না। বিষয়টি কীভাবে বাবা-মা মোকাবিলা করছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া না দেখানো কিংবা আপনার শিশুকে জবাবদিহিতে বাধ্য না করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। 'আজ স্কুল কেমন হলো'? এ ধরনের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। তবে অনেক শিশুই তাদের স্কুলের সময় নিয়ে কথা না বলতে চাইতে পারে এবং প্রশ্নগুলোকে অনাহূত মনে করতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কিনা সেটি লক্ষ করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক এমন হওয়া দরকার যাতে তারা বুলিইং কিংবা নিজেদের জীবনের অসুখকর ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। শৈশবের শুরুর দিকেই স্বাচ্ছন্দ্যময় সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে তোলা জরুরি। আপনার শিশুদের সাথে এ রকম স্বাচ্ছন্দ্যময় সম্পর্ক থাকলে তারা নির্যাতনের বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলার সময় খোলামেলাভাবে বলতে পারবে এবং তাদের সমস্যাগুলো

আপনাকে একান্তভাবে জানাতে পারবে। ফলে আপনার সময় কম ব্যয় হবে এবং অনেক কষ্ট লাঘব হবে। এসব ব্যাপারে আপনার সন্তান যদি আপনার সঙ্গে আলোচনায় স্বস্তিবোধ না করে আর আপনি যদি জোর খাটিয়ে "কী হয়েছে" এর কৈফিয়ত দাবি করেন, তবে এতে কোনো ফল হবে না এবং আপনিও কিছুই জানতে পারবেন না।

বুলিইং কমানোর ব্যাপারে প্রযোজ্য কিছু পদক্ষেপ

- উন্নত বিশ্বের বেশিরভাগ স্কুলেই বুলিইং বিরোধী কিছু নীতিমালা থাকে। বাংলাদেশে এটি না থাকলেও এক্ষেত্রে আপনার শিশুর স্কুলে যোগাযোগ করাটা প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আপনার প্রথম পদক্ষেপ হবে আপনার সন্তানের স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এরপরে আপনার সন্তানের শিক্ষকের সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা।
- আপনার শিশুকে দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্ব্যবহারের জবাব দেয়া শেখাবেন না। কারণ এটি যথাযথ সমাধান নয়, বরং এতে আরো সমস্যা তৈরি হয়। অন্য ছাত্রকে আঘাত করা সম্ভবত সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে না, বরং এতে আপনার শিশুর স্কুলে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ কিংবা স্কুল থেকে সে বহিষ্কৃত হতে পারে।
- বাবা-মা হিসেবে শান্ত থাকুন; আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না কিংবা যে শিশু আপনার শিশুকে বুলিইং (bully) করেছে তার বাবা-মায়ের কাছে নালিশ করতে যাবেন না। সাধারণত যদিও বাবা-মায়ের প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হয়ে থাকে, কিন্তু এ প্রতিক্রিয়া বিষয়টিকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যায়। বরং উত্তম হবে স্কুলের পক্ষ থেকে যদি ভয়প্রদর্শনকারী শিশুর

অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

- আপনার সন্তান এবং তার স্কুলের সাথে নিয়মিত কথা বলে দেখুন, ভয় দেখানো বন্ধ হয়েছে কি না। তা না হলে, স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আবার যোগাযোগ করুন।
- আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর মাধ্যমে বুলিইং-এর মোকাবেলায় তাকে আরো আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করুন। মার্শাল আর্ট এবং আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।
- আপনার শিশুকে নিরাপত্তা কৌশলগুলো শেখান। আপনার সন্তানকে শেখান ভীতিপ্রদর্শনের আশঙ্কা হলে কীভাবে বড়দের সাহায্য চাইতে হয়। কাদের কাছে সাহায্য চাইবে সে ব্যাপারে তার সাথে কথা বলুন এবং সে কী বলবে তা অভিনয় করে দেখান। আপনার শিশুকে নিশ্চয়তা দিন যে, ভয় পেলে সে ব্যাপারে এসে অভিযোগ করার মধ্যে নিজেকে দোষী মনে করার কিছু নেই।
- স্কুলে বিরতি এবং মধ্যাহ্নভোজের সময় নিরাপদ কোনো স্থান শিশুর জন্য খুঁজে বের করতে শিক্ষকদেরকে অনুরোধ করুন।
- ওয়েবসাইটের সাহায্য নিন (http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov) এবং দেখুন, অন্য অভিভাবকরা কীভাবে এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় কৌশল শিখে নিন।

শিশুরা যা চায় তাই কিনে দেয়া

বাবা-মায়ের উচিত নয় সন্তান যখন যা চায় তখনই তা কিনে দেয়া; শিশুদের প্রতিটি চাওয়া বা ইচ্ছা যাচাই বাছাই না করেই পূরণ করে দেয়া সঠিক নয়। বাবা-মায়ের উচিত ছেলে-মেয়েদেরকে চাওয়া আর প্রয়োজনের পার্থক্য বোঝানো এবং তাদেরকে বুঝানো যে জীবনে সবকিছুই সহজপ্রাপ্য নয়-এখানে নেয়া যেমন আছে, দেয়াও তেমনি রয়েছে। বাবা-মা যদি সন্তানের জন্য ছোটোবেলা থেকে অনেক কিছু কিনে দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, তবে তারা নিজেদের অজান্তেই সন্তানের ক্রমবর্ধমান দাবির ফাঁদে পড়ে যাবেন। সন্তান যত বড় হবে তাদের দাবিও তত বাড়তে থাকবে। তখন তারা একের পর এক এমন দাবি করতে থাকবে যা পূরণ করা যেমন একদিকে অসম্ভব হয়ে পড়ে তেমনি অন্যদিকে

সন্তানদের সেই বদভ্যাস থেকে ফিরিয়ে আনাও দুরূহ হয়ে ওঠে। গাড়ি, জামা-কাপড়, খেলনা, সিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি নতুন নতুন জিনিস সে অবিরত চাইতেই থাকে।

টিনেজার: বয়ঃসন্ধিকালের ধারণা পর্যালোচনা

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বা সমস্যাসংকুল স্তর সম্ভবত বয়ঃসন্ধিকাল। ড. ইমাদুদ্দিন আহমেদ অভিমত পোষণ করেছেন যে, স্বাধীন পরিবেশে কিশোররা নেতা হয়ে ওঠতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যৌবনে উত্তরণ এবং প্রাপ্তবয়স্কতার মাঝখানের সময় হিসেবে, যদিও প্রাচীন সমাজে বয়ঃসন্ধিকালকে প্রাপ্তবয়স্কতার শুরু হিসেবে গণ্য করা হতো। ওহিভিত্তিক ধর্মগুলো বিষয়টিকে প্রথা এবং আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। ইহুদি ধর্মে একজন যুবক মিসবাহ মদের আড্ডায় গিয়ে বলত, 'আজ আমি একজন পুরুষ'। ইসলামে একজন বালিকা রজঃস্রাব শুরু হওয়ার মাধ্যমে নারী হিসেবে গণ্য হয় এবং বয়ঃসন্ধিকালে সালাত ফরয বা বাধ্যতামূলক হয়। বয়ঃসন্ধির বছরগুলো এমন একটি সময় যখন পূর্ণবয়স্কদের উচিত এ নব প্রাপ্ত বয়স্কদের পরিপক্বতা অর্জনে সহায়তা করা। এ সময় প্রাপ্তবয়স্করা তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে পরিণত হতে সাহায্য করতে পারে।

প্রাচীন সমাজের শিক্ষানবিশির প্রথার বদলে বর্তমানে জায়গা করে নিয়েছে সবার জন্য সর্বজনীন শিক্ষানীতি। এ শিক্ষাব্যবস্থায় ১৮ বছরের আগ পর্যন্ত সবাইকে শিশু সংজ্ঞায়িত করা হয়; টিনেজারদের যৌবনে পদার্পণকারী অপরিণত প্রাপ্তবয়স্ক[৭] হিসেবে গণ্য করা হয় না। মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৭-১৮ বছর) অথবা কলেজ শেষ না করা পর্যন্ত অনেক স্থানেই শিক্ষানবিশ পদে নিয়োগ দেয়া হয় না। আইনেও ধরে নেয়া হয় যে, ১৮ বছর বয়সে সবশিশু পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে, শিশুরা শারীরিকভাবে ১৮/১৯ বছর বয়সে পরিপূর্ণতা পেলেও মানসিক পূর্ণতা আরো আগেই আসে। অন্যদিকে আবেগগত পূর্ণতা বিভিন্ন বয়সে আসতে পারে, আবার কারো কারো একেবারে নাও আসতে পারে।

অতীতে কিশোরদেরকে পুর্ণবয়স্ক হিসেবে মর্যাদা দেয়ায় তা তাদের মানসিক শক্তি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতাকে উৎসাহিত করত এবং

[৭] Immatured Adult

তাদের মানসিক পরিপূর্ণতা বাড়িয়ে তুলত। আধুনিক যুগে কিশোরদের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করা হয়, যা তার নির্ভরশীলতা বাড়ায় ও তার আত্মসম্মানের হানি ঘটায়। প্রাচীন সমাজে ১৫ বছরের বালকেরা শিক্ষাদান করত, ব্যবসা করত, সামাজিক কাজে অংশ নিত, যুদ্ধে যেত ও বিয়ে করত। আধুনিক সমাজে তারাই শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়। রাশভারী পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তাদেরকে কমপক্ষে অবশ্যই কলেজ পর্যন্ত পড়তে হয় বা কলেজ গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করতে হয়।

কিশোরদেরকে দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে দেরি তাতে সমাজকে অনেক মূল্য গুণতে হয়। এটি বর্তমানে কিশোরদের নিয়ে তৈরি অনেক সমস্যারই মূল কারণ। প্রথমত সব তরুণই[৮] পড়াশোনায় মনোযোগী হবে এমন নয়। ফলে সেসব তরুণ বর্তমান শিক্ষাধারার স্কুলের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা অনুভব করে। যারা লেখাপড়ায় বন্দি না হয়ে কাজে হাত দিয়ে সাফল্য দেখাতে প্রস্তুত তাদেরকেও এ শিক্ষাব্যবস্থা যখন শিশু গণ্য করে কাজে যেতে বাধা দেয় তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়। ১৬ বছরের নিচে হবার কারণে যেসব তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরী ব্যবসায় হাতেখড়ি নিতে চেয়েও আইনগত কারণে পারে না, সেসব কিশোর- কিশোরীদের অনেককে দেখা যায় বেআইনি ব্যবসার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়তে (যেমন: ড্রাগ পাচার বা এর লেনদেন)। আবার যারা অল্প বয়সেই প্রভাবশালী হতে চায়, তারা গুণ্ডা দলে যোগ দিতে পারে। যারা একটু কম আনুষ্ঠানিক পরিবেশে ভালো করত তারা হতাশ হয়ে শ্রেণিকক্ষেই বসে থাকে। কেউ কেউ আবার মনোযোগ দেবার মতো কিছু না পেয়ে মনোযোগ ঘাটতি সমস্যায় ভোগে। তাদের মন বিভিন্ন দিকে উড়ে বেড়ায় কারণ বিরক্তিকর অ্যাসাইনমেন্ট তারা পছন্দ করে না। এছাড়াও অনেক যুবক-যুবতী তাদের যে বয়সে বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাকৃতিক হরমোনের চাপকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করার সুযোগ আরো কয়েক দশক আগেই লাভ করতে পারত, দেরিতে বিবাহের কারণে তারা অনেক সময়ই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরে হয় তারা বিবাহ বহির্ভূত সন্তান লালন করে, নয়তো ক্লিনিকে গিয়ে গর্ভপাত করিয়ে অবৈধ সন্তান থেকে মুক্তি পায়।

[৮] Adolescents

টিনেজারদের এবং আমাদের ক্রোধ

Anger is One Letter Away from Danger

রাগের সাথে আসে বিপদ। কৈশোরের রাগই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন আবেগ যা বাবা-মাকে আয়ত্তে আনতে হয়। লিন্ডা লেবলি (ফোকাস এ্যাডোলেসেন্ট সার্ভিসেস) এ বিষয়টি নিম্নোক্ত দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন:

উদাহরণ ০১: ক্যারেন নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে মনে করে এ পড়ায় কোনো লাভ নেই। সে যত চেষ্টাই করে, পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। সে আগের দিন অনেক প্রাকটিস করেছে কিন্তু স্কুলে নাটকের রিহার্সাল করতে গিয়ে স্টেজে উঠে তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অডিশনের মাঝখানেই সে থেমে গেল। সে ভাবতে লাগল নিশ্চয়ই ব্যাপারটি স্কুলে সবার জানাজানি হবে এবং ওরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। সে ভাবল, তার যে কতটা খারাপ লাগছে তা কখনো সে কারো কাছে প্রকাশ করবে না। সে জানে যে তারা কী ভাববে -তারা নিশ্চয়ই ভাববে যে সে তাদের মতো না, সে কোনো কাজের না। ওরা ভাবে যে একমাত্র ওরাই ঠিক। ক্যারেন ওদের সবাইকে ঘৃণা করে।

উদাহরণ ০২: ক্রিস জোরে দেয়ালে ঘুষি মারল। তাতেও যথেষ্ট হলো না। তাই তার কোকের বোতল তুলে হলের দেয়ালে ছুঁড়ে মারল। বাদামী মিষ্টি পানীয় দেয়াল বেয়ে পড়ল কার্পেটে। সে চিৎকার করে ওঠল, "তুমি আমার ওপর জোর খাটাতে পারো না ... আমি তোমার সাথে কোথাও যাব না। আমার যা ইচ্ছা তাই করব!" ক্রিস সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, তার বাবাও তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগলেন, তাকে ফিরে আসার জন্য চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু সে ততক্ষণে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে। ক্রিস বরাবরই তার বাবার ওপর ক্ষুব্ধ। তার বাবার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর চেয়ে অন্য কাজই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল- যেমন: তার ভাই-বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো। এই বাবাকে সে তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ দিতে রাজি নয়। সে ভাবল, গাঁজা খেলে সে হয়তো ভালো বোধ করবে।

উল্লিখিত দুকিশোর-কিশোরীর মধ্যে কী মিল রয়েছে?

তারা উভয়ই রাগের সাথে লড়ছে। তারা যা চায় তা তারা পাচ্ছে না এবং কোনোকিছুই তাদের ভাবনা অনুযায়ী চলছে না। যখন তারা অনুভব করে যে সবকিছু সবসময় তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তখনই তারা কারো বা কোনোকিছুর প্রতি প্রচণ্ড রুষ্ট আচরণ করে।

রাগ কোনো আচরণ নয়; এটি একটি অনুভূতি।

রাগ অনেক রূপ নিতে পারে, যেমন- ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ থেকে অসন্তোষ, প্রচণ্ড রাগে মেজাজ খিটখিট করা ইত্যাদি। এগুলোই রাগের বহিঃপ্রকাশ বা আচরণ যা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ক্যারেন তার রাগ চেপে রাখে এবং নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ক্রিস অবাধ্য ও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে । তাদের ব্যবহার এরকমই থাকবে অথবা আরো বাড়তে থাকবে, যদি না তারা নিজেদের হৃদয়ের গভীরে তাকিয়ে তাদের রাগের মূল কারণ খুঁজে না দেখে।

রাগ কল্যাণকর বা অকল্যাণকর দু-ই হতে পারে

রাগ একটি ভীতি সৃষ্টিকারী অনুভূতি। এর নেতিবাচক প্রকাশগুলো হলো শারীরিক ও মৌখিক ত্রাস, গালি, ভাংচুর, বিষোদগার করা, বিদ্বেষপরায়ণ কথাবার্তা বলা, কুৎসা রটনা, গিবত, অসামাজিক আচরণ, বিদ্রুপ, মাদকাসক্তি, গুটানো বা আত্ম প্রত্যাহার এবং মনোদৈহিক রোগ। এটি জীবন বিধ্বংসী হতে পারে, সম্পর্ক বিনষ্ট করে, অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, কাজে ব্যাঘাত ঘটায়,

কার্যকর চিন্তাগুলোকে ব্যাহত করে, শারীরিক সুস্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং ভবিষ্যতকে করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত।

তবে এর ইতিবাচক দিকও আছে। এটি আমাদের বোঝায় যে একটি সমস্যা আছে। রাগ মূলত দ্বিতীয় স্তরের আবেগ যা আসে ভীতি থেকে। যেসব বিষয় আমাদের জীবনে কাজ করছে না সেসব বিষয়ের সমঝোতা করতে সাহায্য করে, আমাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে দেয় এবং বিশেষত রাগের কারণগুলো নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করে।

রাগের কারণগুলো সাধারণত

দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া	অবসাদ	মাদক বা কোনো কিছুর অপব্যবহার	দুঃখ
অবহেলিত হওয়া	উত্তেজনা	হতাশা	মানসিক আঘাত

রাগী কিশোর-কিশোরীদের বাবা-মা হবার কারণে আমাদের মাঝেও ক্রোধের জন্ম হয়

এ বয়সে তারা অনেক ধরনের আবেগজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা আত্ম-পরিচয়, চারপাশের সম্পর্ক, বিচ্ছেদ ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে নানা আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। এ বয়সে তারা ক্রমাগত স্বাধীন হতে থাকে। ফলে, তাদের সাথে বাবা-মায়ের দূরত্ব বাড়ে। এ প্রক্রিয়ায় হতাশা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যা বাবা-মা ও সন্তান উভয়ের মধ্যেই রাগ ও প্রতিক্রিয়াপূর্ণ আচরণের সৃষ্টি করতে পারে। আমরা কিশোর-কিশোরী সন্তানদের আচরণে পরিবর্তন আনতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করব।

আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখানো বন্ধ করে অবস্থানুযায়ী একে অন্যের প্রতি সাড়া দেয়া প্রয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য হবে রাগকে অস্বীকার করা নয় বরং ওই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ ও এর গঠনমূলক প্রকাশ করা।

আমাদের নিজেদের জন্য ও কিশোর- কিশোরীদের জন্য কী করতে পারি?

কিশোর-কিশোরীদের কথা শুনুন ও বোঝতে চেষ্টা করুন তারা কেমন অনুভব করছে। আপনার শিশুর অবস্থান থেকে তার বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। দোষারোপ বা অভিযোগ কেবল দেয়াল তুলে দেয় এবং সব যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দেয় মাত্র। আপনি কেমন বোধ করছেন তা তাদেরকে বলুন, সঠিক তথ্যের ওপর নির্ভর করুন এবং বর্তমান সমস্যা বা পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন (অতীত টানা-টানি না করে)। দেখান যে আপনি তাকে স্নেহ করেন এবং ভালোবাসেন। এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করুন যাতে উভয় পক্ষই জিতে। মনে রাখবেন, রাগ যেন কোনোভাবেই ধ্বংসাত্মক আচরণে পরিণত না হয়।

যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে হিংস্রতা, ক্রমাগত লড়াই-ঝগড়া, হতাশা বা আত্মহননের আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে অভিজ্ঞদের সাহায্য নিন।

উত্তম যোগাযোগের কিছু নীতি

একটি আদর্শ বিশ্বে সবকিছু সুন্দর ও পরিকল্পনা মাফিক চলবে এমন আশা থাকলেও বাস্তব বিশ্বের চিত্র ভিন্ন। বাবা-মায়েদের লক্ষ্য, নীতি, কর্মপন্থা, শ্রম সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি না যথার্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে। যদি বেঠিক কিছু ঘটেও যায় তবুও রাগের মাত্রা, হতাশা অথবা নিরাশা বাড়তে দেয়া যাবে না। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন এবং সুন্দর যোগাযোগ বজায় রাখুন।

উত্তম যোগাযোগের কিছু নীতি আছে যা বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এগুলো স্কুল-পূর্ব, স্কুলগামী ও পরের বয়স এবং কিশোর বয়সের বদমেজাজ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মতো সমস্যার মীমাংসা করবে।

প্রথমত সন্তানকে কথা বলতে দিন এবং প্রসন্নতার সাথে ও অধৈর্য না হয়ে তাদের কথা শুনুন। তাদের দিন কেমন গেল- এ ধরনের গল্প বলতে বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে তাদের উৎসাহিত করুন। কথার মাঝে বাধা না দেবার চেষ্টা করুন।

আগের দিনে পরিবারের অতীত ইতিহাস নিয়ে গল্প শোনানো ও আলোচনার যে প্রচলন ছিল আজকাল ভিজুয়াল দর্শনচিত্র যেমন টিভি, সিনেমা ও ভিডিও গেমস সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। কথা বলার অনেক সুবিধা রয়েছে, এতে ছেলেমেয়েদের ভিতর নিজেকে প্রকাশ করার আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, স্পষ্ট

করে কথা বলা শেখায় এবং ছোটো-বড় সববিষয় বাবা-মায়ের সাথে আলোচনা করার মতো সাহস জোগায়। যদিও আপনি অনেক সময় খুব ক্লান্ত থাকেন এবং কথা বলাটাও অনেক সময় হয়তো কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু কথা বলাটা সত্যিই ফলপ্রসূ। যে শিশুটির সাথে আপনি কথা বলেন সে বুঝে যায় যে, আপনি তাকে শুধু খাওয়া-পরা দেবার যান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করছেন না বরং তাকে একজন মানুষ হিসেবে বড় করে তুলছেন। এটি শিশুদেরকে এ অনুভূতি দেয় যে তারা বাবা-মা ও পরিবারের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। ভালো কথোপকথনই শিশুদেরকে শেখায় কথা বলার সময়ে অন্যদের কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় ও তাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হয়, বিশেষ করে বাবা-মায়ের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়।

নিজের মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না অথবা সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ করতে ভয় দেখানোর কৌশল অবলম্বন করবেন না। বরং যতক্ষণ না নিজেকে শান্ত করতে পারছেন ততক্ষণ কোনোরকম কথা না বলে চুপ থাকাই উত্তম।

শিশুদেরকে কখনো খাটো করে দেখবেন না অথবা তারা যেন এটি অনুভব না করে যে তারা মূর্খ। তাদের সাথে আপনার নিজের ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক হোন: ভদ্রোচিত, পূর্ণ মনোযোগী এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ করুন। এটি শিশুদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও নিরাপদ করে তোলে। আর এ আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ তারা তাদের পরিণত জীবনেও বহন করবে।

আপনার সন্তানের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার উদ্যোগ নিন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করুন এবং মতামতের তুলনা করুন। এতে তারা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা শিখবে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বাড়বে। শিশুদের বুদ্ধিমত্তাকে কখনো ছোটো করে দেখবেন না বা কোনো বিষয়ের ওপর তাদের মতামতকে বাতিল করে দেবেন না। খাবার টেবিল হচ্ছে কথা বলার জন্য একটি উত্তম সময়। বাবা-মায়েরা যদি সন্তানদেরকে টিভি বন্ধ রাখা এবং সবাই মিলে একসাথে বসে খাওয়ার মতো অভ্যাস গড়ে তোলেন, তাহলে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে ওঠলে তাদের জীবনটাকে সহজভাবে নিতে শিখবে।

টিভি মনোযোগ কেড়ে নেয় এবং সম্পর্কের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে, বিশেষ করে খাবার সময়; অথচ এই সম্পর্ক পারিবারিক বন্ধন তৈরির জন্য খুবই জরুরি।

একবিংশ শতাব্দীতেও কিছু মায়েরা শিশুদেরকে রাতের বেলায় বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে কাল্পনিক গল্প যেমন- ভূতের ভয় দেখান, মায়েরা বিভিন্ন নামের ভূত আবিষ্কার করেছেন (ভূত বা অন্যভাবে জিন বলা যায়) যেমন: রাক্ষস, ক্ষোক্কস, পেত্নি, কালান্তক, হুদহুদ, কালো লম্বা কাপড় মোড়ানো গাধার মতো পা ইত্যাদি যাদেরকে রাতের আঁধারে ভয় দেখানোর প্রতীক মনে করা হয়। যদিও শিশুদের রাতের আঁধারে ভয় দেখিয়ে শারীরিক ক্ষতি থেকে সাময়িক বাঁচানো যায়, কিন্তু এসব কৌশল এক সময় বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে। শিশুদের মনে অন্ধকারের ভয়, একাকীত্বের ভয়, প্রাণীর ভয়, বজ্রপাত এবং আগন্তুকের ভয় ঢুকে যায়। যদিও বড় হয়ে তারা এটি বুঝে যায় যে এগুলো কিছু নয়, তবুও তাদের মানসিক ক্ষতি যতটা হবার তা হয়েই যায়। এসব করার সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে বাবা-মায়েদের গভীর আলোচনা করতে পারার যোগ্যতার অভাব অথবা যুক্তিসংগত কোনো পরিপূরক তৈরির অক্ষমতা।

শিশুদের সাথে দানবের মতো চেপে না বসে তাদের লেভেলে তাদের সাথে কথা বলুন। তাদের প্রতি স্নেহশীল হোন, কথা বলার সময় আলতো করে তাদের মাথায় হাত রাখুন। ভালোবাসাপূর্ণ স্পর্শ দিন যাতে তারা আপনার সাথে শক্ত বন্ধন অনুভব করে ও তাদের অনুভূতিও সহজে প্রকাশ করতে পারে।

এসব সমস্যার আইনগত ও সামাজিক সমস্যার সমাধান অত্র গ্রন্থের সাধ্যাতীত। তবু বাবা-মায়েদের আধুনিক সমাজের এ ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি না করাই উত্তম। কিশোর-কিশোরীদের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করবেন না। আপনার অফিসে জুনিয়র সহকর্মীদের সাথে যেভাবে ব্যবহার করেন তাদের সাথেও সেভাবেই আচরণ করুন। মনে রাখবেন, তাদের পথনির্দেশনা ও অভিজ্ঞতার দরকার। কিন্তু একইসাথে প্রয়োজন সম্মান, দায়িত্ব ও প্রশিক্ষণ। যতটা সম্ভব দায়িত্ব নেবার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে সামান্য কিছু আর্থিক দায়িত্ব দিন, যেমন: খণ্ডকালীন চাকরি (যেমন: টিউশন) যেখানে তারা কাজের জগতের সাথে পরিচিত হবে এবং সেই সাথে কিছু উপার্জনও করতে পারবে। এভাবে তারা কাজের পরিবেশে অভ্যস্ত হতে এবং আয় করতেও শিখবে।

করণীয়

করণীয়- ২৯: কিশোর-কিশোরী ও বাবা-মায়েদের জন্য প্রশ্নোত্তর

রাগ নির্ণয় বা নিয়ন্ত্রণে প্রথম কাজ হচ্ছে নিজের ভিতর দেখা। বাবা-মা ও কিশোর-কিশোরীদের উচিত একসাথে বসে নিজেরা নিজেদের আত্মসমালোচনামূলক প্রশ্ন করা। এখানে আলোচনার সুবিধার্থে কিছু প্রশ্ন উল্লেখ করা হলো:

- রাগের উৎস বা কারণ কোথায়?
- কী কী পরিস্থিতিতে এ রাগের অনুভূতি তৈরি হয়?
- আমার চিন্তাগুলো কি সবসময় 'অবশ্যই', 'উচিত', 'সবসময়', 'কখনো নয়' এসব ধ্রুব শব্দ দিয়ে শুরু হয়?
- আমার চাওয়াগুলো কি অযৌক্তিক?
- আমি কি কোনো অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করছি?
- আমি আহত হওয়ার, কিছু হারানোর বা ভয়ের পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করছি?
- আমি কি আমার রাগের শারীরিক বহিঃপ্রকাশগুলো চিনি? যেমন: মুঠো পাকানো, নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে যাওয়া, ঘাম হওয়া ইত্যাদি।
- আমি কীভাবে রাগ প্রকাশ করতে পছন্দ করি?
- আমার রাগের প্রকাশ কোন দিকে বা কারো ওপর পতিত হয়?
- আমি রাগলে কি অন্যদের থেকে আলাদা না কি অন্যকে ভীতিপ্রদর্শন করি?
- আমি কি কার্যকরভাবে কথোপকথন করছি?
- আমি কোন্‌টার ওপর জোর দিচ্ছি- আমার সাথে কী করা হয়েছে তার ওপর, নাকি আমি কী করতে পারছি তার ওপর?
- আমার অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমি কতটা দায়িত্বশীল?
- আমি আমার রাগের বহিঃপ্রকাশের সময় কতটা দায়িত্বশীল আচরণ করি?
- আমার আবেগ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, নাকি আমি আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করি?

করণীয়- ৩০: সমাধানমূলক পদক্ষেপ

নিম্নোক্ত ঘটনাটিতে যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে সে অবস্থায় কীভাবে শিশুদের সামলাতে হয় তা নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েকজন দম্পতিকে ডাকুন। এরপর নিজের চিন্তাকে মহানবি সা.-এর আচরণের সাথে তুলনা করুন।

"একবার এক যুবক মহানবি সা.-এর কাছে এসে তাঁর নিকট জেনা ও ব্যভিচার করার অনুমতি চাইল। তা শুনেই সেখানে উপস্থিত সব সাহাবি ক্ষেপে গিয়ে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। মহানবি সা. বললেন, তাকে আমার কাছে এনে বসাও। সে বসার পর রসুল সা. তাকে পরপর পাঁচটি প্রশ্ন করলেন। যেগুলো ছিল এ রকম: "তুমি কি তোমার মা, বোন, ফুফু, মেয়ে অথবা খালার জন্য এটি পছন্দ করবে"? পাঁচ প্রশ্নের উত্তরেই লোকটি বলল, "খোদার কসম! না, হে মহানবি"। তার প্রতিটি উত্তরের সাথেই রসুল সা. বললেন: "অন্য লোকরাও তার মায়ের জন্য, মেয়ের জন্য, বোনের জন্য বা ফুফু বা খালার জন্য এটি পছন্দ করবে না"। তারপর তিনি যুবকের মাথার ওপর হাত রেখে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, তার পাপ ক্ষমা করে দিন, তার আত্মাকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন"। এরপর ওই লোক আর কখনোই তার মনে ব্যভিচারের চিন্তাকে স্থান দেয়নি (আহমদ)।

রসুল সা. লোকটির সাথে তার মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের দিকে খেয়াল রেখে কথা বললেন এবং তাকে কার্যকর আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বকাবকি, চিৎকার, ধমক দেয়া কিংবা শাস্তি কোনো কাজে আসে না।

রসুল সা.-এর ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের আবেগ সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান আর সেটি বোঝার মতো প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যুবকটি আসলে তার যৌন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে এর একটি সমাধান চেয়েছিল। রসুল সা. এ পাপ যা তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে সে ব্যাপারে নসিহত করলেন না, বরং তিনি তার সহজাত পবিত্র মর্যাদাবোধ এবং নীতিবোধ জাগিয়ে দিলেন। তিনি ধর্মীয়, নৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনোবিজ্ঞানের নীতি ব্যবহার করেছেন। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সন্তান লালন-পালনে এ পদ্ধতিটি একটি সমস্যা সমাধানের মতবাদ গড়ে তুলেছে।

PARENT-CHILD RELATIONS

THIS EASY -TO- READ, comprehensive guide contains what you need to know on how to parent with confidence. Packed with advice and powerful tips, using the latest research on child development and parenting techniques, it offers a mine of information on how to let children flourish, take the frustration out of parenting, and develop happy family relations. Authors provide guidance on developing character, knowledge, values, and skills, as well as a faith-based outlook in children, benefitting parents with kids of all ages. The many strategies and techniques offered include: teaching children how to problem-solve, make decisions, and develop self-esteem. Raising God conscious, moral, successful children, with a sense of civic responsibility in today's world is not easy. It is also not impossible. Effective parenting is the key.

Most importantly the book proposes Islamic solutions to problematic issues in raising children. I was impressed with the comprehensive coverage of most available theories of child development. Authors have not missed talking about the common misconceptions of popular psychology.

DR. KUTAIBA CHALEBY, *Child Psychiatrist, certified by the American Board of Psychiatry and Neurology. He is also former Head, Section of Psychiatry, King Faisal Hospital and Research Center, Saudi Arabia.*

One of the most insightful and comprehensive books on effective parenting. The work tackles issues in the home environment and the experiential world of children and has the ingredients to transform families across the globe.

EDRIS KHAMISSA, *International Consultant in Education and Human Development.*

The book has many outstanding features and I say this as an author of many books on the subject of parenting and family matters, which have been translated into various languages. It presents many resources and valuable references to help parents, points out the proper sense of fulfilment for children and emphasizes that this should come from community attachment and involvement as well as a family bond, and offers a great list of activities at the end of each chapter, which, if applied by parents, will ensure a healthy and positive family atmosphere.

DR. MOHAMED R. BESHIR, *member of the advisory board of SIFCA "Shura of Islamic Family Counselors of America." Also Advisor to the Muslim Association of Canada (MAC) and the Muslim American Society (MAS) departments on Tarbiyah matters.*

This is a well researched and thought provoking book for everyone involved in parenting and provides a comprehensive guide on how to be an effective parent in the modern world. The authors cover many practical aspects of good parenting in addition to the theory, in a very readable format which can be applied by families in traditional and modern settings, without overwhelming the reader. I particularly like the way in which the chapters provide many practical exercises of how to put the theory to work with emphasis on engaging the whole family in the challenging area of parenting.

FATIMA DESAI, *Child Protection Lawyer, LLB Hons; Dip L.G.; MA (Child Studies).*

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN 978-984-94911-5-6
9 789849 491156